বাংলা ছন্দের মূলসূত্র

কলিকাতা আশুতোষ কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, এম.এ., পি.আর.এস.

প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪৯

মূল্য—চার টাকা

বিষয়-সূচী

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থ কয়েক মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়, কিন্তু মুদ্রণের নানা অসুবিধার জন্য চতুর্থ সংস্করণ পূর্ব্বে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। তজ্জন্য আমি পাঠকবৃন্দের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

এই সংস্করণে 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' * সম্পর্কে একটি নূতন পরিচ্ছেদ যোগ করা হইয়াছে, এবং 'বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ' সম্পর্কে পরিচ্ছেদটি পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য আর কোন পরিবর্ত্তন নাই।

বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীবিভাস রায়চৌধুরীর পরামর্শ-ক্রমে এই সংস্করণে ছন্দের Styleএর প্রতিশব্দ হিসাবে 'রীতি' কথাটি ব্যবহার করা হইল। তাঁহার পরামর্শেই নূতন কয়েকটি বিষয় যোজনা করা হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী।

এই সংস্করণের প্রকাশ-সম্পর্কে আমার শিক্ষাগুরু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এ কারণে তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা
মাঘ, ১৩৫৫

বিনীত
গ্রন্থকার

---

* ১৩৫৪ সনে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্র ছন্দের বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক মৎপ্রণীত একটি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যামোদীরা পাঠ করিতে পারেন।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বর্ত্তমান সংস্করণে দুই একটি নূতন সূত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন অধ্যায় যোগ করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা বাংলা ছন্দের তথ্য আরও বিশদরূপে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করা হইয়াছে।

চরণের 'লয়' ও অক্ষরের 'গতি'সম্বন্ধে কিছু নূতন তত্ত্ব এই সংস্করণে স্থান পাইয়াছে।

এই সংস্করণে সমগ্র গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগ 'প্রবেশিকা'য় বাংলা ছন্দের স্থূল তথ্যগুলি সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে দৃষ্টান্ত-সহযোগে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ছন্দঃশাস্ত্রে প্রবেশের সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীয় ভাগে বাংলা ছন্দের মূল সূত্রগুলি উপযুক্ত টীকা ও উদাহরণ-সহকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে অনেকগুলি সম্পৃক্ত বিষয় ও তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ ও নির্দ্দেশ অনুসারে গ্রহণ করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে এই শব্দগুলি সর্ব্বসাধারণেও গ্রহণ করিবেন।

* * * * *

কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩৫৩

বিনীত
গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বর্ত্তমান সংস্করণে অনেকগুলি নূতন অধ্যায়ের যোজনা করা হইয়াছে, এবং স্থলে স্থলে কিছু কিছু পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। ইহাতে আমার বক্তব্যের মর্ম্মগ্রহণ করার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা ছন্দ এবং আমার মতবাদ লইয়া অনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক সেই আলোচনার ফলে আমার মূল সিদ্ধান্তগুলির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস। অনেক পাঠ্যপুস্তকেই আমার মতবাদ ও সূত্রাদি গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সমস্ত সমালোচক আমার গ্রন্থের দোষক্রটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ, তাঁহাদের সমালোচনার সহায়তা পাইয়া আমি অনেক স্থলে সংশোধনের নির্দ্দেশ পাইয়াছি।

বাধ্য হইয়া অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। ছেদ ও যতি, হ্রস্ব ও লঘু, দীর্ঘ ও গুরু—এই কয়টী শব্দ আমি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করি নাই, একটু বিশিষ্ট ও সূক্ষ্মতর অর্থে তাহাদের প্রয়োগ করিয়াছি।

এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা সাময়িক পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাকারে রচিত হওয়ায় স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। আশা করি তজ্জন্য পাঠকবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

যাঁহারা বাংলা ছন্দ-সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল পোষণ করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের সহিত মৎপ্রণীত Studies in Rabindranath's Prosody (Journal of the Deptt. of Letters, Cal. Univ., Vol. XXXI) এবং Studies in the Rhythm of Bengali Prose and Prose-verse (Journal of the Deptt. of Letters, Cal. Univ., Vol. XXXII) পাঠ করিতে পারেন।

* * * * *

কলিকাতা
১৩৪৬

বিনীত
গ্রন্থকার

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বাংলা ছন্দ-সম্বন্ধে কোন প্রণালীবদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। প্রাচীন ধরণের বাংলা ব্যাকরণের শেষে ছন্দ-সম্বন্ধে একটা প্রকরণ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কয়েকটি প্রচলিত ছন্দের নাম ও উদাহরণ ছাড়া বেশী কিছু থাকে না। বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বা তাহার মূল তথ্য-সম্বন্ধে কোনরূপ পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা-সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারাও ছন্দ লইয়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা প্রকাশ করেন নাই। সাময়িক পত্রিকায় বাংলা ছন্দ-সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু কয়েকটি ছাড়া আর প্রায় সবগুলিই নিতান্ত নগণ্য ও ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের নানা সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ-গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি প্রণালীবদ্ধভাবে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় অগ্রসর হন নাই। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি প্রবন্ধে এতৎসম্পর্কে অনেক চিন্তনীয় তথ্যের নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু তাহাও ঠিক উপযুক্ত ও সর্ব্বাংশে স্বচ্ছ আলোচনা নহে। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন কয়েকটি প্রবন্ধে ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি লেখকগণের মতানুযায়ী কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বাংলা ছন্দের, বিভাগ করিয়া তাহাদের লক্ষণ-নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিলে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

* * * * *

উপযুক্ত নীতিতে বাংলা ছন্দের আলোচনা করিতে গেলে বাংলা কবিতার প্রাচীন ও নবীন সর্ব্বপ্রকার দৃষ্টান্ত ও প্রাগ্-বঙ্গীয় বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় কাব্য ছন্দের রীতি আলোচনা করা আবশ্যক। কিরূপে বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ হইল, ভারতীয় অন্যান্য ভাষার ছন্দের সহিত বাংলা ছন্দের কি সম্পর্ক, বাংলা ছন্দের ইতিহাসের মধ্যে যোগসূত্র কি—ইত্যাদি তথ্যের আলোচনাও অত্যাবশ্যক। তজ্জন্য বাংলার ভাষাতত্ত্ব, বাঙালীর ইতিহাস, বাঙ্গালীর দৈহিক ও মানসিক বিশেষত্ব ইত্যাদির চর্চ্চা আবশ্যক। ছন্দোবিজ্ঞান,

ভাষাবিজ্ঞান ও সঙ্গীতের মূল তথ্যগুলি জানা চাই। বাংলা ছাড়া অপর দুই একটি ভাষার কাব্য ও ছন্দের প্রকৃতি-সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় থাকা চাই। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ছন্দোবোধের সূক্ষ্মতাও আবশ্যক। এই ভাবে আলোচনা করিলে তবে বাংলা ছন্দের যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়িবে এবং বাংলা ছন্দের প্রকৃতি ও শক্তি-সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হইবে। নতুবা, বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি কি, প্রচলিত বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে মূলীভূত ঐক্য কোথায়, তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ ও জাতি-বিচার কি ভাবে করা যাইতে পারে, বিদেশী ছন্দের অনুকরণ বাংলায় সম্ভব কি না—ইত্যাদি প্রশ্নের যথার্থ সমাধান পাওয়া যাইবে না।

* * * * *

যে কয়েকটি সূত্রে এখানে বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট রীতি নির্দিষ্ট হইল, তাহা প্রাচীন তথা অর্ব্বাচীন সমস্ত বাংলা কবিতাতেই খাটে। এতদ্দ্বারা সমগ্র বাংলা কাব্যের ছন্দের একটি ঐক্যসূত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সূত্রগুলি বাংলা ভাষার প্রকৃতি, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের ন্যায় বাংলা প্রভৃতি ভাষায় ছন্দের ভিত্তি Bar ও Beat, এই জন্য এই সূত্র-পরম্পরাকে সংক্ষেপে The Beat and Bar Theory বা 'পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদ' বলা যাইতে পারে।

* * * * *

বিজ্ঞানসম্মত, প্রণালীবদ্ধভাবে বাংলা ছন্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার বোধ হয় এই প্রথম প্রয়াস। আশা করি, সুধীবৃন্দ ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

কারমাইকেল কলেজ,
রঙ্গপুর
২০ শ্রাবণ, ১৩৩৯

বিনীত
গ্রন্থকার

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র

প্রথম ভাগ

প্রবেশিকা

পূর্ণ যতি ও চরণ

(দৃঃ ১) রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে ||
শিশুগণ দেয় মন | নিজ নিজ পাঠে ||

(দৃঃ ২) ডাকিছে দোয়েল, | গাহিছে কোয়েল | তোমার কানন | সভাতে ||
মাঝখানে তুমি | দাঁড়ায়ে জননী | শরৎকালের | প্রভাতে ||

(দৃঃ ৩) ওগো কাল মেঘ, | বাতাসের বেগে | যেয়োনা, যেয়োনা, | যেয়োনা ভেসে ; ||
নয়ন-জুড়ানো | মুরতি তোমার, | আরতি তোমার | সকল দেশে ||

বাংলা ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে কয় পংক্তি পদ্য উদ্ধৃত করা হইল, লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে গদ্যের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রধানতঃ এক বিষয়ে। পদ্যের এক একটি পংক্তি যেখানে শেষ হয়, সেইখানেই উচ্চারণের অর্থাৎ জিহ্বার ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি ঘটে এবং এই বিরাম-স্থানগুলি একটা নিয়মিত ভাবে অবস্থিত। উপরের দৃষ্টান্ত কয়টিতে যেখানে যেখানে || চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেইখানেই জিহ্বা পূর্ণ বিরাম গ্রহণ করিয়াছে। এই বিরাম-স্থলগুলিও যেন পূর্ব্ব হইতে প্রত্যাশিত ; একটা নিয়মিত কালের ব্যবধানে তাহারা অবস্থিত। গদ্যেও অবশ্য বিরাম-স্থল আছে, অবিরত শব্দোচ্চারণ গদ্যেও সম্ভব নয়। কিন্তু গদ্যের প্রতি পংক্তির শেষে বিরাম-স্থল না-ও থাকিতে পারে, এবং বিরাম-স্থল গুলির অবস্থান কোন সুনির্দ্দিষ্ট কালের ব্যবধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় না।

পদ্যের এক একটি পংক্তির এইরূপ বিশিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়া, পদ্যের পংক্তিকে একটি বিশিষ্ট নাম—**চরণ**—দেওয়া হইয়াছে। এই 'চরণ' অবলম্বন করিয়াই যেন ছন্দঃসরস্বতী বিচরণ করেন। প্রতি চরণের শেষে যেখানে জিহ্বার ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি ঘটে, সেই বিরাম-স্থলগুলিকে বলা হয় **পূর্ণ যতি**। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির প্রত্যেকটিতে ২টি করিয়া চরণ আছে। প্রতি চরণের শেষে আছে

পূর্ণ যতি। প্রত্যেকটি চরণের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ পূর্ণ যতির অবস্থান নিয়মিত। যে কোন কবিতার বই খুলিলেই দেখা যায় যে প্রত্যেকটি পংক্তি যেন ছাঁটা ছাঁটা, মাপা মাপা—কারণ নিয়মিত দৈর্ঘ্যের চরণ অবলম্বন করিয়াই পদ্য রচিত হয়।

যতি (অৰ্দ্ধযতি) ও পৰ্ব্ব

কিন্তু অনেক সময় দেখা যাইবে যে পদ্যের চরণগুলি পরস্পর সমান নহে। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি হইতেই তাহা প্রতীত হইবে।

(দৃঃ ৪) ওগো নদীকূলে | তীর-তৃণতলে | কে ব'সে অমল | বসনে ||
শ্যামল বসনে ? ||
সুদূর গগনে | কাহারে সে চায় ? ||
ঘাট ছেড়ে ঘট | কোথা ভেসে যায় ? ||
নব মালতীর | কচি দলগুলি | আনমনে কাটে | দশনে, ||
ওগো নদীকূলে | তীর-তৃণদলে | কে ব'সে শ্যামল | বসনে ? ||

(দৃঃ ৫) মকরচুড় | মুকুটখানি | কবরী তব | ঘিরে ||
পরায়ে দিনু | শিরে ||
জ্বালায়ে বাতি | মাতিল সখী | দল ||
তোমার দেহে | রতন সাজ | করিল ঝল | মল ||

এ সকল ক্ষেত্রে দুইটি পূর্ণ যতির মধ্যে ব্যবধান সমান বা সুনির্দ্দিষ্ট নহে। তবু এখানে যে পদ্যছন্দের সমস্ত গুণ-ই বর্ত্তমান তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পূর্ণ যতির অবস্থান বা চরণের দৈর্ঘ্যকে-ই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তবে সে ভিত্তি কি ?

এ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে আর একটু সূক্ষ্মভাবে পদ্যের চরণ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। চরণের শেষে পূর্ণ বিরাম-স্থল ছাড়া চরণের মধ্যেও জিহ্বার হ্রস্বতর বিরাম-স্থল আছে। ঐ বিরাম-স্থলগুলি উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে | এই চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইতেছে। রেল গাড়ীর ইঞ্জিন কোন ষ্টেশন হইতে এক বিশেষ পরিমাণের জল লইয়া যাত্রা করে, যখন কতক দূর যাওয়ার পর সেই জল শেষ হইয়া আসে তখন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট আর একটি ষ্টেশনে আসিয়া পুনরায় উপযুক্ত পরিমাণ জল সংগ্রহ করে। সেইরূপ চরণ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণের একটা impulse, প্রয়াস বা ঝোঁকের আরম্ভ হয়। সেই ঝোঁকের প্রভাবে এক বা একাধিক শব্দ বা শব্দাংশের উচ্চারণ হওয়ার পর এই ঝোঁকের

পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন নূতন করিয়া শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহ্বার ক্ষণিক বিরতি আবশ্যক হয়। এই ক্ষণিক বিরতিকে অর্দ্ধযতি, উপযতি, হ্রস্বযতি বা শুধু যতি বলা যায়। ছন্দের হিসাবে এই যতির গুরুত্ব-ই অধিক। উদ্ধৃত পদ্যাংশগুলি স্বাভাবিকভাবে আবৃত্তি করিলেই এই যতি-র অবস্থান ও গুরুত্ব প্রতীত হইবে। যদি উপযুক্ত স্থলে নির্দ্দিষ্ট কালের ব্যবধানে যতি না পড়ে, তবে ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে। ৫ম দৃষ্টান্তে 'দিনু'র স্থলে 'দিলাম,' 'বাতি'র স্থলে 'প্রদীপ' লিখিলে যতি নির্দ্দিষ্ট কালের ব্যবধানে না পড়ায় ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে।

যে কয়টি পদ্যাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখা যায় যে এক একটি চরণের দৈর্ঘ্য ছোট বড় যাহাই হউক, চরণের মধ্যে হ্রস্বতর যতিগুলি সমপরিমাণ কালের ব্যবধানে অবস্থিত। অর্থাৎ, একটি হ্রস্বযতি হইতে (কিম্বা চরণের প্রারম্ভ হইতে) পরবর্ত্তী যতি পর্য্যন্ত শব্দ বা শব্দাংশগুলি উচ্চারণ করিতে সমান সময় লাগে। এইটি বাংলা ছন্দের মূল তথ্য।

এক যতি (কিম্বা চরণের আদি) হইতে পরবর্ত্তী যতি পর্য্যন্ত চরণাংশ-কে বলা হয় পর্ব্ব। উদ্ধৃত ১ম দৃষ্টান্তের প্রত্যেক চরণে ২টি পর্ব্ব, ২য় ও ৩য় দৃষ্টান্তের প্রত্যেক চরণে ৪টি পর্ব্ব, ৪র্থ দৃষ্টান্তের চরণগুলিতে যথাক্রমে ৪, ১, ২, ২, ৪, ৪ পর্ব্ব, ৫ম দৃষ্টান্তের চরণগুলিতে যথাক্রমে ৪, ২, ৩, ৪ পর্ব্ব আছে। উচ্চারণের সময় এক এক বারের ঝোঁক বা impulseএ আমরা যে টুকু উচ্চারণ করি, তাহাই এক একটি পর্ব্ব। সোজা ভাষায় বলিতে গেলে, "এক নিঃশ্বাসে" যে টুকু বলা হয়, তাহাই পর্ব্ব। সাধারণতঃ, এক একটি পর্ব্ব কয়েকটি গোটা শব্দের সমষ্টি।

পর্ব্ব-ই বাংলা ছন্দের উপকরণ। ফুলের মালা বা তোড়া আমরা নানাভাবে, নানা কায়দায়, নানা pattern বা নক্সা অনুসারে রচনা করিতে পারি, কিন্তু মূল উপকরণ এক একটি ফুল। তেমনি নানা কায়দায়, নানা নক্সায় আমরা পর্ব্বের সহিত পর্ব্ব সাজাইয়া নানা বিচিত্র চরণ ও স্তবক বা কলি (stanza) রচনা করিতে পারি, কিন্তু ইমারতের মধ্যে ইটের মত উপকরণ হিসাবে থাকিবে এক একটি পর্ব্ব।

ছন্দের মূল ভিত্তি একটা ঐক্য। সেই ঐক্যের পরিচয় আমরা পাই পর্ব্বের ব্যবহারে। যে কয়েকটি পদ্যাংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে তাহাদের ছন্দ নিয়মিত দৈর্ঘ্যের পর্ব্বের ব্যবহারের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

অবশ্য একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংলা ছন্দোবন্ধে চরণের শেষ পর্ব্বটি অনেক সময় ছোট হয়। তাহার ফলে পূর্ণযতির দীর্ঘ বিরাম-স্থলটি নির্দ্দেশ করার সুবিধা হয় এবং চরণের শেষে অনেক সময় যে মিল (মিত্রাক্ষর) থাকে সেটার ধ্বনি-ও কানে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝঙ্কৃত হয়।

যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখা যাইবে যে পর্ব্বগুলি পরস্পর সমান, কেবল চরণের শেষ পর্ব্বটি অনেক সময় ছোট। ৪র্থ ও ৫ম দৃষ্টান্তে চরণের দৈর্ঘ্য সুনিয়মিত নহে, কিন্তু ঠিক একই মাপের পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ছন্দ বজায় আছে। বস্তুতঃ ছন্দের মূল উপকরণ—পর্ব্বের পরিমাপ—যদি সুস্থির থাকে, তবে চরণের দৈর্ঘ্য বাড়াইলে বা কমাইলে ছন্দের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যেমন, ৪র্থ দৃষ্টান্তের ১ম চরণের ১ম পর্ব্বটি, বা ৫ম দৃষ্টান্তের ৩য় চরণের ১ম পর্ব্বটি যদি বাদ দেওয়া হয়, তবে ছন্দের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যদি চরণের দৈর্ঘ্য সমান রাখিয়া পর্ব্বের পরিমাপ অসমান করা হয়, তবে ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে। ১ম দৃষ্টান্তে ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া যদি বলা হয়

রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে ||
শিশুরা মন দেয় | নূতন সব পাঠে ||

তবে চরণ দুইটির দৈর্ঘ্য সমান থাকে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের মধ্যে পর্ব্বের দৈর্ঘ্যের সঙ্গতি থাকে না, সুতরাং ছন্দোভঙ্গ হয়।

সাধারণতঃ একটা পদ্যে বা পদ্যাংশে মাত্র এক প্রকারের পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়, এবং তাহাতেই সেখানে ছন্দের ঐক্য বজায় থাকে। উদ্ধৃত প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তে তাহাই হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে একাধিক প্রকারের পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সমাবেশ বা সংযোজন একটা সুস্পষ্ট নিয়ম বা নক্সা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। যেমন,

(দৃঃ ৬) তারা সবে মিলে থাক্ | অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে, | শ্রাবণ-বর্ষণে ; ||
যোগ দিক্ নির্ঝরের | মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে | উপল-ঘর্ষণে ||

এই দৃষ্টান্তটিতে এক একটি চরণের মধ্যে পর্ব্বগুলি পরস্পর সমান নহে, কিন্তু পর পর চরণগুলি তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে একটা দৃঢ়, সুস্পষ্ট নক্সা (pattern) অনুসারে প্রত্যেকটি চরণে বিভিন্ন পরিমাপের পর্ব্বের সংযোজনা হইয়াছে। তাহাতেই ছন্দের মূলীভূত ঐক্য বজায় আছে।

যদি এইরূপ কোন সুস্পষ্ট নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন মাপের পর্ব্বের সমাবেশ করা না হয়, তবে দেখা যাইবে যে পদ্যছন্দের স্বরূপ রক্ষিত হইতেছে না। যদি ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তটি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লেখা হয়—

অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে | শ্রাবণ-বর্ষণে | তারা সব মিলে থাক ; ||
নির্ঝরের | মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে | উপল-ঘর্ষণে | যোগ দিক্ ||

তবে দেখা যাইবে যে পদ্যছন্দের লক্ষণ এখানে আর নাই। নক্সা (pattern) ভাঙিয়া যাওয়াই তাহার কারণ।

অক্ষর ও মাত্রা

বাংলা ছন্দের বিচারে পর্ব্বের পরিমাপ-ই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। এই পরিমাপ করা হয় মাত্রার সংখ্যা অনুসারে। পথের দৈর্ঘ্য যেমন মাইল বা গজ হিসাবে মাপা হয়, বাংলা পদ্যে পর্ব্ব ও চরণ ইত্যাদি মাপা হয় মাত্রা হিসাবে।

যে কোন একটি শব্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার ধ্বনি কয়েকটি 'অক্ষর' বা syllableর সমষ্টি। 'অক্ষর' বলিতে ছাপার বা লেখার একটি হরফ্ বুঝিলে ভুল করা হইবে, সংস্কৃতে 'অক্ষর' syllableর-ই প্রতিশব্দ। 'অক্ষর' বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উৎপন্ন ধ্বনি; ইহাতে একটি মাত্র স্বরের (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) ধ্বনি থাকে, ব্যঞ্জনবর্ণ জড়িত থাকিয়া অবশ্য এই স্বরধ্বনি-কে রূপান্বিত করিতে পারে। 'জননী' এই শব্দটিতে অক্ষর আছে তিনটি—জ+ন+নী। 'শরৎ' শব্দটিতে অক্ষর আছে দুইটি—শ+রৎ। 'রাখাল' শব্দটিতে অক্ষর আছে দুইটি—রা+খাল্। 'গুঞ্জন' এই শব্দটিতে অক্ষর আছে দুইটি—গুন্+জন্। বলা বাহুল্য যে ছন্দ ধ্বনিগত; ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে। সুতরাং শব্দের বানান বা লিখিত প্রতিলিপির নহে, উচ্চারিত ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সমস্ত বিচার করিতে হইবে।

বাংলা উচ্চারণের রীতিতে এক একটি অক্ষর, হয়, হ্রস্ব, না হয়, দীর্ঘ। হ্রস্ব অক্ষর এক মাত্রার ও দীর্ঘ অক্ষর দুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত হয়। কবিতার আবৃত্তির প্রতি একটু অবহিত হইলেই, কোন্ অক্ষরটি হ্রস্ব আর কোন্ অক্ষরটি দীর্ঘ উচ্চারিত হইতেছে, তাহা বোঝা যায়।

মাত্রা-বিচারের জন্য বাংলা অক্ষরকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—স্বরান্ত (যে সকল অক্ষরের শেষে একটি স্বরধ্বনি থাকে) ও হলন্ত (যে সকল অক্ষরের শেষে একটি ব্যঞ্জন বা যুক্তস্বরের ধ্বনি থাকে)। স্বরা অক্ষর সাধারণতঃ

২য় দৃষ্টান্তে 'দাঁড়ায়ে জননী' এই পর্ব্বটিতে ৬টি স্বরান্ত অক্ষর আছে। সুতরাং ইহার মোট মাত্রা-সংখ্যা – ৬। হলন্ত অক্ষর যদি কোন শব্দের শেষে থাকে, তবে সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। ২য় দৃষ্টান্ত 'শরৎ কালের' এই পর্ব্বটিতে 'রৎ' ও 'লের' এই দুইটি অক্ষর হলন্ত এবং তাহারা শব্দের অন্ত্যাক্ষর; সুতরাং তাহারা দীর্ঘ। অতএব 'শরৎকালের' এই পর্ব্বটিতে অক্ষর চারিটি হইলেও, মাত্রা-সংখ্যা—৬।

এইভাবে হিসাব করিলে দেখা যায় যে ১ম দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৮+৬, মূল পর্ব্ব ৮ মাত্রার; ২য় দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬+৩, মূল পর্ব্ব ৬ মাত্রার; ৩য় দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬+৫, মূল পর্ব্ব ৬ মাত্রার; ৪র্থ দৃষ্টান্তে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬+৩, ৬, ৬+৬, ৬+৬, ৬+৬+৬+৩, ৬+৬+৬+৩, মূল পর্ব্ব ৬ মাত্রার; ৫ম দৃষ্টান্তে মাত্রার হিসাব ৫+৫+৫+২, ৫+২, ৫+৫+২, ৫+৫+৫+২, মূল পর্ব্ব ৫ মাত্রার। এ সকল ক্ষেত্রেই একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার পর্ব্ব একমাত্র উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। (অবশ্য চরণের শেষ পর্ব্বটি পূর্ণ যতির খাতিরে অনেক সময় হ্রস্ব।) এই ভাবেই ছন্দের ঐক্য রক্ষিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তটি একটু অন্যরূপ। এখানে ঠিক একই মাপের পর্ব্ব ব্যবহৃত হয় নাই। প্রতি চরণে পর্ব্ব-বিভাগের সঙ্কেত—৮+১০+৬, কিন্তু ঠিক এই সঙ্কেতই বরাবর ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় ঐক্য বজায় আছে।

এইখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে হলন্ত অক্ষর শব্দের ভিতরে থাকিলে অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হইলে (উচ্চারণের লয় * অনুসারে) উহা হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে। আলোচ্য ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তে অনেক যুক্তাক্ষরের ব্যবহার আছে, অর্থাৎ শব্দের অন্ত ছাড়া আরও অন্যত্র হলন্ত অক্ষরের প্রয়োগ হইয়াছে। সেগুলি এখানে হ্রস্ব উচ্চারিত হইতেছে। যেমন, 'মঞ্জীর' শব্দের মধ্যে ২টি হলন্ত অক্ষর 'মন্'+'জীর'; এখানে 'মন্' হ্রস্ব, কিন্তু 'জীর্' শব্দের অন্ত্য অক্ষর বলিয়া দীর্ঘ। সেইরূপ 'গুঞ্জন' শব্দের মধ্যে 'গুন্' হ্রস্ব, কিন্তু 'জন্' দীর্ঘ।

কিন্তু অনেক স্থলে অন্যরূপ-ও হয়। যেমন

(দৃঃ ৭) শুধু গুঞ্জনে | কূজনে গন্ধে | সন্দেহ হয় | মনে
লুকানো কথার | হাওয়া বহে যেন | বন হ'তে উপ | বনে

এই শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে এখানে মূল পর্ব্ব

---

* Tempo বা speed (উচ্চারণের গতি)।

৬ মাত্রার। * 'শুধু গুঞ্জনে' পর্ব্বটিও ৬ মাত্রার ; এখানে 'গুঞ্জনে' শব্দের 'গুন্' দীর্ঘ। একটু টানিয়া বিলম্বিত লয়ে উচ্চারণ করার জন্য 'গুন্' দীর্ঘ হয়। সূক্ষ্মভাবে ধ্বনিবিচার করিলে দেখা যাইবে যে এখানে যথার্থ যুক্তাক্ষরের সংঘাত নাই। ঐ চরণের 'গন্ধে' 'সন্দেহ' প্রভৃতি শব্দেরও অনুরূপ উচ্চারণ হইবে। 'গন্ধে' শব্দের 'ন্' ও 'ধ'-এর মধ্যে যেন একটা ফাঁক্ আসিয়া পড়িয়াছে, গন্ধে= গন্+( )+ধে=৩ মাত্রা।

এইভাবে উচ্চারণের লয় অনুসারে একই অক্ষর, বিশেষতঃ হলন্ত অক্ষর, হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা পরে আলোচিত হইবে।

ছেদ

গদ্য বা পদ্য যাহাই আমরা ব্যবহার করি না কেন, মাঝে মাঝে আমাদের থামিয়া থামিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। যেখানে একটি বাক্যের (sentence or clause) শেষ হয়, সেখানে একটু বেশীক্ষণ থামিতে হয় ; আর যেখানে একটি বাক্যাংশ অর্থাৎ বিশিষ্ট অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির (phrase) শেষ হয়, সেখানে স্বল্পক্ষণ থামিতে হয়। মাঝে মাঝে এইরূপ থামা বা উচ্চারণের বিরতিকে ছেদ বলে। বাক্যের শেষে থাকে দীর্ঘতর ছেদ বা পূর্ণচ্ছেদ। বাক্যের মধ্যে এক একটি বাক্যাংশের শেষে থাকে হ্রস্বতর ছেদ বা উপচ্ছেদ। এইরূপ ছেদ না দিয়া পড়িলে আমাদের উক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করা-ই যায় না। কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি ইত্যাদির দ্বারা প্রায়শঃ উল্লেখযোগ্য ছেদের অবস্থার নির্দ্দেশ করা হয়। নিম্ন-লিখিত গদ্যাংশে * চিহ্ন দ্বারা ছেদ এবং ** চিহ্ন দ্বারা পূর্ণচ্ছেদ দেখান হইয়াছে।

জাহাজের বাঁশী * অসীম বায়ুবেগে * থর থর করিয়া * কাঁপিয়া কাঁপিয়া * বাজিতেই লাগিল ; **
(শরৎচন্দ্র—শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব্ব)

ছেদের সহিত আমাদের ভাব প্রকাশের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। যদি উপযুক্ত স্থলে ছেদ দেওয়া না হয়, তবে অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব হইবে না। যদি ছেদের অবস্থান বদ্‌লাইয়া লেখা হয়—

জাহাজের * বাঁশী অসীম * বায়ুবেগে থর * থর করিয়া কাঁপিয়া * কাঁপিয়া বাজিতেই * লাগিল **

তবে বাক্যটির অর্থ কিছুই বোঝা যাইবে না।

---

* 'হাওয়া' শব্দে দুইটি স্বরধ্বনি আছে, তিনটি নয়। হাওয়া=hawa. 'ওয়' মিলিয়া একটি ব্যঞ্জনধ্বনি=w. সংস্কৃত অক্ষরে লিখিলে হাওয়া=হ্বাবা।

পদ্যেও উপযুক্ত স্থলে ছেদ থাকে—

(দৃঃ ৮) আজ তুমি কবি শুধু, * নহ আর কেহ— **
কোথা তব রাজসভা, * কোথা তব গেহ ? **

কিন্তু উদ্ধৃত পদ্যাংশে যেখানে যেখানে ছেদ পড়িয়াছে, সেখানে যতি-ও পড়িবে। সুতরাং মনে হইতে পারে যে ছেদ ও যতি অভিন্ন। মনে হইতে পারে যে গদ্যে যাহাকে পূর্ণচ্ছেদ বলে, তাহাকেই পদ্যে বলে পূর্ণযতি, এবং গদ্যে যাহাকে উপচ্ছেদ বলে, পদ্যে তাহাকেই বলে অর্দ্ধযতি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি হইতে প্রতীত হইবে যে ছেদ ও যতি দুইটি বিভিন্ন ব্যাপার, যেখানে ছেদ থাকে সেখানে যতি না পড়িতে-ও পারে, এবং যেখানে যতি পড়ে সেখানে ছেদ না থাকিতে-ও পারে। যতির সময় হউক্ বা না হউক্, উপযুক্ত স্থলে ছেদ না দিলে পদ্যেও কোন অর্থ গ্রহণ সম্ভব হয় না।

(দৃঃ ৯) দোসর খুঁজি * ও * | বাসর বাঁধি গো ** ||
জলে ডুবি, ** বাঁচি | পাইলে ডাঙা, ** ||
কালো আর ধলো * | বাহিরে কেবল** ||
ভিতরে সবারি * | সমান রাঙা ** ||

(দৃঃ ১০) সজল ঢল | আয়ত আঁখি * ||
পিয়াল ফুল- | পরাগ মা'খি * ||
ঘুরিছে খুঁজি * | লেহন ক'রে * | মৃগ পদার | বিন্দ কার ? ** ||
ময়ুর আর * | মেলিয়া পাখা * ||
করে না আলো * | তমাল শাখা, * ||
কুসুম-কলি | ফোটে না, ** অলি | পিয়ে না মক | রন্দ তার ** ||

(দৃঃ ১১) এই কথা শুনি * আমি | আইনু পুছিতে ||
পা দুখানি। ** আনিয়াছি | কৌটায় ভরিয়া ||
সিন্দুর। ** করিলে আজ্ঞা, * | সুন্দর ললাটে ||
দিব ফোঁটা। ** ......

পর্ব্বের মধ্যে ছেদ না দিয়া ১১শ দৃষ্টান্তটি পাঠ করিলে একটা হাস্যকর হ-য-ব-র-ল সৃষ্ট হইবে।

পূর্ব্বে যে উপমা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলা যায় যে রেলগাড়ীর ইঞ্জিন্ যেমন সঞ্চিত জল নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বেই কোন কারণে পথিমধ্যে থামিতে পারে তেমনি এক এক বারের impulse বা পর্ব্ব

উচ্চারণের জন্য প্রয়াসের পরিশেষ হওয়ার পূর্ব্বেও অর্থ ও ভাব পরিস্ফুট করার জন্য সাময়িকভাবে উচ্চারণের বিরতি ঘটিতে পারে। অর্থাৎ, পর্ব্বের মধ্যেও ছেদ বসিতে পারে, তাহাতে পর্ব্বের সমাস ক্ষুণ্ণ হয় না। আবার, যেখানে ছেদ বা উচ্চারণের বিরতি সম্ভব নয়, ছেদ বসিলে অর্থ গ্রহণের ব্যাঘাত ঘটিবে, এমন স্থলেও পূর্ব্ব impulse বা ঝোঁকের শেষ হইতে পারে, সুতরাং নূতন impulse বা ঝোঁক আরম্ভ হইতে পারে, অর্থাৎ যতি থাকিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন অক্ষরের উচ্চারণ হয় না, জিহ্বা বিরাম গ্রহণ করে, কিন্তু ধ্বনির প্রবাহ থাকে এবং সেই প্রবাহে একটা নূতন ঝোঁকের তরঙ্গ অনুভূত হয়। উপরের দৃষ্টান্তগুলি সাবধানে আবৃত্তি করিলেই ছেদ ও যতির এই পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

ছেদ ও যতির পরস্পর বি-যোগ করিয়াই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও অন্যান্য বৈচিত্র্যবহুল ছন্দের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। দৃঃ ১১ মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদাহরণ।

পর্ব্বাঙ্গ

এক একটি পর্ব্বের সংগঠন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে ইহার মধ্যে ক্ষুদ্রতর কয়েকটি অঙ্গ উপাদানরূপে বর্ত্তমান। এইগুলিকে বলা হয় 'পর্ব্বাঙ্গ'। ১ম দৃষ্টান্তের 'রাখাল গরুর পাল' এই পর্ব্বটিতে আছে তিনটি অঙ্গ,—'রাখাল' + 'গরুর' + 'পাল,' এবং ইহাদের মাত্রা-সংখ্যা যথাক্রমে ৩ + ৩ + ২। সেইরূপ, ১০ম দৃষ্টান্তের 'করে না আলো' এই পর্ব্বটিতে আছে দুইটি অঙ্গ—'করে না' + 'আলো' (৩ + ২); ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তের 'অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে' এই পর্ব্বটিতে আছে তিনটি অঙ্গ—'অরণ্যের' + 'স্পন্দিত' + 'পল্লবে' (৪ + ৩ + ৩)।

পূর্ব্বে একটি উপমাতে পর্ব্বকে ফুলের মালার এক একটি ফুলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পর্ব্বাঙ্গ যেন সেই ফুলের এক একটি পাপ্‌ড়ি বা দল। বোধ হয় রসায়ন শাস্ত্র হইতে একটা উপমা দিলে ইহার স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। পর্ব্ব যদি ছন্দের অণু (molecule) হয়, তবে পর্ব্বাঙ্গ হইতেছে ছন্দের পরমাণু (atom)। যেমন এক একটি অণুতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের পরমাণু বিভিন্ন সংখ্যায় থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও অনুপাতের উপর সেই পদার্থের প্রকৃতি নির্ভর করে, সেইরূপ এক একটি পর্ব্বের মধ্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের

পর্ব্বাঙ্গ বিভিন্ন সংখ্যায় ও নানা সমাবেশে থাকে, এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও অনুপাতের উপর পর্ব্বের প্রকৃতি নির্ভর করে। 'রাখাল গরুর পাল' এই পর্ব্বটিতে ঠিক যে পারম্পর্য্যে পর্ব্বাঙ্গগুলি আছে তাহা যদি ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লেখা হয় 'গরুর পাল রাখাল,' তবে সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দঃপতন হইবে।

প্রত্যেক পর্ব্বে, হয়, দুইটি, না হয়, তিনটি করিয়া পর্ব্বাঙ্গ থাকিবে। নহিলে পর্ব্বের কোন ছন্দোলক্ষণই থাকে না। মাত্র একটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া কোন পূর্ণাবয়ব পর্ব্ব রচনা করা যায় না। (অবশ্য চরণের শেষে যে সমস্ত অপূর্ণ পর্ব্ব থাকে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।) সুতরাং শুধু 'পাল' এই শব্দ দিয়া একটা পূর্ণ পর্ব্ব গঠিত হইতে পারে না। আবার 'মধু+রাখাল+গরুর+পাল' এইরূপ চারিটি পর্ব্বাঙ্গ-বিশিষ্ট পর্ব্ব-ও সম্ভব নয়।

পর্ব্বের মধ্যে ইহার উপাদানীভূত পর্ব্বাঙ্গগুলিকে বিন্যাস করার একটা বিশিষ্ট নিয়ম আছে। হয়, পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গগুলি পরস্পর সমান হইবে, না হয়, তাহাদের সংখ্যার ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হইবে। এইজন্য ৩+৩+২ এ রকম সঙ্কেতে পর্ব্বাঙ্গ-বিন্যাস চলিবে, কিন্তু ৩+২+৩ এ রকম চলিবে না।

সুতরাং বলা যায় যে, পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বাঙ্গের পারম্পর্য্যের মধ্যে একটা সরল গতি থাকিবে। এই যে গতি বা স্পন্দন—এইখানেই পর্ব্বের প্রাণ, বা পর্ব্বের ছন্দোলক্ষণ। শুধু 'কুসুম' কথাটিতে কোন ছন্দোগুণ নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে 'কলি' কথাটি জুড়িয়া পরে যদি জিহ্বার ক্ষণিক বিরতির বা যতির ব্যবস্থা করি, অর্থাৎ 'কুসুম' ও 'কলি' এই দুইটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া 'কুসুম-কলি' এই পর্ব্বটি রচনা করি, তাহা হইলেই সেখানে একটা স্পন্দন অনুভব করিব। এই স্পন্দন-ই ছন্দের প্রাণ। বর্ত্তমান কালে ৩+২—এই গাণিতিক সঙ্কেতের দ্বারা এই স্পন্দনের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা হয়। সুরসিক প্রাচীন ছান্দসিকেরা হয়ত ইহার 'বিষম-চপলা' বা অন্য কিছু রসাল নাম দিতেন।

পর্ব্বের ভিতরে দুই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে অবশ্য যতি থাকিতে পারে না, যতি বা ঝোঁকের পরিশেষ হয় পর্ব্বের অন্তে। কিন্তু কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন হইতে পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ বোঝা যায়; যেখানে একটি পর্ব্বাঙ্গের শেষ ও অপর একটি পর্ব্বাঙ্গ আরম্ভ হয়, সেখানে ধ্বনির একটি তরঙ্গের পর অপর একটি তরঙ্গের আরম্ভ হয়। ১০ম দৃষ্টান্তে 'করে না আলো' এই পর্ব্বটির বিভাগ যে 'করে না'+ 'আলো' এইরূপ হইবে, 'করে+না আলো' কিংবা 'করে+না+আলো' হইবে

না, তাহা ধ্বনিতরঙ্গের উত্থান-পতন হইতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের ন্যায় এই ধ্বনিতরঙ্গই পর্ব্বের প্রাণ-স্বরূপ।

এ ক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পর্ব্বের ভিতরে দুই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে যতির স্থান না থাকিলেও ছেদ থাকিতে পারে (ছেদ প্রকরণ এবং দৃঃ ৯, ১০, ১১ দ্রষ্টব্য)। ছেদ কিন্তু পর্ব্বাঙ্গের ভিতরে থাকিতে পারে না। ছন্দের বিচারে পর্ব্বাঙ্গ একেবারে "অচ্ছেদ্যোঽয়ম্"।

অনেকে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের পার্থক্য ধরিতে পারেন না। কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে এ বিষয়ে ভুলের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ এক একটা ছোট গোটা মূল শব্দ, পর্ব্বাঙ্গের মাত্রা-সংখ্যা হয় ২, ৩ বা ৪, কখন ১; পর্ব্বের মাত্রা-সংখ্যা বেশী—৪ হইতে ১০ পর্য্যন্ত মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, পর্ব্বের বিশ্লেষণ করিয়া দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গ পাওয়া যাইবেই, তাহার মধ্যে একটা গতির তরঙ্গ থাকে; পর্ব্বাঙ্গ কিন্তু ছন্দের হিসাবে একেবারে পরমাণুর মত, তাহার নিজের কোন তরঙ্গ নাই, কিন্তু তাহাকে অপর পর্ব্বাঙ্গের পাশে বসাইলে ছন্দের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। পৌরাণিক উপমা দিয়া বলা যায়, পর্ব্বাঙ্গ যেন নিষ্ক্রিয় পুরুষ বা প্রকৃতির মত; কিন্তু যখন শিব ও শিবানীরূপ দুই পর্ব্বাঙ্গের মিলন ঘটে,

"বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে ওঠে তখন দুলে,"

অর্থাৎ ছন্দের সৃষ্টি হয়।

পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যাই সাধারণতঃ পদ্যছন্দের ঐক্যের বন্ধন; এক একটি চরণে বা স্তবকে ব্যবহৃত পর্ব্বগুলির, অন্ততঃ প্রতিসম পর্ব্বগুলির, মাত্রাসংখ্যা সমান সমান হয়। কিন্তু সমমাত্রিক দুই পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গের সংস্থান একরূপ হওয়ার প্রয়োজন নাই। ১ম দৃষ্টান্তে "রাখাল গরুর পাল" এবং "শিশুগণ দেয় মন" এই দুইটি পর্ব্ব প্রতিসম ও সমমাত্রিক, উভয় পর্ব্বেই ৮টি করিয়া মাত্রা আছে; কিন্তু একটি পর্ব্বে পর্ব্বাঙ্গের সংস্থান হইয়াছে ৩+৩+২ এই সঙ্কেতে, আর অপরটিতে হইয়াছে ৪+৪ এই সঙ্কেতে। সেইরূপ, ২য় দৃষ্টান্তে 'মাঝখানে তুমি' আর 'দাঁড়ায়ে জননী' এই দুইটি পর্ব্ব পরস্পর সমান, কিন্তু একটিতে পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ হইয়াছে ৪+২, আর অপরটিতে ৩+৩ এই সঙ্কেতে। এই কথা মনে রাখিলে অনেক সময়ে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের পার্থক্য ধরিতে পারা যায়। যেমন,

"মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে ক'রে"

এই চরণটির পর্ব্ববিভাগ কি ভাবে হইবে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। মূল পর্ব্ব ৪ মাত্রার ধরিয়া

মাথা খাও, | ভুলিয়ো না | খেয়ো মনে | ক'রে=(২+২)+(২+২)+(২+২)+২

এইরূপ পর্ব্ববিভাগ হইবে? না, মূল পর্ব্ব ৮ মাত্রার ধরিয়া

মাথা খাও,+ভুলিয়ো না, | খেয়ো মনে+ক'রে=(৪+৪)+(৪+২)

এইরূপ পর্ব্ববিভাগ হইবে? 'মাথা খাও' এই বাক্যাংশটি পর্ব্ব, না, পর্ব্বাঙ্গ? প্রতিসম চরণটির সহিত তুলনা করিলেই এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইবে। প্রতিসম চরণটি হইল—

মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে

মূল পর্ব্ব ৪ মাত্রার ধরিলে দুই চরণের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। কারণ—

মিষ্টান্ন র | হিল কিছু | হাঁড়ির ভি | তরে

এরূপ ভাবে যতি পড়িতে পারে না। মূল পর্ব্ব ৮ মাত্রার ধরিলে উভয় চরণের ছন্দের সঙ্গতি রক্ষা হয়।

(দৃঃ ১২। মিষ্টান্ন : রহিল : কিছু * | হাঁড়ির : ভিতরে=৮+৬

মাথা খাও * : ভুলিয়ো-না * | খেয়ো মনে : ক'রে=৮+৬

সুতরাং 'মাথা খাও' পর্ব্ব নহে, পর্ব্বাঙ্গ। 'মাথা খাও' বাক্যাংশের পরে ছন্দের যতি নহে, ভাবপ্রকাশক একটা ছেদ আছে। সমগ্র কবিতাটি-ই ('যেতে নাহি দিব'—রবীন্দ্রনাথ) ৮+৬ এই আধারের উপর রচিত।

মূলতত্ত্ব

(১) মাত্রা-সমকত্ব

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে Aristotleএর মত বলিতে ইচ্ছা করে, 'All things are determined by numbers'—সবই সংখ্যার উপর নির্ভর করে। বাংলা ছন্দ বাস্তবিক quantitative বা মাত্রাগত। এক মাত্রার বা দুই মাত্রার অক্ষরের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ; দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ দৈর্ঘ্যের পর্ব্ব। কয়েকটি পর্ব্বের সংযোগে গঠিত হয় চরণ, এবং কয়েকটি চরণের সংযোগে গঠিত হয় শ্লোক বা কলি বা স্তবক (stanza)। বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যাইবে কয়েকটি সংখ্যার হিসাব।

অক্ষরের আরও অনেক গুণ বা ধর্ম্ম আছে, যেমন accent বা ধ্বনি-গৌরব। বাংলা ছন্দে এক প্রকার ধ্বনিগৌরবের-ও একটা বিশেষ মূল্য অনেক সময় আছে। কবিতা পাঠের সময় কখনও কখনও এক একটা অক্ষরে অতিরিক্ত জোর দিয়া উচ্চারণ করা হয়। যেমন,

(পৃঃ ১৩] ঘুম্ পাড়ানি | মাসী পিসী | ঘুম্ দিয়ে | যাও

এই চরণটির প্রথমে যে 'ঘুম্' অক্ষরটি আছে, তাহার উপর অন্যান্য অক্ষরের তুলনায় অনেক বেশী জোর পড়ে। ইহাকে বলা হয় **শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত** বা বল। ইহার জন্য অক্ষরের মাত্রার ইতরবিশেষ হয়।

কিন্তু এই শ্বাসাঘাত, বা তাহার অবস্থান বা পারম্পর্য্য বাংলা ছন্দের গৌণ লক্ষণ মাত্র। ইংরাজি ইত্যাদি qualitative জাতীয় ছন্দ হইতে বাংলা ছন্দ ভিন্নজাতীয়। এক মাত্রার ও দুই মাত্রার, হ্রস্ব ও দীর্ঘ—দুই রকমের অক্ষরের বাংলা ছন্দে ব্যবহার থাকিলেও ইহাদের ধ্বনিগত পার্থক্য বা পারম্পর্য্যের উপর বাংলা ছন্দ নির্ভর করে না। যেখানে একটি দীর্ঘ অক্ষর আছে, সেখানে দুইটি হ্রস্ব অক্ষর বসাইলে বাংলা ছন্দে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সংস্কৃতে ছন্দঃপতন হয়। বাংলা ছন্দের বিচারে—

সাগর যাহার | বন্দনা রচে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে
=সাগর যাহারে | বন্দনা করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে
=জলধি যাহারে | বন্দনা করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে
=জলধি যাহারে | নিতি পূজা করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে
=জলধি যাহারে | পূজা করে নিতি | শতেক লহরি | ভঙ্গে

বাংলা ছন্দের আসল কথা—quantitative equivalence বা মাত্রা-সমকত্ব। **পর্ব্বে পর্ব্বে মাত্রা সমান আছে কি না, পর্ব্বাঙ্গে উচিত সংখ্যার মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা**—ইহাই বাংলা ছন্দের বিচারে মুখ্য প্রতিপাদ্য।

(২) অক্ষরের মাত্রার স্থিতিস্থাপকত্ব

সংস্কৃত প্রভৃতি অনেক ভাষায় প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণের একটা স্থির রীতি আছে, সুতরাং পদ্যে ব্যবহৃত প্রত্যেক অক্ষরের দৈর্ঘ্য পূর্ব্বনির্দিষ্ট। কিন্তু বাংলায় একই অক্ষর স্থানবিশেষে কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ হইতে পারে। রবীন্দ্র-নাথের কথায় বলা যায়, বাংলা অক্ষরের মাত্রা বাঙালী মেয়েদের চুলের মত ;

কখন আঁট করিয়া খোপা বাঁধা থাকে, আবার কখন এলায়িত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। উদ্ধৃত ১৩শ দৃষ্টান্তে ১ম পর্ব্বে 'ঘুম্' হ্রস্ব, ৩য় পর্ব্বে 'ঘুম্' দীর্ঘ।

অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্বভাবতঃ স্বরান্ত অক্ষর হ্রস্ব এবং হলন্ত অক্ষর শব্দের অন্ত্য অক্ষর হইলে দীর্ঘ। এই রকম উচ্চারণ অতি অনায়াসেই করা যায়, সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে অক্ষরকে 'লঘু' বলা যাইতে পারে। ১ম, ২য়, ৩য় দৃষ্টান্তে প্রত্যেকটি অক্ষরই লঘু।

হলন্ত অক্ষর শব্দের অভ্যন্তরে থাকিলে অনেক সময় হ্রস্ব হয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এইরূপ উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও, তজ্জন্য বাগ্‌যন্ত্রের একটু বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক। এজন্য এবংবিধ অক্ষরকে গুরু বলা যাইতে পারে। ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তে অনেকগুলি গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে। ইহাদের গতি নাতিদ্রুত বা ঈষদ্দ্রুত। গুরু ও লঘু অক্ষরকে স্বভাবমাত্রিক বলা যাইতে পারে।

হলন্ত অক্ষর শব্দের অভ্যন্তরে থাকিলে অনেক সময় হ্রস্ব না হইয়া দীর্ঘ হয়। ৭ম দৃষ্টান্তে এরূপ অনেক অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে। সাধারণ গতি অপেক্ষা বিলম্বিত গতিতে এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ হয়। ইহাদের বিলম্বিত অক্ষর বলা যাইতে পারে। খুব স্বাভাবিক না হইলেও, এইরূপ উচ্চারণের প্রতি আমাদের একটা সহজ প্রবণতা আছে।

আমাদের সাধারণ কথাবার্ত্তায় লঘু ও গুরু অক্ষরের ব্যবহারই বেশী। বিলম্বিত অক্ষরের-ও যথেষ্ট প্রয়োগ আছে।

কিন্তু কখনও কখনও, বিশেষতঃ পদ্যে, অন্য রকম উচ্চারণও হয়।

(দৃঃ ১৩) ঘুম পাড়ানি | মাসী পিসী | ঘুম দিয়ে | যাও = ৪ + ৪ + ৪ + ২

(দৃঃ ১৪) যোগ-মগন হর | তাপস যত দিন | ততদিন নাহি ছিল | ক্লেশ = ৮ + ৮ + ৮ + ২

১৩শ দৃষ্টান্তের ১ম পর্ব্বের 'ঘুম' অন্ত্য হলন্ত অক্ষর হইলেও হ্রস্ব। অক্ষরটিতে শ্বাসাঘাত পড়ায় এইরূপ হইয়াছে। শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের অতি-দ্রুত আন্দোলন হয়, সুতরাং এইরূপে উচ্চারিত অক্ষরকে বলা যায় অতিদ্রুত।

১৪শ দৃষ্টান্তের ১ম পর্ব্বের 'যো' ও ২য় পর্ব্বের 'তা' স্বরান্ত অক্ষর হইলেও দীর্ঘ। এরূপ উচ্চারণ কদাচ হয়, ইহাতে স্বাভাবিক রীতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যতিক্রম হয়। এইরূপ উচ্চারণ হইলে অক্ষরকে বলা যায় অতিবিলম্বিত।

অতিদ্রুত ও অতিবিলম্বিত উচ্চারণ স্বভাবতঃ হয় না, অতিরিক্ত একটা প্রভাব উচ্চারণের উপর পড়ায় এই সমস্ত মাত্রাভেদ ঘটে। এইজন্য ইহাদের প্রভাবমাত্রিক বলা যাইতে পারে।

প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের মাত্রার হিসাব লঘু অক্ষরের বিপরীত। অতিদ্রুত ও ধীরদ্রুত (গুরু) অক্ষরের গতি সমজাতীয়; বিলম্বিত ও অতিবিলম্বিত অক্ষরের গতি তাহাদের বিপরীতজাতীয়।

মাত্রাপদ্ধতি

ছন্দে বিভিন্ন প্রকৃতির অক্ষরের সমাবেশ-সম্পর্কে কয়েকটি মূল নীতি স্মরণ রাখা আবশ্যক :—

(১) কোন পর্ব্বাঙ্গে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর থাকিবে না।

(২) কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির অক্ষর একই পর্ব্বাঙ্গে ব্যবহৃত হইবে না। (অর্থাৎ, একই পর্ব্বাঙ্গে অতিদ্রুত অক্ষরের সহিত বিলম্বিত বা অতিবিলম্বিত, কিংবা অতিবিলম্বিতের সহিত ধীরদ্রুত (গুরু) বা অতিদ্রুত ব্যবহৃত হইবে না।)

লঘু অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইতে পারে।

চরণের লয় (cadence)

প্রত্যেক চরণে একটা বিশিষ্ট লয় থাকে। লয় তিন প্রকার—দ্রুত, ধীর, বিলম্বিত।

দ্রুত লয়ের চরণে পুনঃপুনঃ শ্বাসাঘাত পড়ে। ফলে একাধিক অতিদ্রুত গতির অক্ষরের ব্যবহার হয়, পর্ব্বের দৈর্ঘ্য-ও হয় ক্ষুদ্রতম, অর্থাৎ ৪ মাত্রার। এইরূপ চরণকে শ্বাসাঘাত-প্রধান বা বল-প্রধান নাম দেওয়া হইয়াছে।

(দৃঃ ৫) বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হ'ল | তিন কন্যে | দান

সাধারণতঃ দ্রুত লয়ের চরণে অতিদ্রুত ও লঘু অক্ষর থাকে, তবে উচ্চারণের মূলনীতি বজায় রাখিয়া আবশ্যকমত সব রকমের অক্ষরই ব্যবহৃত হইতে পারে।

ধীর লয়ের চরণে একটা গম্ভীর ভাব ও প্রতি অক্ষরের সহিত একটা তান

জড়িত থাকে। সুতরাং ইহাকে তান-প্রধান-ও বলা যায়। গুরু বা ধীরদ্রুত গতির অক্ষরের যথেষ্ট ব্যবহার এই লয়েই সম্ভব। ইহার পর্ব্বগুলি প্রায়শঃ দীর্ঘ হয়।

(দৃঃ ১৬) পুণ্য পাপে দুঃখ সুখে | পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও | তোমার সন্তানে

ধীর লয়ের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুরু অক্ষরের ব্যবহারই হয়। তবে অতিদ্রুত গতির অক্ষর ছাড়া আর সমস্ত অক্ষরই আবশ্যকমত ব্যবহৃত হইতে পারে।

বিলম্বিত লয়ের চরণে একটা আয়াস-বিমুখ ভাব ও একটানা মন্দ গতি থাকে। এখানে প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা এক রকম সুনির্দ্দিষ্ট—হলন্ত অক্ষর মাত্রেই দীর্ঘ, স্বরান্ত অক্ষর মাত্রেই হ্রস্ব; তবে কদাচ স্বরান্ত অক্ষরও দীর্ঘ হইতে পারে। ইহাকে ধ্বনি-প্রধান-ও বলে।

(দৃঃ ১৭) সম্মুখে চলে | মোগল সৈন্য | উড়ায়ে পথের | ধূলি
ছিন্ন শিখের | মুণ্ড লইয়া | বর্শা ফলকে | তুলি

(দৃঃ ১৮) জন-গণ-মন-অধি- | নায়ক জয় হে | ভারত-ভাগ্য-বি- | ধাতা

বিলম্বিত লয়ের চরণে অতিদ্রুত বা ধীরদ্রুত (গুরু) অক্ষর ব্যবহৃত হয় না। সাধারণতঃ লঘু ও বিলম্বিত অক্ষরই ইহাতে থাকে। কদাচ অতিবিলম্বিত অক্ষরেরও প্রয়োগ হয়।

মাত্রা-বিচার

ছন্দে মাত্রার হিসাব করিতে হইলে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক চরণের (এবং প্রায়শঃ, প্রত্যেক কবিতার) একটা বিশিষ্ট লয় থাকে। কবিতার লয় অনুসারে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অক্ষর বিবর্জন বা গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্ব্বের এক একটা ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোগুণ আছে। যেমন, ৪ মাত্রার পর্ব্ব ক্ষিপ্র, ৫ ও ৭ মাত্রার পর্ব্ব উচ্ছল, ৬ মাত্রার পর্ব্ব লঘু, ৮ মাত্রার পর্ব্ব ধীরগম্ভীর। সুতরাং ছন্দের ভাব বুঝিতে পারিলে ছন্দের রূপটি ধরা সহজ হয়।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক রকমের পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গ-বিন্যাসের একটা বিশেষ রীতি আছে, কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় করা যায় না। যেমন, ৮ মাত্রার পর্ব্বে

৩+৩+২ এই সঙ্কেতে পর্ব্বাঙ্গ বিভাগ করা যায়, কিন্তু ৩+২+৩ এই সঙ্কেতে করা যায় না।

এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে এক একটি গোটা মূল শব্দকে যতদূর সম্ভব না ভাঙিয়াই পর্ব্বের বিভাগ করিতে হয়। পর্ব্বাঙ্গ বিভাগের সময়েও যতটা সম্ভব ঐ রকম করা দরকার।

মূলীভূত পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা কি তাহা ধরিতে পারিলেই, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের মাত্রা নির্ণয় করা যায়। যেমন,

* (দৃঃ ১৯) বড় বড় মস্তকের | পাকা শস্য ক্ষেত

বাতাসে দুলিছে যেন | শীর্ষ সমেত

এখানে প্রতি চরণ ৮+৬ সঙ্কেতে রচিত। এইজন্য দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্ব্বে 'শীর্' দীর্ঘ ধরা হইল।

* (দৃঃ ১৩) ঘুম পাড়ানি | মাসী পিসী | ঘুম দিয়ে | যাও

এখানে মূল পর্ব্বে ৪ মাত্রা। সুতরাং ১ম পর্ব্বে 'ঘুম' হ্রস্ব হইলেও, ৩য় পর্ব্বের 'ঘুম' দীর্ঘ হইবে।

বস্তুতঃ অক্ষরের হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব নির্ভর করে ছন্দের একটা ছাঁচ, রূপকল্প, আদর্শ বা পরিপাটীর (pattern) উপর।

সুতরাং বাংলা ছন্দে মাত্রার বিচার করিতে গেলে ছন্দের পরিপাটী (pattern) কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করাই প্রধান কাজ। তাহা হইলেই প্রত্যেক অক্ষরের যথাযথ উচ্চারণ ও মাত্রা স্থির করা যাইবে। নিম্নেরদৃষ্টান্তে এই পরিপাটী অনুসারেই মাত্রা বিচার করিতে হইয়াছে। এখানে চরণের পরিপাটী—৪+৪+৪+২ ; প্রতি মূল পর্ব্বে ৪ মাত্রা, পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ ২+২ কিম্বা ৩+১।

* (দৃঃ ২০) বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান

শিব ঠাকুরের | বিয়ে হল | তিন কন্যে | দান

এক কন্যে | রাঁধেন বাড়েন | এক কন্যে | খান

এক কন্যে | না খেয়ে | বাপের বাড়ী | যান

---

* অক্ষরের মাত্রানির্দ্দেশক চিহ্নগুলির তাৎপর্য্য 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র'-শীর্ষক পরিচ্ছেদের ১৪ক অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে।

ছন্দোবন্ধ

পূর্ব্বকালে বাংলা কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী (বা লাচাড়ি) নামে মাত্র দুই প্রকার ছন্দোবন্ধ সুপ্রচলিত ছিল। পয়ারের প্রতি চরণে ৮+৬ মাত্রার ২টি পর্ব্ব, মোট ১৪ মাত্রা থাকিত, এবং এইরূপ দুইটি চরণে মিত্রাক্ষর (rime) বা চরণের অন্তে মিল রাখিয়া এক একটি শ্লোক রচিত হইত। ইহার লয় ছিল ধীর। অদ্যাবধি বাংলার অধিকাংশ দীর্ঘ ও গম্ভীর কবিতা এই পয়ারের আধারেই রচিত হয়। ইংরাজী কাব্যে iambic pentameterএর যেরূপ প্রাধান্য, বাংলা কাব্যে পয়ারের পরিপাটীর প্রাধান্যও তদ্রূপ। আধুনিক কালে ৮+১০ এই পরিপাটীর চরণ ইহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে ; যথা—

(দৃঃ ২১) হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ | অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে | অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত

ত্রিপদী-ও প্রতিসম দুই চরণের মিত্রাক্ষর শ্লোক। প্রতি চরণের পর্ব্ববিভাগ ছিল ৬+৬+৮ বা ৮+৮+১০ ; প্রথম দুইটি পর্ব্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত। প্রথম প্রকারকে লঘু ও দ্বিতীয় প্রকারকে দীর্ঘ ত্রিপদী বলা হইত।

কালক্রমে চরণের এবং চরণের সমবায়ে স্তবকের (stanza) সংগঠনে বহু বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। তবে ১০ মাত্রার অধিক দীর্ঘ পর্ব্ব এবং ৫ পর্ব্বের অধিক দীর্ঘ চরণ দেখা যায় না। বর্ত্তমানে ৬ মাত্রার পর্ব্বের চতুষ্পর্ব্বিক বা ত্রিপর্ব্বিক বিলম্বিত লয়ের চরণ খুব প্রচলিত।

বাংলা কাব্যে মিল বা মিত্রাক্ষরের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। স্তবক-গঠনে মিত্রাক্ষর-ই অন্যতম প্রধান উপাদান। তদ্ভিন্ন চরণের মধ্যেও পর্ব্বে পর্ব্বে মিত্রাক্ষর কখনও কখনও থাকে। যেমন,

(দৃঃ ২২) শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভুঁই | আর সবি গেছে | ঋণে

যেখানে শ্লোক বা স্তবক নাই, এমন স্থলেও (যেমন, 'বলাকা'র ছন্দে) ছেদের অবস্থান নির্দ্দেশ করার জন্য মিত্রাক্ষরের ব্যবহার হয়।

কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দও বাংলায় বেশ চলে। মধুসূদন দত্ত-ই এই ছন্দের প্রচলনের জন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের আধার ৮+৬ বা পয়ারের চরণ। কিন্তু তিনি এই আধারে ছন্দের সম্পূর্ণ নূতন একটা নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ছেদ ও যতির পরস্পর সংযোগের

পরিবর্ত্তে তিনি ইহাদের বি-যোগকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ফলে, যতির নিয়মানুসারিতার জন্য একটা ঐক্যসূত্র থাকিলেও ছেদের অবস্থানের জন্য বৈচিত্র্য-ই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দৃঃ ১১ ইহার উদাহরণ।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধে মিত্রাক্ষরের অভাব-ই প্রধান লক্ষণ নয়। কারণ, মিত্রাক্ষর বসাইলেও ইহার মূল প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা,' 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি কাব্যে মিত্রাক্ষর থাকিলেও তাহারা সাধারণ মিত্রাক্ষর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতির সহোদরস্থানীয়। ঠিক কয় মাত্রার পর ছেদ থাকিবে সে বিষয়ে এই নূতন প্রকৃতির ছন্দোবন্ধে কোন মাপা-জোকা নিয়ম নাই—ইহাই এই ছন্দের বিশেষত্ব। সুতরাং এই প্রকৃতির ছন্দোবন্ধকে বলা উচিত অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর।

অমিতাক্ষরের মূল নীতিকে অবলম্বন করিয়াই 'গৈরিশ' (গিরিশচন্দ্রের নাটকে বহুল-ব্যবহৃত) ছন্দ, ও রবীন্দ্রনাথের 'বলাকার ছন্দ' সৃষ্ট হইয়াছে।

গৈরিশ ছন্দের উদাহরণ—

(দৃঃ ২৩) অতি ছল, অতি খল | অতীব কুটিল=৮+৬
তুমিই তোমার মাত্র | উপমা কেবল=৮+৬
তুমি লজ্জাহীন=০+৬
তোমারে কি লজ্জা দিব=৮+০
সম তব | মান অপমান=৪+৬

'বলাকার ছন্দে'র উদাহরণ নিম্নের কয়েকটি পংক্তিতে পাওয়া যাইবে—

(দৃঃ ২৪) হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা=০+১০
যেন শূন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা=৮+১০
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্=০+১০
শুধু থাক্=৪
এক বিন্দু নয়নের জল=০+১০
কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্জ্বল=৮+৬
এ তাজমহল=৬

এ সমস্ত ছন্দে ছেদের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট নহে, যতির দিক্ দিয়াও কোন নিয়মানুসারিতা নাই। সুতরাং ঐক্যের চেয়ে বৈচিত্র্যেরই প্রাধান্য। তবে পদ্যছন্দের পর্ব্বই ইহাদের উপকরণ—এবং একটা আদর্শ (archetype)-স্থানীয় পরিপাটীর আভাস সর্ব্বদাই থাকে। ২৩শ দৃষ্টান্তে ১৪ মাত্রার চরণের ও ২৪শ দৃষ্টান্তে

১৮ মাত্রার চরণের আভাস আছে। 'বলাকার ছন্দে' মিত্রাক্ষরের ব্যবহার হওয়াতে বিভিন্ন গঠনের চরণগুলি সুসংবদ্ধ হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন গ্রাম্য ছড়াতে অন্য এক প্রকারের ছন্দোবন্ধ প্রচলিত ছিল। এগুলিতে শ্বাসাঘাত ঘন ঘন পড়িত, ও সঙ্কেত ছিল ৪ + ৪ + ৪ + ২/১। দৃঃ ২০ ইহার উদাহরণ। এখন এ প্রকার ছন্দোবন্ধ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যেও প্রচলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা,' 'পলাতকা' প্রভৃতি কাব্যে ইহার বহুল ব্যবহার হইয়াছে। যথা,

(দৃঃ ২৫) আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে
দৈবে হতেম | দশম রত্ন | নব রত্নের | মালে

দ্বিতীয় ভাগ

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র *

[১] যে ভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দঃ বলে।

ব্যাপক অর্থে ধরিলে ছন্দঃ সর্ব্ববিধ সুকুমার কলার লক্ষণ। সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সমস্ত সুকুমার কলাতেই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ রীতি অবলম্বন করিয়া উপকরণগুলির সমাবেশ না করিলে মনে কোনরূপ রসের সঞ্চার হয় না। এই রীতিকেই rhythm বা ছন্দঃ বলা হয়। মানুষের বাক্য-ও বহুল পরিমাণে ছন্দোলক্ষণযুক্ত। সাধারণ কথাবার্ত্তাতেও অনেক সময় অল্পাধিক পরিমাণে ছন্দোলক্ষণ দেখা যায়। কখন কখন সুলেখকগণের গদ্য-রচনাতে সুস্পষ্ট ছন্দোলক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পদ্যেই ছন্দের লক্ষণগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে ও স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান থাকে। বতে গেলে ছন্দই কাব্যের প্রাণ। ছন্দোযুক্ত বাক্য বা পদ্যই কাব্যের বাহন।

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বাংলা পদ্যছন্দের উপাদান ও তাহার রীতির আলোচনা করা হইবে। ছন্দঃ বলিতে এখানে metre বা পদ্যছন্দঃ বুঝিতে হইবে।

[২] যদি ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়া বিভিন্ন বাক্যাংশ কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ † অনুসারে যোজনা করা হয়, তবে সেখানে ছন্দঃ আছে, বলা যাইতে পারে।

সঙ্গীতে অনেক সময় সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যত্যয় করিয়া তাল ঠিক রাখা হয়, অর্থাৎ ছন্দঃ বজায় রাখা হয়। 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' এই বাক্যটি লইয়াও গানের কলি রচিত হইয়াছে। কবিতায় এরূপ স্বাধীনতা চলে না।

কোন একটি বিশেষ pattern বা আদর্শ-অনুসারে উপকরণগুলি সংযোজিত

---

* এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ে ইহাদের অনেকগুলি সূত্রের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

† আদর্শ কথাটি এখানে Pattern অর্থে ব্যবহৃত হইল। নক্সা, ছাঁচ, পরিপাটী ইত্যাদি কথাও প্রায় ঐ ভাব প্রকাশ করে। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ 'রূপকল্প' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

না হইলে ছন্দোবোধ আসে না। সমস্ত শিল্পসৃষ্টিতেই আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। ঐ আদর্শই আমাদের রসানুভূতির symbol বা বাহ্য প্রতীক। আমাদের সর্ব্ববিধ কার্য্যের মধ্যে কোন না কোন এক প্রকার আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। জোড়ায় জোড়ায় জিনিষ রাখা বা ব্যবহার করা, দুই দিক্ সমান করিয়া কোন কিছু তৈয়ার করা—এ সমস্তই আমাদের আদর্শানুকরণের পরিচয় প্রদান করে। এরূপ না করিলে সমস্ত ব্যাপারটা খাপছাড়া ও বিশ্রী বলিয়া বোধ হয়।

উপরে অতি সরল দুই-এক প্রকার আদর্শের উদাহরণ মাত্র দেওয়া হইল। নানারূপ জটিল রসানুভূতির জন্য নানারূপ জটিল আদর্শেরও ব্যবহার হইয়া থাকে।

আদর্শের পৌনঃপুনিকতা হইতে ছন্দের উপকরণগুলির মধ্যে এক প্রকার ঐক্য অনুভূত হয় এবং সে জন্য তাহাদের ছন্দোবদ্ধ বলা হয়। এই ঐক্যবোধ ছন্দোবোধের ভিত্তিস্থানীয়।

[৩] বাংলা পদ্যে পরিমিত কালানন্তরে সমধর্ম্মী বাক্যাংশের যোজনা হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে।

নানা ভাষায় নানা প্রকৃতির ছন্দ আছে। বাক্যের ধর্ম্ম নানাবিধ। প্রত্যেক ভাষাতেই দেখা যায় যে, জাতির প্রকৃতি ও উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে এক এক জাতির ছন্দঃ বাক্যের এক একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে।

বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃতে দেখিতে পাই যে অক্ষরের দৈর্ঘ্যই ছন্দের ভিত্তি-স্থানীয়, এবং একটা বিশেষ আদর্শ অনুসারে হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ অবলম্বন করিয়াই ছন্দঃ রচিত হয়।

ইংরাজিতে অক্ষরের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য বা accent-ই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। প্রতি চরণে কয়টি accent, এবং চরণের মধ্যে accented ও unaccented অক্ষরের কি পারম্পর্য্য, ইহার উপরই ছন্দের ভিত্তি।

অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনেক ছন্দে এবং বাংলা ছন্দে দেখিতে পাওয়া যায় যে জিহ্বার সাময়িক বিরতি বা যতিই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। ঠিক কতক্ষণ পরে পরে যতির আবির্ভাব হইবে, তাহাই এখানে মুখ্য তথ্য। দুই যতির মধ্যে কালপরিমাণই বাংলা ছন্দের প্রধান বিচার্য্য বিষয়।

অক্ষর (Syllable)

[৪] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা syllable। (চলিত বাংলায় অনেক সময় অক্ষর বলিতে এক একটি লিখিত হরফ্ মাত্র

বুঝায়। কিন্তু ব্যুৎপত্তি-হিসাবে অক্ষরের অর্থ syllable, এবং এই অর্থেই ইহা সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাতেও এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার করা উচিত।)

অক্ষরকে বিশ্লেষ করিলে এক একটি বিশিষ্ট ধ্বনি (sound, phone) পাওয়া যায়, এই ধ্বনিকে বাক্যের 'পরমাণু' বলা যাইতে পারে। যথা—'কা', 'এক্', 'ক্রী', 'প্লু', 'গৌ', 'চল্'—অক্ষর; 'ক্', 'আ', 'এ', 'র্', 'ঈ', 'প্', 'ল্', 'উ', 'গ', 'ঔ', 'চ্', 'অ'—ধ্বনি।

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহাই অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরধ্বনি থাকিবেই; তদ্ভিন্ন স্বরের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি ব্যঞ্জনবর্ণও উচ্চারিত হইতে পারে। স্বরবর্ণের বিনা সাহায্যে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না। *

অক্ষর দুই প্রকার—**স্বরান্ত** (open), ও **হলন্ত** (closed); স্বরান্ত অক্ষর যথা—'না', 'যা', 'দে', 'সে' ইত্যাদি; হলন্ত অক্ষর, যথা—'জল', 'হাত', 'বাঃ' ইত্যাদি।

[৫] **ছন্দের আলোচনার সময় উচ্চারণের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।** লিখিত হরফ্ বা বর্ণ এবং অক্ষর এক নহে। তদ্ভিন্ন ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংলার প্রচলিত বর্ণমালা হইতে এই ভাষার সব কয়টি প্রধান ধ্বনির (phoneme-এর) পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক সময় দুইটি লিখিত স্বরবর্ণ জড়াইয়া মাত্র একটি স্বরের ধ্বনি পাওয়া যায়। 'বেরিয়ে যাও' এই বাক্যের শেষ শব্দ 'যাও' বাস্তবিক একাক্ষর, শেষের 'ও' ভিন্নরূপে উচ্চারিত হয় না, পূর্ব্ববর্ত্তী 'আ' ধ্বনির সহিত জড়াইয়া থাকে। কিন্তু 'আমাদের বাড়ী যেও'—এই বাক্যের শেষ শব্দটি দুইটি অক্ষরযুক্ত, কারণ শেষের 'ও' ভিন্নরূপে স্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে।

তদ্ভিন্ন কখন কখন এক একটি স্বর লেখার সময় ব্যবহৃত হইলেও পড়ার সময় বাস্তবিক বাদ যায়। যেমন, কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ-রীতি অনুসারে 'লাফিয়ে' এই শব্দটার উচ্চারণ হয় যেন 'লাফ^ইয়ে'='লাফ্যে', 'তুই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিস্'—ইহার উচ্চারণ হয়, 'তুই বুঝি লুক্যে লুক্যে দেখিস্'†।

---

* Semi-vowel-জাতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণের বিনা সহায়তায় উচ্চারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তখন এই প্রকারের ব্যঞ্জনবর্ণ syllabic অর্থাৎ অক্ষর-সাধক ও স্বরবর্ণের সামিল হয়।

† সধবার একাদশী—দীনবন্ধু মিত্র।

অধিকন্তু স্বরবর্ণের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা বিবেচনার সময়ও উচ্চারণরীতি স্মরণ রাখিতে হইবে। 'হেমেন' বলিতে গেলে 'হে' অক্ষরটির 'এ' হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হয়; কিন্তু কাহাকেও কিছু দূর হইতে ডাকিতে গেলে যখন 'ওহে রমেন' বলিয়া ডাকি, তখন 'ওহে' শব্দের 'হে' দীর্ঘস্বরান্ত হয়।

তদ্ভিন্ন, স্বরবর্ণের মধ্যে মৌলিক ও যৌগিক (diphthong) ভেদে দুই জাতি আছে। 'অ, আ, ই (ঈ), উ (ঊ), এ, ও, অ্যা' প্রভৃতি মৌলিক স্বর; 'ঐ' যৌগিক-স্বর, কারণ ইহা বাস্তবিক 'ও'+'ই' এই দুইটি স্বরের সংযোগে রচিত। তদ্রূপ 'ঔ', 'আই', 'আও' ইত্যাদি যৌগিক স্বর।

যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে হলন্ত অক্ষরেরই সামিল।

[৬] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধর্ম্ম—[১] তীব্রতা (pitch) —শ্বাস বহির্গত হইবার সময় কণ্ঠস্থ বাক্‌তন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অনুসারে তাহাদের দ্রুত বা মৃদু কম্পন সুরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে; [২] গাম্ভীর্য্য (intensity বা loudness)—অক্ষরের উচ্চারণের সময় যত বেশী পরিমাণে শ্বাসবায়ু একযোগে বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতে ও স্পষ্টরূপে স্বর শ্রুতিগোচর হইবে; [৩] স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (length বা duration)—যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্‌যন্ত্র কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে; [৪] স্বরের 'রঙ্' (tone-colour)—শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্বরের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনিরও সৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা হয় 'স্বরের রঙ্'।

এই চারিটি ধর্ম্মের মধ্যে দৈর্ঘ্য ও গাম্ভীর্য্য এই দুইটি লইয়াই বাংলা ছন্দের কারবার। অবশ্য, কথা বলিবার সময় নানা লক্ষণাক্রান্ত অক্ষর-সমষ্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইতে থাকে। কিন্তু ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণকে উপেক্ষা করিয়া, দুই একটি বিশেষ লক্ষণকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এ সম্বন্ধে রীতি বিভিন্ন।

ছেদ, যতি ও পর্ব্ব

[৭] কথা বলার সময় আমরা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না; ফুস্‌ফুসের বাতাস কমিয়া গেলেই ফুস্‌ফুসের সঙ্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে

সই সঙ্কোচের জন্য কম বা বেশী আয়াস বোধ হয়। সেইজন্য কিছু সময় পরেই ফুস্‌ফুসের আরামের জন্য এবং মাঝে মাঝে তৎসঙ্গে পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে। নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ করা যায় না।

এই রকমের বিরতির নাম 'বিচ্ছেদ-যতি', বা শুধু ছেদ (breath-pause)। খানিকটা উক্তি অথবা লেখা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। এইরূপ প্রত্যেকটি অংশ এক একটি breath-group বা **শ্বাস-বিভাগ**, কারণ তাহা একবার বিরতির পর হইতে পুনরায় বিরতি পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধ্বনির সমষ্টি। এইরূপ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া ধ্বনির বিচ্ছেদ-স্থল বা 'ছেদ' আছে। ব্যাকরণ-অনুযায়ী প্রত্যেক sentence বা বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাস-বিভাগ বা কয়েকটি শ্বাস-বিভাগের সমষ্টি। কখন কখন একটি clause বা খণ্ড-বাক্য পূর্ণ শ্বাস-বিভাগ হয়।

বাক্যের শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, সে জন্য ইহাকে **পূর্ণচ্ছেদ** (major breath-pause) বলা যাইতে পারে। বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন phrase বা অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির মধ্যে সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে **উপচ্ছেদ** (minor breath-pause) বলা যায়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ অনুসারে বৃহত্তর শ্বাস-বিভাগ (major breath-group) ও ক্ষুদ্রতর শ্বাস-বিভাগ (minor breath-group) গঠিত হয়।

ছেদ বা বিচ্ছেদ যতিকে 'ভাব-যতি' (sense-pause)-ও বলা যাইতে পারে। উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানে অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে; বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, উপচ্ছেদ থাকার দরুন তাহা বুঝা যায়—একটি বাক্য অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ থাকে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ঘটে ও বাক্যের শেষ হয়। এ জন্য phrase ও sentence-কে 'অর্থ-বিভাগ' (sense-group) বলা যাইতে পারে।

লিখন-রীতি অনুসারে যেখানে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন বসান হয়, সেখানে প্রায়ই কোন এক প্রকার ছেদ থাকে— হয়, পূর্ণচ্ছেদ, না হয়, উপচ্ছেদ। ব্যাকরণের নিয়মে যেখানে full-stop বা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, ছন্দের নিয়মে সেখানেও major breath-pause বা পূর্ণচ্ছেদ পড়িবে। কিন্তু যেখানে কমা, সেমিকোলন আদি পড়ে না, এমন স্থলেও উপচ্ছেদ পড়ে, এবং যেখানে syntax-এর (অর্থাৎ

বাক্যরীতিগত) পূর্ণচ্ছেদ নাই, সেখানেও ছন্দের পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্ :—

রামগিরি হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত * প্রাচীন ভারতবর্ষের * যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্যদিয়া * মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে * জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, * * সেখান হইতে * কেবল বর্ষাকাল নহে, * চিরকালের মতো * আমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছি * *। (মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

উপরের বাক্যটিতে যেখানে একটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার সময় সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে ; এইটুকু না থামিলে কোন্ শব্দের সহিত কোন্ শব্দের অন্বয়, ঠিক বুঝা যায় না ; এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্যটি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। যেখানে দুইটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ও বাক্যের শেষ হইয়াছে ; সেখানে উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং সম্পূর্ণ প্রশ্বাস-ত্যাগের পর নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়।

[৮] যেখানে ছেদ থাকে, সেখানে সব কয়টি বাগ্‌যন্ত্রই বিরাম পায়। এক ছেদ হইতে অপর ছেদ পর্য্যন্ত এক একটি শ্বাস-বিভাগের মধ্যে এক রকম অনর্গল বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া চলিতে থাকে। তজ্জন্য বাগ্‌যন্ত্রের ক্লান্তি ঘটে এবং পুনশ্চ শক্তিসঞ্চারের আবশ্যকতা হয়। ছেদের সময় অবশ্য সমস্ত বাগ্‌যন্ত্রই নূতন করিয়া শক্তিসঞ্চারের অবসর পায়। কিন্তু ছেদ ভাবের অনুযায়ী বলিয়া সব সময় নিয়মিত ভাবে বা তত শীঘ্র পড়ে না, অথচ পূর্ব্ব হইতেই জিহ্বার ক্লান্তি ঘটিতে পারে, এবং বিরামের আবশ্যকতা হইতে পারে। এক এক বারের ঝোঁকে কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহ্বা এই বিরামের আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামের পর আবার এক ঝোঁকে পুনশ্চ কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ করে। এই বিরামস্থলকে বিরাম-যতি বা শুধু যতি নাম দেওয়া যাইতে পারে। যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি impulse বা ঝোঁকের শেষ ; এবং তাহার পরে আর একটি ঝোঁকের আরম্ভ।

অবশ্য অনেক সময়ই ছেদ ও যতি এক সঙ্গে পড়ে। কিন্তু সর্ব্বদাই এরূপ হয় না। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ না হয়, তখন যতি-পতনের সময় ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে ; শুধু জিহ্বার ক্রিয়া থাকে না, এবং স্বর একটা drawl বা দীর্ঘ টানে পর্য্যবসিত হয়। আবার জিহ্বা যখন impulse বা ঝোঁকের

বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়া থাকে; তখন মুহূর্ত্তের জন্য ধ্বনি স্তব্ধ হয়, কিন্তু জিহ্বা বিশ্রাম গ্রহণ করে না, ঝোঁকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবার নূতন ঝোঁকের আরম্ভ হয় না।

[৯] **যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের ঐক্যবোধ জন্মে।** পরিমিত কালানন্তরে কোন আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই। ছেদ sense বা অর্থ অনুসারে পড়ে; সুতরাং ইহার দ্বারা পদ্য অর্থানুযায়ী অংশে বিভক্ত হয়। জিহ্বার সামর্থ্যানুসারে যতি পড়ে। ইহার দ্বারা পদ্য পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক ছন্দোবিভাগ বাগ্‌যন্ত্রের এক এক বারের ঝোঁকের মাত্রানুসারে হইয়া থাকে। এই ঝোঁকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের ঐক্যের লক্ষণ।

বাংলা পদ্যে এক একটি ছন্দোবিভাগের নাম **পর্ব্ব** (measure বা bar)। পরিমিত মাত্রার পর্ব্ব দিয়াই বাংলা ছন্দ গঠিত হয়। **এক এক বারের ঝোঁকে ক্লান্তিবোধ বা বিরামের আবশ্যকতা বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম পর্ব্ব। পর্ব্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ।**

পর্ব্বের সহিত পর্ব্ব গ্রথিত করিয়াই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয়। পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা হইতেই ছন্দের চাল বোঝা যায়। পর্ব্বের দৈর্ঘ্য (অর্থাৎ মাত্রাসংখ্যা) ঠিক রাখিয়া নানাভাবে চরণ ও স্তবক (stanza) গঠন করিলেও ছন্দের ঐক্য বজায় থাকে, কিন্তু যদি পর্ব্বের দৈর্ঘ্যের হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের দৈর্ঘ্য বা স্তবক-গঠনের রীতির দ্বারাই ছন্দের ঐক্য বজায় রাখা যাইবে না। *

তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি—

এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা।

সকল বেলা কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়—

এই চরণটিতেও সতের মাত্রা। কিন্তু এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্যা সমান

---

* কেবল অমিতাক্ষর ছন্দে—যেখানে বৈচিত্র্যের দিকেই ঝোঁক বেশী সেই ক্ষেত্রে—ইহার ব্যতিক্রম কখনও কখনও দেখা যায়—

...মস্তকে পড়িবে ঝরি | —তারি মাঝে যাব অভিসারে ||
তার কাছে | —জীবন সর্ব্বস্বধন | অর্পিয়াছি যারে ||
(এবার ফিরাও মোরে, রবীন্দ্রনাথ)

হইলেও তাহাদিগকে এক গোত্রে ফেলা যাইবে না, এই দুইটি চরণ একই স্তবকে স্থান পাইবে না। কারণ, ইহাদের চাল ভিন্ন। এই পার্থক্যের স্বরূপ বোঝা যায় চরণের উপকরণস্থানীয় পর্ব্বের মাত্রা হইতে।

প্রথম চরণটিতে মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ—

তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি। (=৬+৬+৫)

দ্বিতীয় চরণটিতে মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ—

সকল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায়। (=৫+৫+৫+২)

ছয় মাত্রার ও পাঁচ মাত্রার পর্ব্বের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথক্। এই পার্থক্যের জন্যই উদ্ধৃত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়।

ছেদ যেমন দুই রকম, যতিও সেইরূপ মাত্রাভেদে দুই রকম—অৰ্দ্ধযতি ও পূর্ণযতি। ক্ষুদ্রতর ছন্দোবিভাগ বা পর্ব্বের পরে অৰ্দ্ধযতি, এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ বা চরণের পরে পূর্ণযতি থাকে।

[১০] বাংলা কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই উপচ্ছেদ ও অৰ্দ্ধযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি অবিকল মিলিয়া যায়। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। সময়ে সময়ে ছেদ ছন্দোবিভাগের মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা স্রোতের মধ্যে বিচিত্র আন্দোলন সৃষ্টি করে।

নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ছেদ ও যতির প্রকৃতি প্রতীত হইবে—

([*] ও [* *], এই দুই সঙ্কেতদ্বারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং [|] [‖] এই সঙ্কেতদ্বারা অৰ্দ্ধযতি ও পূর্ণযতি নির্দ্দেশ করিতেছি।)

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল * | ঈশ্বরী পাটনী * * ‖
একা দেখি কুলবধূ * | কে বট আপনি * * ‖ (অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র)

গগন ললাটে * | চূর্ণকায় মেঘ * |
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে * * ‖
কিরণ মাখিয়া * | পবনে উড়িয়া * |
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে * * ‖ (আশাকানন, হেমচন্দ্র)

আমি যদি | জন্ম নিতেম * | কালিদাসের | কালে * * ‖
দৈবে হতেম | দশম রত্ন * | নবরত্নের | মালে * * ‖
(সেকাল, রবীন্দ্রনাথ)

আর—ভাষাটাও তা | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না * রয় | খাড়া * * ||
আর—ভাবের মাথায় | লাঠি মারলেও * | দেয় নাকো সে | সাড়া * * ||
সে—হাজার-ই পা | ছুলাই, * গোঁফে | হাজার-ই দিই | চাড়া ;* * ||

(হাসির গান, দ্বিজেন্দ্রলাল)

একাকিনী শোকাকুলা | অশোক কাননে ||
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা * | আঁধার কুটীরে ||
নীরবে। * * দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়া ||
ফেরে দূরে, * মত্ত সবে | উৎসব কৌতুকে। * * ||

(মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন)

গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা | রটি' গেল ক্রমে * ||
মৈত্র মহাশয় যাবে | সাগর সঙ্গমে * ||
তীর্থস্নান লাগি'। * * | সঙ্গীদল গেল জুটি' ||
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, * | নৌকা দুটি ||
প্রস্তুত হইল ঘাটে। * *

(দেবতার গ্রাস, রবীন্দ্রনাথ)

পর্ব্ব (Bar) ও পর্ব্বাঙ্গ (Beat)

[১১] ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দ কয়েকটি পর্ব্ব (অর্থাৎ এক এক ঝোঁকে উচ্চারিত বাক্যাংশ) লইয়া গঠিত হয়। ছন্দোরচনা করিতে হইলে সমান মাপের, বা কোন নিয়ম অনুসারে পরিমিত মাপের, পর্ব্ব ব্যবহার করিতে হইবে। পূর্ব্বের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ দৃষ্টান্তে সমান মাপের পর্ব্বই প্রায় ব্যবহার করা হইয়াছে, কেবল ১ম, ৩য়, ৪র্থ দৃষ্টান্তে প্রতি পংক্তির শেষে যেখানে পূর্ণচ্ছেদ আছে, সেখানে পর্ব্বটি ঈষৎ ছোট হইয়াছে, এবং ২য় দৃষ্টান্তে পূর্ণচ্ছেদের পূর্ব্বের পর্ব্বটি ঈষৎ বড় হইয়াছে।

সাধারণতঃ **পর্ব্ব মাত্রেই কয়েকটি শব্দের সমষ্টি।** শব্দ বলিতে মূল শব্দ বা বিভক্তি বা উপসর্গ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। এরূপ কয়েকটি শব্দ লইয়া একটি বৃহত্তর পদ রচিত হইলেও, ছন্দের বিভাগের সময় প্রত্যেকটি গোটা শব্দকে বিভিন্ন ধরিতে হইবে। 'গুলি', 'দ্বারা', 'হইতে' ইত্যাদি সমস্ত বিভক্তি, মাপে ও ব্যবহারে, শব্দের অনুরূপ তাহাদিগকেও ছন্দের হিসাবে

এক একটি শব্দ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই **শব্দই** বাংলা উচ্চারণের ভিত্তিস্থানীয়।

প্রত্যেকটি পর্ব্ব দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। * ১ম দৃষ্টান্তে 'একা দেখি কুলবধূ' এই পর্ব্বটিতে 'একা দেখি' ও 'কুলবধূ' এই দুইটি পর্ব্বাঙ্গ আছে। সাধারণতঃ **এক একটি পর্ব্বাঙ্গ-ও, হয়, একটি মূল শব্দ, না হয়, কয়েকটি মূল শব্দের সমষ্টি।** (পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ দেখাইবার জন্য [:] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে।)

[১২] পূর্ব্বে স্বরের গাম্ভীর্য্যের কথা বলা হইয়াছে। কথা বলিবার সময় বরাবর সব কয়টি অক্ষর সমান গাম্ভীর্য্য সহকারে উচ্চারণ করা যায় না। গাম্ভীর্য্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়াই নিয়ম। সাধারণ বাংলা উচ্চারণে প্রতি শব্দের প্রথমে স্বরের গাম্ভীর্য্য কিছু বেশী হয়, শব্দের শেষে কিছু কম হয়। প্রত্যেকটি পর্ব্বাঙ্গের প্রথমেও স্বরগাম্ভীর্য্য বেশী, শেষে কিছু কম। যদি একই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে একাধিক শব্দ থাকে, তবে প্রথম শব্দ অপেক্ষা পরবর্ত্তী শব্দের গাম্ভীর্য্য কম হয়; পর্ব্বাঙ্গের প্রথম হইতে গাম্ভীর্য্য একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে, পর্ব্বাঙ্গের শেষে সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। পরবর্ত্তী পর্ব্বাঙ্গ আরম্ভ হইবার সময় পুনশ্চ গাম্ভীর্য্য বাড়িয়া যায়। এইরূপে **স্বর-গাম্ভীর্য্যের বৃদ্ধি অনুসারে পর্ব্বাঙ্গ বিভাগ করা যায়।** 'একা দেখি কুলবধূ' এইটি পড়িতে গেলে 'এ' উচ্চারণের সময় বাগ্‌যন্ত্রের impulse বা ঝোঁকের আরম্ভ হয় এবং পর্ব্বও আরম্ভ হয়। সেই সময়ে স্বরের যেটুকু গাম্ভীর্য্য তাহা ক্রমশঃ কমিতে কমিতে 'খি' উচ্চারণের সময় সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়, তাহার পর 'কু' উচ্চারণের সময় আবার স্বরের গাম্ভীর্য্য বাড়িয়া 'ধূ' উচ্চারণের সময় সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। সেই সময়ে উচ্চারণ-প্রয়াসের কথঞ্চিৎ বিরতি ঘটে, নূতন ঝোঁকের জন্য নূতন করিয়া শক্তি-সঞ্চার আবশ্যক হয়। সুতরাং ঐখানে পর্ব্বেরও শেষ হয়।

---

* কিন্তু শুধু দুই আর তিন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বোধ হয় গণিতের দার্শনিক তত্ত্ব, বা বিশ্বরহস্যের সঙ্কেত হিসাবে গণিতের মূল্য, ইত্যাদি জটিল তথ্যের আলোচনা করিতে হয়। সৃষ্টির মূলতত্ত্বের বিভাগ করিতে গিয়া আমরা জড় ও চৈতন্য, প্রকৃতি ও পুরুষ—এইরূপ দুইটি ভাগ, কিংবা কোন একটা Trinity—যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এইরূপ তিনটি ভাগ করি কেন? আমাদের পক্ষে শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে গণিতে ২ আর ৩-কে প্রাথমিক জোড় ও বিজোড় সংখ্যা বলা হয়, এবং তাহা হইতেই যে সমস্ত সংখ্যার উৎপত্তি তাহা স্বীকার করা হয়। এইরূপ কোন দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে ছন্দোবিজ্ঞানে ২ আর ৩-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা যায়।

কিন্তু শ্বাসাঘাত বা একটা অতিরিক্ত জোর দিয়া যখন কবিতা পাঠ করা যায়, তখন স্বরগাম্ভীর্য্যের বৃদ্ধি শব্দের প্রথমে না হইয়া শেষেও হইতে পারে—

'যেথায় সুখে | তরুণ যুগল | পাগল হ'য়ে | বেড়ায়'

এইটি পাঠ করিতে গেলে দেখা যায়, রেফ-চিহ্নিত অক্ষরগুলি শব্দের শেষে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ঐ ঐ অক্ষরে স্বরগাম্ভীর্য্যের হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হইয়াছে

দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গ লইয়া একটি পর্ব্ব গঠিত হওয়ায় স্বর-গাম্ভীর্য্যের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য পর্ব্বের মধ্যে একরূপ স্পন্দন অনুভূত হয়। **এই স্পন্দনটুকু ছন্দের প্রাণ**। এই স্পন্দন থাকার জন্য পর্ব্ব কাব্যের উপকরণ এবং ভাবপ্রকাশের বাহন হইয়াছে, এবং শ্রবণমাত্র মনে আবেগের উৎপাদন ও রসের স্পৃহা আনয়ন করে।

মাত্রা (Mora)

[১৩] **বাংলা ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। মাত্রার মূল তাৎপর্য্য duration বা কালপরিমাণ।** এক একটি অক্ষরের উচ্চারণে কি পরিমাণ সময় লাগে তদনুসারে মাত্রা স্থির করা হয়। কিন্তু মাত্রার এই মূল তাৎপর্য্য হইলেও সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ববিষয়ে যে শুদ্ধ কাল-পরিমাণ অনুসারে মাত্রার হিসাব করা হয়, তাহা নহে। বাস্তবিক, উচ্চারণের সময় বিভিন্ন অক্ষরের কালপরিমাণের নানারূপ বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ছন্দের মাত্রার হিসাবের সময়ে প্রতি অক্ষরের কালপরিমাণের সূক্ষ্ম বিচার করা হয় না। সাধারণতঃ হ্রস্ব বা একমাত্রার এবং দীর্ঘ বা দুইমাত্রার—এই দুই শ্রেণীর অক্ষর গণনা করা হয়। কখন কখন তিনমাত্রার অক্ষরও স্বীকার করা হয়। কিন্তু সব দীর্ঘ বা হ্রস্ব অক্ষরের কালপরিমাণ যে এক, কিম্বা দীর্ঘ অক্ষর মাত্রেরই উচ্চারণে যে হ্রস্ব অক্ষরের ঠিক দ্বিগুণ সময় লাগে, তাহা নহে। নানা কারণে কোন কোন অক্ষরকে অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয়; তখন তাহাকে বলা হয় দীর্ঘ, এবং তাহার অনুপাতে অপরাপর অক্ষরকে বলা হয় হ্রস্ব।

সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় কোন্ অক্ষরের মাত্রা কত হইবে, তদ্বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট বিধি আছে। কিন্তু বাংলায় তত বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। অক্ষরের অবস্থান, ছন্দের প্রকৃতি ইত্যাদি অনুসারে অনেক সময় মাত্রা স্থির হয়। যদিও ছন্দে সাধারণ উচ্চারণের রীতির বিশেষ ব্যত্যয় করা চলে না, তত্রাচ ছন্দের খাতিরে

একটু আধটু পরিবর্ত্তন করা চলে। আর, মাত্রার দিক্ দিয়া বাংলা উচ্চারণের রীতিও একেবারে বাঁধা-ধরা নয়। যাহা হউক, কোনরূপ সন্দেহ বা অনিশ্চিততার ক্ষেত্রে ছন্দের আদর্শ (pattern) অনুসারেই শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির করিতে হয়।

[১৪] মাত্রা বিচারের জন্য বাংলা অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে :—

বাংলা অক্ষর (Syllable)

- মৌলিক-স্বরান্ত (open)
  - হ্রস্ব (লঘু) (স্বভাব-মাত্রিক) [১]
  - দীর্ঘ (অতি-বিলম্বিত) (প্রভাব-মাত্রিক) [২]
- হলন্ত (closed) [যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর ইহার অন্তর্ভুক্ত]
  - অন্ত্য (শব্দের বা পর্ব্বাঙ্গের অন্তে অবস্থিত)
    - দীর্ঘ (লঘু) (স্বভাব-মাত্রিক) [৩]
    - হ্রস্ব (অতি-দ্রুত) (প্রভাব-মাত্রিক) (শ্বাসাঘাত-যুক্ত) [৪]
  - আভ্যন্তর (শব্দের বা পর্ব্বাঙ্গের অন্ত ভিন্ন আদ্য, মধ্য ইত্যাদি স্থলে অবস্থিত)
    - হ্রস্ব (ধীর-দ্রুত) (স্বভাব-মাত্রিক) (গুরু) [৫]
    - দীর্ঘ (ধীর-বিলম্বিত) [৬]
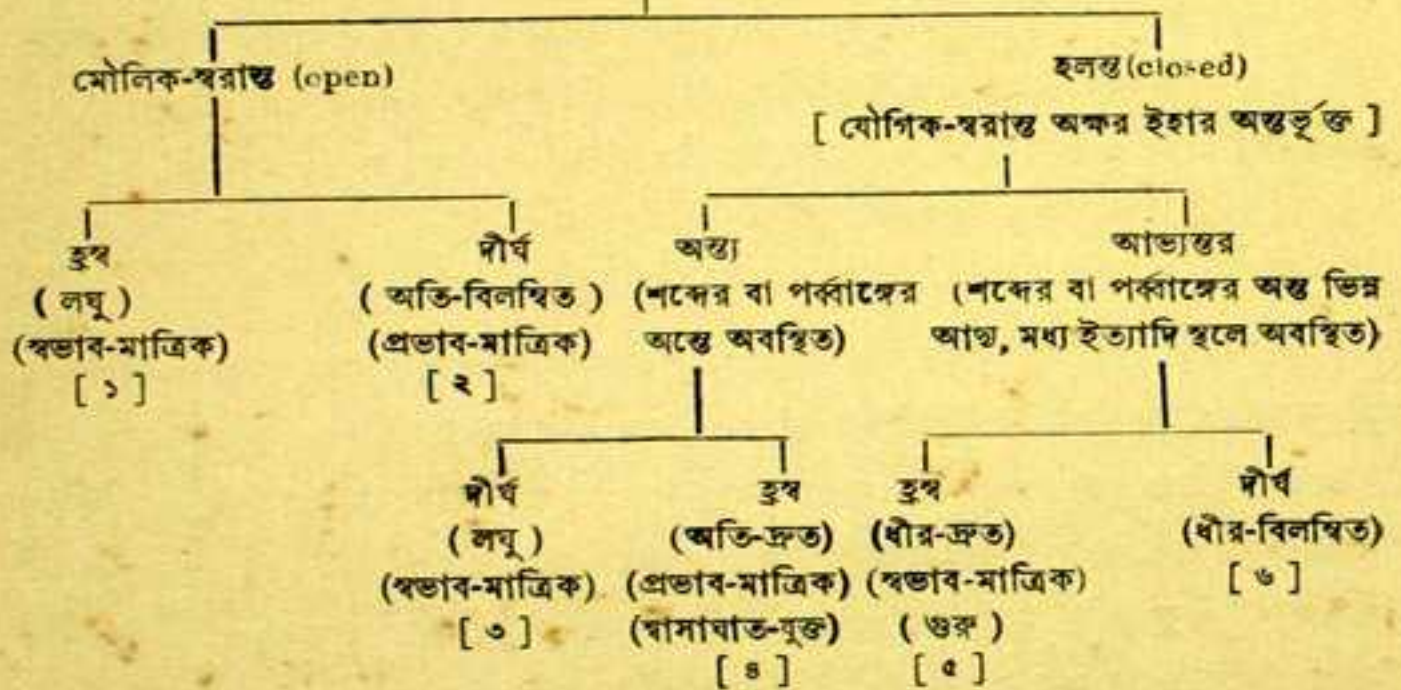
নিম্নে ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইল :

"ঈশানের পুঞ্জমেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে।"

এই চরণে 'ঈ' 'শা' 'বে' গে' ইত্যাদি (১) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ অক্ষর স্বভাবতঃ হ্রস্ব, সুতরাং ইহাদের স্বভাব-মাত্রিক বলা যাইতে পারে। উচ্চারণের সময়ে বাগ্‌যন্ত্রের বিশেষ কোন প্রয়াস হয় না বলিয়া ইহাদের "লঘু" বলা যাইতে পারে।

ঐ চরণে "নের", "মেঘ" ইত্যাদি (৩) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে ইহারা দীর্ঘ, সুতরাং ইহাদেরও স্বভাবমাত্রিক বলা যায়। এরূপ অক্ষর উচ্চারণের জন্যও বাগ্‌যন্ত্রের কোন বিশেষ প্রয়াস হয় না, সুতরাং ইহাদেরও "লঘু" বলা যায়।

ঐ চরণে 'পুঞ্জ' শব্দের 'পুঞ্', 'অন্ধ' শব্দের 'অন্', (৫) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সব স্থলে যথার্থ যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত এখানে আছে। একটি অক্ষরের ধ্বনি অব্যবহিত পরবর্ত্তী অক্ষরের ধ্বনির সহিত মিশিয়াছে। সাধারণ উচ্চারণরীতি অনুসারে ইহারা হ্রস্ব। সুতরাং ইহাদেরও স্বভাব-মাত্রিক বলা যায়। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণের জন্য বাগযন্ত্রের একটু বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক। এজন্য ইহাদের গুরু বলা যাইতে পারে। লঘু অক্ষরের মত ইহাদের যদৃচ্ছ ব্যবহার করা যায় না, কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। (এই বিধিনিষেধগুলি পরে উল্লেখ করা হইবে।)

"জন-গণ-মন-অধি- | -নায়ক জয় হে | ভারত-ভাগ্য-বি- | -ধাতা"

এই চরণটিতে 'না', 'হে', 'ভা', 'ধা', 'তা'—(২) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ নহে, অতিরিক্ত একটা টানের প্রভাবে ইহারা দীর্ঘ হয়। স্বরান্ত অক্ষরের স্বাভাবিক মাত্রার প্রসারণ হয় বলিয়া ইহাদের 'প্রসার-দীর্ঘ' বলা যায়। অতিরিক্ত একটা প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাত্রা নিরূপিত হয় বলিয়া ইহাদের 'প্রভাব-মাত্রিক' বলা যাইতে পারে।

"এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক- | ময়ি"

এই চরণটিতে 'কৌ', 'নিত্য' শব্দের 'নিত্' (৬) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সব স্থলে যুক্তবর্ণের ব্যবহার থাকিলেও যথার্থ যুক্তাক্ষর বা ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত নাই। 'নিত্য' শব্দের 'নিত্' ও 'ত্য' এই দুইটি অক্ষরের ধ্বনির মধ্যে একটু ফাঁক (space) আছে। এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ খুব সাধারণতঃ হয় না বটে, কিন্তু বাগ্‌যন্ত্রের কোন আয়াস হয় না বলিয়া এইরূপ উচ্চারণের প্রতি একটা প্রবণতা আমাদের আছে।

"দেশে দেশে | খেলে বেড়ায় | কেউ করে না | মানা"

এই চরণটিতে 'ড়ায়্', 'কেউ', (৪) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ অক্ষর স্বভাবতঃ হ্রস্ব নহে, কেবল অতিরিক্ত শ্বাসাঘাতের (stress) প্রভাবে ইহাদের মাত্রার সঙ্কোচন হয়। সুতরাং ইহাদিগকে 'সঙ্কোচ-হ্রস্ব' বলা যায়। একটা বিশেষ প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাত্রা নিরূপিত হয় বলিয়া ইহাদেরও 'প্রভাবমাত্রিক' বলা যাইতে পারে।

বাংলায় যে স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি প্রচলিত, সাধারণতঃ গদ্যে আমরা যেরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি, তদনুসারে (১), (৩) ও (৫) এই কয় শ্রেণীর অক্ষরই

পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাদের **স্বভাবমাত্রিক** বলা হইয়াছে। পয়ারজাতীয় ছন্দোবন্ধে সমস্ত অক্ষরই প্রায়শঃ **স্বভাবমাত্রিক** হয়। কদাচ অন্যথাও দেখা যায়। উদাহরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে (৫) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও একটু আয়াস-সাধ্য বা গুরু। স্বভাবমাত্রিক ছাড়া অন্যান্য অক্ষর,—অর্থাৎ (২), (৪), (৬) শ্রেণীর অক্ষরকে **কৃত্রিমমাত্রিক** বলা যাইতে পারে।

(১) ও (৩) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের বিশেষ কোন আয়াস আবশ্যক হয় না। এইরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য সর্ব্বদাই একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে। ইহাদের এইজন্য **লঘু** নাম দেওয়া হইয়াছে।

(২) ও (৪) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ কেবলমাত্র একটা বিশেষ প্রভাবের জন্যই সম্ভব। মাত্রার পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী বলিয়া তাহাদের **প্রভাবমাত্রিক** বলিয়া এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা যায়। ইহাদের ব্যবহার অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয়। *

[১৪ক] একটি হ্রস্ব স্বর বা হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাই এক মাত্রার পরিমাণ। এক একটি দীর্ঘ অক্ষরকে দুই মাত্রার সমান বলিয়া ধরা হয়।

সাধারণতঃ হ্রস্বাক্ষর-নির্দ্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [⌣] চিহ্ন, এবং দীর্ঘাক্ষর-নির্দ্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [–] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে। সময়ে সময়ে বাংলা ছন্দে অক্ষরের বিশেষ প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য অক্ষরের উপর (॰) চিহ্নদ্বারা স্বরান্ত হ্রস্বাক্ষর, (‖) চিহ্নদ্বারা স্বরান্ত দীর্ঘ অক্ষর, (⌣) চিহ্নদ্বারা গুরু অক্ষর, (´) চিহ্নদ্বারা শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর, (–) চিহ্নদ্বারা আভ্যন্তর হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর, এবং (ঃ) চিহ্নদ্বারা অন্ত্য হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর নির্দ্দেশ করা হইবে। এই চিহ্নগুলি দ্বারা আমরা উদ্ধৃত চরণগুলিতে এইভাবে অক্ষরের মাত্রা জ্ঞাপন করিতে পারি।

---

* সংস্কৃতে সকল হ্রস্ব অক্ষর-ই লঘু ও সকল দীর্ঘ অক্ষরই গুরু বলিয়া পরিগণিত হয়। সংস্কৃত উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের জন্য সংস্কৃত ছন্দে হ্রস্ব ও লঘু, দীর্ঘ ও গুরু সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাংলায় উচ্চারণের পদ্ধতি অন্যরূপ, সুতরাং সকল হ্রস্ব অক্ষর-ই লঘু ও সকল দীর্ঘ অক্ষরই গুরু এরূপ বলা যায় না। আসলে হ্রস্ব (short) ও লঘু (light)—এই দুইটি শব্দের প্রত্যয় এক নহে; দীর্ঘ (long) ও গুরু (heavy)—এই দুইটি শব্দেরও প্রত্যয় বিভিন্ন। হ্রস্ব ও দীর্ঘ—অক্ষরের কাল-পরিমাণ নির্দ্দেশ করে; লঘু ও গুরু—অক্ষরের ভার অর্থাৎ উচ্চারণের আয়াস নির্দ্দেশ করে।

ঈশানের পুঞ্জমেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে

জন-গণ-মন-অধি- | নায়ক জয় হে | ভারত ভাগ্য-বি- | -ধাতা

একি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক- | -ময়ি

[১৪খ] অক্ষরের এবংবিধ মাত্রাভেদ ঘটে উচ্চারণের আপেক্ষিক গতির (speed, tempo) পার্থক্য অনুসারে। গতি তিন প্রকার—দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত। মধ্য গতিতে উচ্চারণ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত। লঘু অক্ষরের উচ্চারণ হয় মধ্য গতিতে। যখন শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন গতি হয় অতিদ্রুত। গুরু অক্ষরের উচ্চারণের গতি ধীরদ্রুত, অর্থাৎ মধ্য ও অতিদ্রুতের মাঝামাঝি। স্বরান্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন তাহার গতি অতিবিলম্বিত। আভ্যন্তর হলন্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন তাহার গতি ধীরবিলম্বিত, অর্থাৎ, মধ্য ও অতিবিলম্বিতের মাঝামাঝি।

সুতরাং গতি অনুসারে অক্ষরের এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ করা যায় :—

অতিদ্রুত = অন্ত্য হলন্ত হ্রস্ব [´]	(শ্বাসাঘাতযুক্ত)		(প্রভাবমাত্রিক)
ধীরদ্রুত = আভ্যন্তর " " [‿]	(গুরু)	স্বভাবমাত্রিক	
মধ্য = স্বরান্ত " [·]	(লঘু)	স্বভাবমাত্রিক	
মধ্য = অন্ত্য হলন্ত দীর্ঘ [:]	(লঘু)	স্বভাবমাত্রিক	
ধীরবিলম্বিত = আভ্যন্তর " " [—]			
অতিবিলম্বিত = স্বরান্ত " [‖]			(প্রভাবমাত্রিক)

স্বভাবমাত্রিক অক্ষর লঘু ও গুরু ভেদে দুই প্রকার ; এবং প্রভাবমাত্রিক অক্ষর অতিদ্রুত ও অতিবিলম্বিত ভেদে দুই প্রকার।

দ্রুত ও বিলম্বিত গতি পরস্পরের বিপরীত।

মাত্রা-পদ্ধতি

[১৫] (ক) কোন পর্ব্বাঙ্গে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর থাকিবে না।

প্রভাবমাত্রিক অক্ষর সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী। একই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে একাধিক এবংবিধ অক্ষরের ব্যবহার আমাদের উচ্চারণ-পদ্ধতির একান্ত বিরোধী।

সুতরাং যে পর্ব্বাঙ্গে একটি অতিদ্রুত (শ্বাসাঘাতযুক্ত) অক্ষর থাকে, তাহার আর কোন অক্ষর অতিদ্রুত বা অতিবিলম্বিত হইবে না। এবং যে পর্ব্বাঙ্গে একটি অতিবিলম্বিত অক্ষর থাকে, তাহার আর কোন অক্ষর অতিদ্রুত বা অতিবিলম্বিত হইবে না।

(খ) কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির অক্ষর একই পর্ব্বাঙ্গে ব্যবহৃত হইবে না।

সুতরাং যে পর্ব্বাঙ্গে অতিদ্রুত (শ্বাসাঘাতযুক্ত) অক্ষর আছে, সে পর্ব্বাঙ্গে ধীরবিলম্বিত বা অতিবিলম্বিত অক্ষর থাকিবে না, এবং যে পর্ব্বাঙ্গে অতিবিলম্বিত অক্ষর আছে সে পর্ব্বাঙ্গে ধীরদ্রুত (গুরু) বা অতিদ্রুত (শ্বাসাঘাতযুক্ত) অক্ষর ব্যবহৃত হইবে না।

(গ) লঘু অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে পারে।

উচ্চারণের এই কয়টি মূল নীতি স্মরণ রাখিলে দেখা যাইবে যে পাঁচ প্রকার বিভিন্ন গতির অক্ষরের সর্ব্ববিধ সমাবেশ ছন্দে চলিতে পারে না, মাত্র কয়েক প্রকার সমাবেশই চলিতে পারে।

গণিতের হিসাবে নিম্নোক্ত ১৫টি সমাবেশ সম্ভব—

(১) অতিদ্রুত + অতিদ্রুত ×
(২) " + ধীরদ্রুত (গুরু)
(৩) " + লঘু
(৪) " + ধীরবিলম্বিত ×
(৫) " + অতিবিলম্বিত ×
(৬) ধীরদ্রুত (গুরু) + ধীরদ্রুত (গুরু)
(৭) " + লঘু
(৮) " + ধীরবিলম্বিত
(৯) " + অতিবিলম্বিত ×
(১০) লঘু + লঘু
(১১) " + ধীরবিলম্বিত
(১২) " + অতিবিলম্বিত

(১৩) ধীরবিলম্বিত + ধীরবিলম্বিত
(১৪) „ + অতিবিলম্বিত
(১৫) অতিবিলম্বিত + অতিবিলম্বিত ×

পূর্ব্বোক্ত ১৫ক ও ১৫খ সূত্র অনুসারে × চিহ্নিত সমাবেশগুলি অচল।

[১৬] বাংলায় সমস্ত মৌলিক স্বরই হ্রস্ব। সুতরাং **মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর মাত্রেই সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হয়। স্থান-বিশেষে কিন্তু মৌলিক দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষরও দেখা যায়।**

যথা—[ক] অনুকারধ্বনি-সূচক, আবেগ-সূচক বা সম্বোধক একাক্ষর শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যেমন—

হী হী শবদে | অটবী পুরিছে (হেমচন্দ্র, ছায়াময়ী)
বল ছিন্ন বীণে | বল উচ্চৈঃস্বরে
না - না - না | মানবের তরে (কামিনী রায়)

রে সতি রে সতি | কাঁদিল পশুপতি (হেমচন্দ্র, দশমহাবিদ্যা)

[খ] যে শব্দের শেষের কোন অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার অন্তে স্বর থাকিলে সেই স্বর দীর্ঘ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

নাচ ত সীতারাম | কাঁকাল বেঁকিয়ে (ছড়া)

[গ] সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত মতে দীর্ঘ, তাহা আবশ্যক মত দীর্ঘ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে—

ভীত-বদনা | পৃথিবী হেরিছে (হেমচন্দ্র)

আসিল যত | বীর-বৃন্দ | আসন তব | ঘেরি (রবীন্দ্রনাথ)

এইরূপ ক্ষেত্রে যে সর্ব্বদাই অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া ধরিতে হইবে, এমন নয়; তবে ইহাদিগকে আবশ্যক-মত দীর্ঘ করা চলে, এবং করা হইয়াও থাকে।

[ঘ] ছন্দের আবশ্যকতা অনুসারে অন্যান্য স্থলেও মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর দীর্ঘ ধরা যায়। যেমন—

কাঁদিল পশুপতি

পাগল শিব প্রমথেশ

কিন্তু সেরূপ দীর্ঘীকরণ কৃত্রিমতা দোষে কথঞ্চিৎ দুষ্ট।

[১৬ক] স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ বা প্রসারণ-সম্পর্কে কতকগুলি বিধি-নিষেধ আছে।

(অ) কোন পর্ব্বাঙ্গে একাধিক স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ হইবে না।

(১৫ ও ২১চ সূত্র দ্রষ্টব্য)

এরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক। ধ্বনি-প্রবাহের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গে বা পর্ব্বাঙ্গে গতির সারল্য বজায় রাখিতে হয় বলিয়া একাধিক এরূপ অক্ষরের ব্যবহার হয় না।

নারদ : স্ববিবর | কম্পিত : থরথর | বিশ্ব-বি- : -দারণ | হুঙ্কার : শ্রবণে |

(হেমচন্দ্র—দশমহাবিদ্যা)

প : ঞ্জাব : সিন্ধু | গুজরাট : মরাঠা | দ্রাবিড় : উৎকল | বঙ্গ

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এই দুইটি চরণে প্রভাবদীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে, এবং তৎসম শব্দেরও যথেষ্ট ব্যবহারের জন্য সংস্কৃতমতে উচ্চারণের প্রবৃত্তি আসিতেছে, কিন্তু কোন পর্ব্বাঙ্গেই একাধিক অতিবিলম্বিত অক্ষরের ব্যবহার নাই। সংস্কৃত রীতি অনুসারে 'হুঙ্কারে'র 'কা' দীর্ঘ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু (বাংলা ছন্দের রীতি অনুসারে) উহার প্রসারণ হয় নাই। সেইরূপ 'গুজরাটের' 'রা' এবং 'মরাঠা'র 'রা' কাহারও প্রসারণ হয় নাই। যদি দ্বিতীয় পংক্তিটির রূপ

পঞ্জাব সিন্ধু | গায়ো : ঢাকা | ......

এই ধরণের করার চেষ্টা হইত তবে দ্বিতীয় পর্ব্বে ছন্দঃপতন হইত।

এই জন্য গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'যমুনা-লহরী' কবিতাটির

কত শত : সুন্দর | নগরী : তীরে | রাজিছে : তটযুগ | তুমি ও

—এই চরণটিতে দ্বিতীয় পর্ব্বটির উচ্চারণ বাংলা ছন্দোরীতির বিরোধী হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু—

কত শত : সুন্দর | নগরী : উভতটে | ......

এইরূপ লিখিলে বাংলা ছন্দের রীতির বিরোধী হইত না।

যে সব ক্ষেত্রে মনে হয় যে এই রীতির লঙ্ঘন করিয়াও ছন্দ ঠিক আছে,

সেখানে দেখা যাইবে যে দীর্ঘীকৃত অক্ষর দুইটি দুই বিভিন্ন পর্ব্বাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ; যেমন—

তব শুভ : না : মে | জা : গে = (৪ + ২ + ২) + (২ + ২)

তব শুভ : আশীষ | মা : গে = (৪ + ৪) + (২ + ২)

গা : হে : তব জয় | গা : থা = (২ + ২ + ৪) + (২ + ২)

(আশীষ শব্দের 'শী' সংস্কৃত-মতে দীর্ঘস্বরান্ত হইয়াও যে এখানে হ্রস্ব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ইহা লক্ষণীয়।)

'যমুনা-লহরী' হইতে যে চরণটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় পর্ব্বটির

নগরী : তী : রে

এইরূপ পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ করিলেও সুশ্রাব্য হয় না। এ ক্ষেত্রে আর একটি নিষেধ স্মরণ রাখিতে হইবে—

(আ) কোন পর্ব্বেই উপর্য্যুপরি দুইটির বেশী অক্ষরের প্রসারণ হইবে না। *

এইজন্য যাঁহারা সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা অনেক সময়েই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ 'পজ্ঝটিকা' ছন্দের কথা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গোদেশ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দে 'কর্ণবিমর্দ্দনকাহিনী' বলিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাতেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 'পজ্ঝটিকা' ছন্দ মাত্রাসমকজাতীয় বলিয়া বাংলা ছন্দের পর্ব্বপর্ব্বাঙ্গ বিভাগের সহিত ইহার গঠনের সাদৃশ্য আছে ; সেই কারণে বাংলা ছন্দের রীতির সহিত ঐ কবিতাটির কতকগুলি চরণের বেশ সামঞ্জস্য হইয়াছে ; যথা—

হুজুর হুজুর বলি | জীবন : মরণে

কর্ণ বি- : মর্দ্দন | মর্ম্ম কি : গূ : ঢ়

ইত্যাদি চরণে স্থানে স্থানে সাধারণ বাংলা উচ্চারণের কিছু ব্যত্যয় হইলেও বাংলা ছন্দের রীতি বজায় আছে। কিন্তু অপরাপর স্থলে বাংলা ছন্দের রীতির সহিত একান্ত বিরোধ ঘটিয়াছে ; যেমন—

জা নো : না কি ক | দাচন : মূঢ়

এ কে : বা রে | মা থা : খো রে

---

* খাসাঘাতও একই পর্ব্বে উপর্য্যুপরি দুইটির বেশী অক্ষরে পড়িতে পারে না।

স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ যে কেবলমাত্র তৎসম শব্দে হয় তাহা নহে। ভারতচন্দ্রের—

(কত) নিশান কর্‌ফর্‌ | নিনাদ ধর্‌ধর্‌ | কামান গর্‌গর্‌ | গাজে

(সব) জুবান রজ্‌পুত | পাঠান মজ্‌বুত | কামান শর্‌যুত | সাজে

প্রভৃতি চরণ হইতেই তাহা প্রতীত হইবে। এখানে 'জুবান', 'পাঠান', 'কামান', 'নিশান' কোনটিই তৎসম শব্দ নহে।

সংস্কৃতগন্ধি ছন্দোবন্ধেও সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ অক্ষরের প্রসারণ পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ-গঠনের আবশ্যকতা-মতেই হইয়া থাকে। যথা,

তু ষ্টি নি : কেতন | রিষ্টি বি : নাশক | সৃষ্টি : পালন : লয় | কারী (ঈশ্বর গুপ্ত)

'পা' ও 'রী' সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ হইয়াও বাংলা উচ্চারণ ও ছন্দের রীতি-অনুসারে হ্রস্ব উচ্চারিত হইতেছে।

তদ্রূপ,

চীন গগন হতে | পূর্ব্ব গগন স্রোতে | শ্যামল রসধর | পুঞ্জ (রবীন্দ্রনাথ)

শ্বাপদ হৃদি ক্রূর | শার্দ্দূল কুক্কুর | লোলরসনা তুলি | সিন্ধুতে ভাসিছে (হেমচন্দ্র)

উদ্ধৃত চরণগুলিতে যে যে অক্ষরের নীচে × চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে সেগুলি সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ হইয়াও হ্রস্ব উচ্চারিত হইতেছে। অথচ, অনুরূপ অনেক অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণও ঐ ঐ চরণেই হইতেছে।

(ই) কোন পর্ব্বাঙ্গে অতিবিলম্বিত অক্ষরের ব্যবহার হইলে, সেই পর্ব্বাঙ্গে দ্রুত গতির কোন অক্ষর ব্যবহৃত হইবে না।

(সূঃ ১৫ দ্রষ্টব্য)

সুতরাং যে পর্ব্বাঙ্গে স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ হয়, সেখানে গুরু অথবা শ্বাসাঘাত-যুক্ত অক্ষর থাকে না।

পূর্ব্বে যে উদাহরণগুলি দেওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই ইহার যাথার্থ্য প্রতীত হইবে।

(ঈ) কোন পর্ব্বাঙ্গে স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ করিতে হইলে, পর্ব্বাঙ্গের আদ্য অক্ষরকেই, যোগ্য হইলে, সর্ব্বোপযুক্ত স্থল

বিবেচনা করিতে হইবে; নতুবা, পর্ব্বাঙ্গের অন্ত্য অক্ষরের এবং, তাহাও উপযুক্ত না হইলে, কোন মধ্য অক্ষরের প্রসারণ হইবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রসারদীর্ঘ অক্ষরটি পর্ব্বাঙ্গের আদ্য অক্ষর। (প্রসারণের পক্ষে কোন কোন অক্ষরের যোগ্যতা অধিক তাহা ২৯ সং সূত্রে বলা হইয়াছে।)

ভীমা লম্বোদরা | ব্যাঘ্র চর্ম্মপরা | ...... (দশমহাবিদ্যা)

এই চরণের প্রথম পর্ব্বের প্রথম পর্ব্বাঙ্গ 'ভীমা'য় দুইটি অক্ষরই সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ; কিন্তু দ্বিতীয়টির প্রসারণ না করিয়া প্রথমটির করিতে হইবে।

পঞ্জাব সিন্ধু | গুজরাট মরাঠা | ......

এই চরণের দ্বিতীয় পর্ব্বের দ্বিতীয় পর্ব্বাঙ্গে 'রা,' 'ঠা' দুইটি অক্ষরের শেষেই আ-কার আছে; কিন্তু 'রা' অক্ষরটির প্রসারণ না করিয়া 'ঠা' অক্ষরটির প্রসারণ করিতে হইবে।

সুচারু মনোহর | হের নিকটে তার | অন্ত ভুবন কিবা | (দশমহাবিদ্যা)

এই চরণের প্রথম পর্ব্বের প্রথম পর্ব্বাঙ্গে মধ্যের অক্ষরটির প্রসারণ হইয়াছে, কারণ সংস্কৃত-মতে দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষর বলিয়া হ্রস্বস্বরান্ত প্রথম ও অন্ত্য অক্ষর (সু, রু) অপেক্ষা ইহার প্রসারণের যোগ্যতা অধিক।

কোন কোন স্থলে কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যদি সন্নিহিত কতকগুলি পর্ব্বাঙ্গে বা পর্ব্বে একই স্থলে প্রসারদীর্ঘ অক্ষর থাকে, তবে ছন্দের প্রবাহের গতি সমান রাখার জন্য কখন কখন উল্লিখিত উপযোগিতার ক্রম লঙ্ঘন করা হয়।

নিশান ফরফর | নিনাদ ধরধর | কামান গরগর | গাজে
জুয়ান রজপুত | পাঠান মজবুত | কামান শরযুত | সাজে

প্রথম চরণের প্রথম দুই পর্ব্বে দ্বিতীয় অক্ষরের প্রসারণ হইয়াছে বলিয়া, তৃতীয় পর্ব্বে-ও তাহা করা হইয়াছে, যদিও তৃতীয় পর্ব্বের প্রথম অক্ষরের যোগ্যতা কম ছিল না। দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বেও ঐরূপ হইয়াছে।

[১৭] হলন্ত ও যৌগিকস্বরান্ত অক্ষরের ব্যাপার অন্যবিধ। ইহারা স্বভাবতঃ মৌলিকস্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। কারণ হলন্ত অক্ষরের

অন্তর্গত স্বরের উচ্চারণের পরও শেষ ব্যঞ্জনবর্ণটি উচ্চারণ করিতে কিছু সময় বেশী লাগে; তেমনি যৌগিক স্বরে একটি প্রধান বা পূর্ণ (syllabic) স্বরের পরে একটি অপ্রধান বা অপূর্ণ স্বর থাকে এবং সেই অপ্রধান (non-syllabic) স্বরটি উচ্চারণের জন্য কিছু বেশী সময় লাগে। এইজন্য হলন্ত ও যৌগিকস্বরান্ত অক্ষরের নাম দেওয়া যাইতে পারে **যৌগিক অক্ষর। ছন্দের মধ্যে ব্যবহার করিতে গেলে, তাহাদিগকে হয়, এক মাত্রার, নয়, দুই মাত্রার বলিয়া ধরিতে হইবে;** অর্থাৎ হয়, কিছু দ্রুত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে হ্রস্ব করিয়া লইতে হইবে, না হয়, কিছু বিলম্বিত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে দীর্ঘ করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু শব্দের বা পর্ব্বাঙ্গের অন্ত্য হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরাই সাধারণ রীতি; যথা—'রাখাল' 'গরুর' 'পাল' এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে ৩, ৩ ও ২ মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। কেবল যখন কোন অন্ত্য হলন্ত অক্ষরের উপর প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ইহা হ্রস্ব (প্রভাব-হ্রস্ব) হয়।

(১৪ ও ২১ সূত্র দ্রষ্টব্য)

পর্ব্বাঙ্গের বা শব্দের অন্ত ভিন্ন অন্যান্য স্থলে, অর্থাৎ শব্দের বা পর্ব্বাঙ্গের আদি বা মধ্য প্রভৃতি স্থলে অবস্থিত হলন্ত অক্ষরের সাধারণতঃ হ্রস্ব উচ্চারণ করা হয়। এরূপ উচ্চারণের জন্য একটু আয়াস হয় বলিয়া ইহাদের "গুরু" অক্ষর বলা যাইতে পারে।

একটু বিলম্বিত গতিতে উচ্চারণ করিলে শব্দের আদি বা মধ্যে অবস্থিত হলন্ত অক্ষরও দীর্ঘ হয়। এরূপ উচ্চারণ খুব অনায়াসসাধ্য এবং ইহার প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে।

(১৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)

[১৮] কোন পর্ব্বাঙ্গে গুরু অক্ষর (হলন্ত হ্রস্ব অক্ষর) থাকিলে, সেই পর্ব্বাঙ্গের শেষ অক্ষরটি সাধারণতঃ লঘু হয়। কখন কখন অবশ্য শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত পড়ে, সে ক্ষেত্রে কোন অক্ষরই লঘু না হইতেও পারে। *

---

* কালক্রমে বাংলা ছন্দের রীতির ক্রমপরিবর্ত্তন হইয়াছে। হয় ত এই পরিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশের অদ্যাবধি শেষ হয় নাই। গুরু অক্ষরের ব্যবহার থাকিলে পর্ব্বাঙ্গের শেষ অক্ষরটি লঘু হবেই, এইরূপ নিয়ম পরে হইতে পারে। যে পর্ব্বাঙ্গে কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষর আছে, তাহার অন্ত অক্ষরগুলি লঘু হইবে, প্রতি পর্ব্বাঙ্গে অন্ততঃ একটি লঘু অক্ষর থাকিবে, এরূপ নিয়মও প্রচলিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে (১২ সূত্রে) বলা হইয়াছে যে স্বরগাম্ভীর্য্যের উত্থান-পতন অনুসারে পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ বোঝা যায়। সাধারণতঃ পর্ব্বাঙ্গের শেষে স্বরগাম্ভীর্য্যের পতন হয় সুতরাং গুরু অক্ষরের উচ্চারণের জন্য যে প্রয়াস আবশ্যক তাহা সম্ভব হয় না।

কিন্তু পর্ব্বাঙ্গের শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত দিয়াও পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ সূচিত হইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে পর্ব্বাঙ্গের শেষে গাম্ভীর্য্যের উত্থান হয়, স্বরাঘাত-যুক্ত অক্ষরটি তীব্রতায় ও গাম্ভীর্য্যে অন্যান্য অক্ষরগুলিকে ছাপাইয়া উঠে। কিন্তু যদি পর্ব্বাঙ্গের শেষে স্বরাঘাতের জন্য ধ্বনির গতির উত্থান না হয়, তবে পতন হইবেই। এই জন্যই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে সব কয়েকটি অক্ষরই গুরু হয় না।

যে পর্ব্বাঙ্গে গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে তাহার কোন অক্ষরই প্রসারদীর্ঘ হয় না।

উদাহরণ—

সশঙ্ক : লঙ্কেশ : শূর | স্মরিলা : শঙ্করে (মধুসূদন)

দুর্দান্ত : পাণ্ডিত্য : পূর্ণ | দুঃসাধ্য : সিদ্ধান্ত (রবীন্দ্রনাথ)

প্রাতঃস্নাত : স্নিগ্ধচ্ছবি | আর্দ্র : সিক্ত : জটা (রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু—

ভগ্ন : স্তূপের | জীর্ণ : মঞ্চের | সুপ্ত : ছায়া | জুড়ে (বিজয় মজুমদার)

মায়ের : স্নেহ | অন্তর্ : যামী | তার : কাছে ত | রয় না : কিছুই | ঢাকা (রবীন্দ্রনাথ)

লিখতে : বল্লেই | অক্ষর : গুলো | গরমিল : হয় যে | সবই (দ্বিজেন্দ্রলাল)

মৈত্রি : পতি | ঊর্দ্ধ : স্বরে | কয় (রবীন্দ্রনাথ)

দৈবে : হতেম | দশম : রত্ন | নব : রত্নের | মালে (রবীন্দ্রনাথ)

শ্বাসাঘাত (Stress)

[১৯] পূর্ব্বে স্বর-গাম্ভীর্য্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেক শব্দের প্রথমে যে স্বরের গাম্ভীর্য্য স্বভাবতঃ কিছু অধিক হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রায়ই দেখা যায় যে, এক একটি বাক্যাংশের কোন একটি বিশেষ

অক্ষরের স্বর-গাম্ভীর্য্য পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত অক্ষরকে অতি স্পষ্টরূপে ছাপাইয়া উঠে। এইরূপ স্বর-গাম্ভীর্য্যের বৃদ্ধির নাম শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত বা বল।

ভারতীয় সঙ্গীতের তালের সম বা আঘাত কতকটা ইহারই প্রতিরূপ, যদিও অবিকল এক নহে। প্রতি আবর্ত্তে সম একবার থাকে, শ্বাসাঘাতের পৌনঃ-পুনিকতা আবশ্যিক। (সূঃ ২০ ছ দ্রষ্টব্য)

সাধারণ উচ্চারণের পদ্ধতির অতিরিক্ত একটা বিশেষ জোর দিয়া উচ্চারণের জন্যই এইরূপ শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত অনুভূত হয়।

"রা́ত পোহালো | ফ́র্সা হ'ল | ফু́টুল কত | ফু́ল"

"কো́ন্ হাটে তু́ই | বিকোতে চা́স্ | ওরে আমা́র | গা́ন"

প্রভৃতি চরণে যে যে অক্ষরের উপর ⁄ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত অক্ষরকে অতিরিক্ত একটা জোর দিয়া পড়া হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বদাই যে ঐরূপ ভাবে পড়া হয় তাহা নয়।

[২০] বাংলা ছন্দে অক্ষরের মাত্রা এবং ছন্দোবন্ধের প্রকৃতি শ্বাসাঘাতের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। 'পঞ্চনদীর' এই শব্দটির মোট মাত্রাসংখ্যা ৬, কি ৫, কি ৪ হইবে তাহা নির্ভর করে শ্বাসাঘাতের উপর। প্রকৃত বাংলায় শ্বাসাঘাতের ব্যবহার বেশী। কাব্যে যেখানে চল্‌তি ভাষার শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়, সাধারণতঃ সেইখানেই শ্বাসাঘাতের বাহুল্য থাকে। কিন্তু ইচ্ছা করিলে তৎসম বা অন্যান্য শব্দেও শ্বাসাঘাত দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র 'শঙ্খ' কবিতাটির দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবক মোটামুটি সাধু ভাষায় রচিত এবং অর্থসম্পদে গুরুগম্ভীর হইলেও শ্বাসাঘাতের প্রাবল্যের জন্য ইহাতে একটা বিশেষ রকমের ছন্দঃস্পন্দন অনুভূত হয় এবং ভাবের দিক্ দিয়া ইহার আবেদনও অনুরূপ হয়।

[২০ ক] শ্বাসাঘাত পড়িলে বাগ্‌যন্ত্রের গতি ক্ষিপ্র হয়, সুতরাং অতিদ্রুত উচ্চারণ করিতে হয়।

[২০ খ] শ্বাসাঘাত হলন্ত বা যৌগিক অক্ষরের (closed syllable) উপরই পড়ে ; স্বরান্ত-অক্ষরের (open syllable) উপর শ্বাসাঘাত পড়িলে সেই স্বরটি একটু টানিয়া যৌগিক অক্ষরের সমান করিয়া লইতে হইবে।

রাত পোহালো | ফর্‌সা হ'ল | ফুট্‌ল কত | ফুল (দীনবন্ধু)

সকল তর্ক | হেলায় তুচ্ছ | ক'রে (রবীন্দ্রনাথ—বলাকা—নবীন)

উপরের পংক্তি দুইটিতে যে যে অক্ষরের উপর রেফ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানেই শ্বাসাঘাত পড়িয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে ঐ শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর সবগুলিই যৌগিক (closed)।

ধিন্‌তা ধিনা | পাকা নোনা (গ্রাম্য ছড়া)

রক্ত যে ফুটে | ওঠে কতো

প্রাণের ব্যাকু | লতার মতো (রবীন্দ্রনাথ—খেয়া—ফুল ফোটানো)

এইরূপ ক্ষেত্রে শ্বাসাঘাতের অনুরোধে 'পাকা' শব্দটিকে 'পাকা-া' এবং 'ওঠে' শব্দটিকে 'ওঠে-ে' এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয়।

[২০ গ] **শ্বাসাঘাতযুক্ত হইলে যে কোন যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণ হয়।** শ্বাসাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্ষর শব্দের অন্ত্য অক্ষর হইলেও তাহার হ্রস্বীকরণ হইবে। শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সঙ্কোচন ও অতিদ্রুত উচ্চারণের জন্যই এইরূপ হয়। সুতরাং

সব পেয়েছির্ | দেশে কারো | নাই রে কোঠা | বাড়ি (রবীন্দ্রনাথ)

এই পংক্তিতে রেফ-চিহ্নিত প্রত্যেকটি অক্ষরই এক মাত্রার। শ্বাসাঘাত না থাকিলে এরূপ হওয়া সম্ভব হইত না।

[২০ ঘ] শ্বাসাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্ষরের অব্যবহিত পরের অক্ষরটি যদি মাত্র একটি স্বরবর্ণ দিয়া গঠিত হয়, তবে কখন কখন এই স্বরবর্ণের মাত্রা-লোপ (elision) হয়। স্বরবর্ণ টি তখন অতিদ্রুত উচ্চারণের জন্য মাত্র একটি স্পর্শস্বরে (vowel-glide) পর্য্যবসিত হয়।

যে রন্ধন | খেয়েছি আমি | বার বৎসর | আগে (প্রাচীন গীতিকথা)

সাহেবেরা সব | গেরুয়া পর্চ্ছে | বাঙালী নেক্‌টাই | হ্যাট্ কোট্‌টা

(দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান)

গাচ্ছে এমনি | তালকানা যে | শুনে তা পীলে | চমকাচ্ছে

(দ্বিজেন্দ্রলাল—হাসির গান)

এ সমস্ত ক্ষেত্রে—

খেয়েছি আমি = খেয়্ + (এ) + ছি আমি
সাহেবেরা সব = সাহেব্ + (এ) + রা সব্
বাঙালী নেক্‌টাই = বাঙ্ + (আ) + লী নেক্‌টাই
শুনে তা পীলে = শুন্ + (এ) + তা পীলে

কিন্তু উৎকৃষ্ট ছন্দোবন্ধে এরূপ স্পর্শস্বর ও অস্পষ্ট উচ্চারণ লক্ষিত হয় না।

[২০ ঙ] শ্বাসাঘাতের প্রভাবে অতিদ্রুত উচ্চারণের জন্য একই পর্ব্বাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত অক্ষরের পরস্পরের মধ্যে ছন্দঃসন্ধি (metrical liaison) ঘটে। এইজন্য

তালপাতার ঐ | পুঁথির ভিতর | ধর্ম্ম আছে | বল্‌লে কে (কিরণধন—পিতা স্বর্গ)
এক পয়সায় | কিনেছে ও | তালপাতার এক | বাঁশী (রবীন্দ্রনাথ—সুখ দুঃখ)

গঙ্গারাম ত | কেবল ভোগে
পিলের জ্বর আর | পাণ্ডুরোগে (সুকুমার রায়—আবোল্ তাবোল্)

এই সব ক্ষেত্রে—

তাল পাতার ঐ = তাল্ পা : তারৈ
তালপাতার এক = তাল্ পা : তারেক্
পিলের জ্বর আর = পিলের্ : জ্বরার্

এই কারণেই—

ডাল ভাতে ভাত | চড়িয়ে দে না (গ্রাম্য ছড়া)

জীর্ণ জরা | ঝরিয়ে দিয়ে | প্রাণ অফুরান | ছড়িয়ে দেদার | দিবি
(রবীন্দ্রনাথ—বলাকা—নবীন)

ইত্যাদি চরণে 'চড়িয়ে' 'ঝরিয়ে' 'ছড়িয়ে' দুই অক্ষরের শব্দ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এই সব ক্ষেত্রে চড়িয়ে = চড়্যে ; ঝরিয়ে = ঝর্যে ; ছড়িয়ে = ছড়্যে।

সেইরূপ ২০ (ঘ)র নিম্নের উদাহরণে

গেরুয়া = গের + উয়া ('উয়া' একত্রে একটি যৌগিক স্বর)

[২০ চ] শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের উপর প্রবল চাপ পড়ে বলিয়া একবার শ্বাসাঘাতের পরই বাগ্‌যন্ত্রের কিছু আরামের আবশ্যকতা হয়। সুতরাং একই

পর্ব্বাঙ্গে উপর্য্যুপরি অক্ষরে কখনও শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে না।
[একই পর্ব্বাঙ্গে একাধিক শ্বাসাঘাত-ও পড়িতে পারে না। (সূঃ ১৫ ক দ্রঃ) কারণ, প্রতি পর্ব্বাঙ্গে স্বরগাম্ভীর্য্যের একটা সুনিরূপিত উত্থান বা পতনের গতি থাকে, এবং সেই গতির প্রারম্ভ বা উপসংহার অনুসারেই পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ ও স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি হয়। দুইটি শ্বাসাঘাত একই পর্ব্বাঙ্গে থাকিলে এই গতির প্রবাহ একমুখী থাকিবে না, স্বরগাম্ভীর্য্যের পতনের পর আবার উত্থান হইবে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পর্ব্বাঙ্গের প্রারম্ভ হইল এইরূপ বোধ হইবে।]

অধিকন্তু, পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে শ্বাসাঘাতের পরবর্ত্তী অক্ষরটি লঘু হওয়া আবশ্যক। *

বিভিন্ন পর্ব্বাঙ্গের অঙ্গীভূত হইলেও একটি শ্বাসাঘাতের পরই আর একটি শ্বাসাঘাত না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শঙ্খ পরা | গৌর হাতে | ঘৃতের দীপটি | তুলে ধর

এখানে তৃতীয় পর্ব্বটি তত সুশ্রাব্য হয় নাই। 'দীপটি ঘৃতের' লিখিলে ভাল হইত।

[২০ ছ] শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের যে তীব্র আন্দোলন হয় তজ্জন্য শ্বাসাঘাতের পৌনঃপুনিকতা স্বাভাবিক।

সুতরাং শ্বাসাঘাত সন্নিহিত পর্ব্বে বা সন্নিহিত পর্ব্বাঙ্গে অন্ততঃ একাধিক সংখ্যায় পড়িবে।

[২০ জ] শ্বাসাঘাতের জন্য অতিক্রুত উচ্চারণ এবং বাগ্‌যন্ত্রের ক্ষিপ্র সঙ্কোচন হয় বলিয়া, বাংলায় শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে হ্রস্বতম পর্ব্ব অর্থাৎ ৪ মাত্রার পর্ব্ব, এবং প্রতি পর্ব্বে ন্যূনতম পর্ব্বাঙ্গ অর্থাৎ ২টি মাত্র পর্ব্বাঙ্গ থাকে।

এই রীতি অনুসারে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের নিম্নলিখিত কয়েকটি বোল্ নির্ণয় করা যায়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে বাংলার ও সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের ছড়ায়, লোকসঙ্গীতের বাদ্যে ও নৃত্যে এই বোলেরই অনুসরণ করা হয়।

(ক) গিজ্‌তা : গিজোড়্ | গিজ্‌তা : গিজোড়্ | গিজ্‌তা : গিজোড় | গাং

বা, টাক্ ডু : মা ডুম্ | টাক্ ডু : মা ডুম্ | টাক্ ডু : মা ডুম্ | ডুম্

---

* ১৮ সং সূত্রের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বা, লাক্ চ : ড়া চড়্ | লাক্ চ : ড়া চড়্ | লাক্ চ : ড়া চড়্ | চড়্

(কক) লাক্ চড়্ চড়্ | লাক্ চড়্ চড়্ | লাক্ চড়্ চড়্ | চড়্

(খ) নারদ্ : নারদ্ | নারদ্ : নারদ্

বা, দিপির : দিপাং | দিপির : দিপাং | দিপির : দিপাং | তাং

(গ) লক্কা : ফক্কা | লক্কা : ফক্কা

(গগ) গিজোড়্ : গিজ্তা | গিজোড়্ : গিজ্তা

এই কয়টি উদাহরণে প্রতি পর্ব্বেই ২টি করিয়া আঘাত পড়িয়াছে। এক পর্ব্বে একটি করিয়া আঘাতও পড়িতে পারে ; যথা—

(ঘ) টক্কা : টরে | টক্কা : টরে

বা, লেজ্জা : বাবু | মোন্দো : আনা | (১ম অক্ষরে আঘাত)

(ঙ) তুতুর : তুয়া | তুতুর : তুয়া | তুতুর : তুয়া | তু (২য় অক্ষরে আঘাত)

(চ) তেটে : ধিন্ না | কেটে : ধিন্ ধা ;

বা

টরে টক্কা | টরে টক্কা (৩য় অক্ষরে আঘাত)

(ছ) তাতা : তা ধিন্ | ধাধা : তা ধিন্ (৪র্থ অক্ষরে আঘাত)

যথা—

কতো : যে ফুল্ | কতো : আকুল (রবীন্দ্রনাথ—ক্ষণিকা, কল্যাণী)

বাস্তবিক পক্ষে (চ) ও (ছ) জাতীয় পর্ব্বে দেখা যাইবে যে প্রথম পর্ব্বাঙ্গেও একটি স্বরাঘাত পড়িতেছে। পড়িবার সময়ে—

কতো-ও। যে ফুল্ | কতো-ও। আকুল

এইরূপ পাঠ হইবে।

সুতরাং (ছ) বাস্তবিক (খ), এবং (চ) বাস্তবিক (গগ) জাতীয় পর্ব্ব হইয়া দাঁড়াইবে।

[২০ ঋ] শ্বাসাঘাতের পূর্ব্ববর্তী অক্ষরটি গুরু (হলন্ত হ্রস্ব) হইতে পারে (সূঃ ১৮ দ্রঃ), কিন্তু সে ক্ষেত্রে ছন্দঃ-সৌষম্যের রীতি বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় (সূঃ ৩২ ক দ্রঃ)। এইজন্য

মঞ্জীর : বাজে | সোনার : পায়ে

ভাল শুনায় না ; কিন্তু

অনেক : বাক্য | হানা : হানি

তর্জ্জন : গর্জ্জন | অনেক : খানি

চলিতে পারে।

বাংলা ছন্দের সূত্র

[২১] বাংলা ছন্দের এক একটি পর্ব্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকা আবশ্যক। উপসর্গ ইত্যাদিকে এক একটি মূল শব্দ বিবেচনা করিতে হইবে। সাধারণতঃ একটি মূল শব্দকে ভাঙিয়া দুইটি পর্ব্বের মধ্যে দেওয়া চলে না। এইজন্য

কত না অর্থ, কত অনর্থ, আবিল করিছে স্বর্গমর্ত্ত্য 	(রবীন্দ্রনাথ—নগরসঙ্গীত)

এই পংক্তিটি পাঁচ মাত্রার পর্ব্বে রচিত মনে করিয়া

কত না অর্থ, | কত অনর্থ, | আবিল করি | ছে স্বর্গমর্ত্ত্য

এই ভাবে ছন্দোলিপি করা যায় না।

এই কারণেই নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলিতে ছন্দঃপতন হইয়াছে—

পথিমাঝে দুষ্ট যব | নের হাতে পড়িয়া 	(হেমচন্দ্র—বীরবাহু কাব্য)

বলি বীরবর প্রম | দার কর ধরিল 	ঐ

কেবলমাত্র দুই একটি স্থলে এই রীতির ব্যত্যয় হইতে পারে—

[ক] যেখানে চরণের শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণ (catalectic) এবং উপান্ত পর্ব্বেরই অতিরিক্ত অংশ বলিয়া মনে হয় ;—

ঘুম যাবে সে | দুধের ফেনা | ফুলের বিছা | নায় 	(সত্যেন্দ্র দত্ত—কয়াধু)

কোথায় শিষ্য | ভুলেছ' ভায় | মাধবীর সৌ | রভে 	(দুর্ব্বাসা, কালিদাস রায়)

রেলগাড়ী ধায় ; | হেরিলাম হায় | নামিয়া বর্দ্ধ | মানে

(পুরাতন ভৃত্য, রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু যেখানে সম-মাত্রার পর্ব্ব লইয়া কবিতা রচিত হইয়াছে, মাত্র সেখানেই এরূপ চলিতে পারে; যেখানে বিভিন্ন মাত্রার পর্ব্ব একই চরণে ব্যবহৃত হয় সেখানে এরূপ চলে না।

ছন্দ শ্বাসাঘাত-প্রধান হইলে পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা সুনির্দ্দিষ্ট থাকে বলিয়া যে কোন স্থলেই শব্দ ভাঙিয়া পর্ব্বগঠন করা যায়; যথা—

ঘরেতে দু | রন্ত ছেলে | করে দাপা | দাপি (রবীন্দ্রনাথ)
কালনেমি ক | বন্ধ রাহু | দৈত্য পাখ | ও (কুহু, সত্যেন্দ্রনাথ)

[খ] বাংলা মূল শব্দ সাধারণতঃ এক হইতে তিন মাত্রার হয়; বিভক্তি ইত্যাদির যোগে ইহা অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াও থাকে। সময়ে সময়ে বিদেশী ও তৎসম শব্দ অথবা সমাস ব্যবহারের কারণেও বড় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সে সব ক্ষেত্রে আবশ্যক হইলে তাহাদের ভাঙিয়া দুইটি পর্ব্বের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে। তবে যতটা সম্ভব শব্দের মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা করিতে হইবে।

সহকারী রাজকৃষ্ণ | কাঞ্চনবরণ,
যার করে জ্বলে টেলি | মেকস রতন।
(গঙ্গার কলিকাতা দর্শন, দীনবন্ধু মিত্র)

চারি অগ্নি মিশ্রিত | হইয়া এক হৈল।
সমুদ্র হৈতে আচম- | বিতে বাহিরিল॥
(আদিপর্ব্ব, কাশীরাম)

বিষ্ণু পাইলা কমলা | কৌস্তুভ মণি আদি।
হয় উচ্চৈঃশ্রবা ঐরা | বত গজনিধি॥ (ঐ)

এস পুস্তক- | পুঞ্জ পূজারী | সারদার উপা | সকেরা সবে
(স্বাগত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

ভূদেব রমেশ | দীনবন্ধুর | অর্ঘ্যে পদার | বিন্দে দীপ্তি
(কালিদাস রায়)

[২২] প্রত্যেক পর্ব্বে দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গ থাকিবে। অন্ততঃ দুইটি পর্ব্বাঙ্গ না থাকিলে পর্ব্বের মধ্যে কোনরূপ ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না।

প্রতি পর্ব্বাঙ্গেও একটি বা ততোধিক গোটা মূলশব্দ রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবে যে সব ক্ষেত্রে কোন গোটা মূলশব্দ ভাঙিয়া পর্ব্ববিভাগ করা হয়, সে সব ক্ষেত্রে অগত্যা ভাংটা শব্দ লইয়াই পর্ব্বের কোন একটি অঙ্গ গঠিত হয়।

. বড় (চারি বা ততোধিক মাত্রার) শব্দকে আবশ্যক মত ভাঙিয়া দুইটি পর্ব্বাঙ্গ গঠন করা যাইতে পারে। তবে মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্বাসাঘাত-প্রবল ছন্দে যেখানে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের মাত্রা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট থাকে, সেখানে যথেচ্ছভাবে শব্দের বিভাগ করিয়া পর্ব্বাঙ্গ গঠন করা যাইতে পারে।

এস : প্রতিভার | রাজ : টীকা : ভালে | এসো : ওগো : এস | সগৌ : রবে
স্বাগত : কাব্য | কোবিদ : হেথায় | উজ্জ : রিনীর | বাজিছে : বাঁশি

(স্বাগত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

যত্নশৈলে : শব্দসিন্ধু | করিয়া : মন্থন
অমিত্রা- : ক্ষরের : সুধা | করেছে : অর্পণ

(কলিকাতা-দর্শন, দীনবন্ধু)

কোন্ হা : টে তুই | বিকো : তে চাস | ওরে : আমার | গান

(যথাস্থান, রবীন্দ্রনাথ)

কে ব : লে রূপ | নাই দে : বতার | কে ব : লে তাঁর | মূর্ত্তি : নাহি

(কোজাগরলক্ষ্মী, যতীন্দ্র বাগচী)

[২৩] এক একটি পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া থাকে। কখন এক মাত্রার পর্ব্বাঙ্গও দেখা যায়। বাংলা শব্দও সাধারণতঃ এক, দুই, তিন বা চার মাত্রার হয়। মোটামুটি বলিতে গেলে, এক একটি মূল শব্দই এক একটি পর্ব্বাঙ্গ। তবে সর্ব্বত্রই তাহা নহে (২১শ ও ২২শ সূত্র দ্রঃ)।

পর্ব্বাঙ্গের শেষে স্বরগাম্ভীর্য্যের হ্রাস হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কবি ইচ্ছা করিলে পর্ব্বাঙ্গের পরে সামান্য বা অধিক বিরামস্থল রাখিতে পারেন। সময়ে সময়ে পর্ব্বাঙ্গের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যায়। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, পর্ব্বের মধ্যেই পর্ব্বাঙ্গের পরে উপচ্ছেদ কিংবা পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছে (১০ম সূত্রে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে কোনরূপ যতি বা ছেদ থাকিতে পারে না।

[২৪] বাংলায় ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা ও ৮ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহারই বেশী। ১০ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহারও বর্ত্তমান যুগে যথেষ্ট দেখা যায়। কখন কখন ৫ ও ৭ মাত্রার পর্ব্বেরও ব্যবহার দেখা যায়। ৪ মাত্রা অপেক্ষা ছোট ও ১০ মাত্রা অপেক্ষা বড় পর্ব্বের ব্যবহার হয় না। *

---

* ৯ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার বাংলায় বিশেষ দেখা যায় না।

প্রত্যেক প্রকারের পর্ব্বের বিশিষ্ট কোন ছন্দোগুণ আছে।

৪ মাত্রার পর্ব্বের গতি ক্ষিপ্র, ভাব হাল্কা। শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে শুধু ৪ মাত্রার পর্ব্বই ব্যবহৃত হইতে পারে।

জল পড়ে | পাতা নড়ে ॥
কালো জল | লাল ফল ॥
রাত পোহাল' | ফর্‌সা হ'ল | ফুট্‌ল কত | ফুল।
"কে নিবি গো | কিনে আমায়, | কে নিবি গো | কিনে।"
পসরা মোর | হেঁকে হেঁকে | বেড়াই রাতে | দিনে ॥
মা কেঁদে কয় | "মঞ্জুলী মোর | ঐ তো কচি | মেয়ে"
কোন্ ফুল | তার তুল্
তার তুল্ | কোন্ ফুল্

ছয় মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ রকমের পর্ব্বের চাল মাঝারি, সাধারণ কথোপকথনের এক একটি বিভাগের প্রায় সমান। বাংলা লঘুত্রিপদী ছন্দের ভিত্তি ছয় মাত্রার পর্ব্ব।

শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভুঁই | আর সবি গেছে | ঋণে
ওগো কালো মেঘ | বাতাসের বেগে | যেওনা যেওনা | যেওনা চলে
(সেথা) শুষ্ক চপল | বাসনা মানসে, | হত লালসার | উগ্রতা

আট মাত্রার পর্ব্বই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার গতি মন্থর ও সংযত, ভাব গম্ভীর। বাংলা পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী প্রভৃতি সনাতন ছন্দ এবং সাধারণ অমিতাক্ষর (অমিত্রাক্ষর) প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি আট মাত্রার পর্ব্ব।

দশ মাত্রার পর্ব্বের বিস্তৃত ব্যবহার শুধু বর্ত্তমান যুগেই দেখা যায়। (পূর্ব্বে কেবল দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের তৃতীয় পর্ব্বরূপে ইহার ব্যবহার দেখা যাইত।) সাধারণতঃ লঘুতর পর্ব্বের সহযোগেই ইহার ব্যবহার হয়।

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, | আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু ॥
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, | আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু ॥
ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, | প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ |
জগৎ আপনা দিয়ে | খুঁজিছে তাহার প্রতিদান ॥

নিস্তব্ধের সে-আহ্বানে, | বাহিয়া জীবন-যাত্রা মম ||
সিন্ধুগামী-তরঙ্গিণী সম ||
এতোকাল চলেছিনু | তোমারি সুদূর অভিসারে ||
বঙ্কিম জটিল পথে | সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে ||
অনির্দ্দেশ অলক্ষ্যের পানে ||

দীর্ঘতর মাত্রার পর্ব্বগুলি সাধারণতঃ লঘুতর পর্ব্বের সহযোগেই ব্যবহৃত হয়।

পাঁচ মাত্রা ও সাত মাত্রার পর্ব্বের প্রকৃতি অন্যান্য পর্ব্ব হইতে কিছু বিভিন্ন। ইহারা দুইটি বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গে রচিত হয় বলিয়া ইহাদের syncopated বা অপূর্ণ পর্ব্ব বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার উচ্ছল, চপল ভাব অনুভূত হয়।

সকল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায়—
(অপেক্ষা, রবীন্দ্রনাথ)

গোকুলে মধু | ফুরায়ে গেল | আঁধার আজি | কুঞ্জবন
(শেষ, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য)

ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন প্রবাসী
বিরহ তপোবনে | আনমনে উদাসী
(বিরহানন্দ, রবীন্দ্রনাথ)

ললাটে জয়টীকা | প্রসূন-হার গলে | চলে রে বীর চলে
সে কারা নহে কারা | যেখানে ভৈরব | রুদ্র শিখা জ্বলে
(নজরুল ইসলাম)

[২৫] **বাংলা ছন্দের রীতি এই যে, পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গগুলিকে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সাজাইতে হইবে; হয়, পর্ব্বাঙ্গগুলি পরস্পর সমান হইবে, না হয়, তাহাদের ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে।** পর পর পর্ব্বাঙ্গগুলি, হয়, ক্রমশঃ হ্রস্বতর, না হয়, দীর্ঘতর হইবে। * এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ছন্দঃপতন ঘটিবে। †

---

* গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে, পদ্যের এক একটি পর্ব্বে পর্ব্বাঙ্গের পারম্পর্য্যের মধ্যে এমন একটি সরল গতি থাকিবে, যাহা রৈখিক সমীকরণ (linear equation) দিয়া প্রকাশ করা যায়। গদ্যের পর্ব্বে এরূপ সরলগতি না থাকিতেও পারে। বরং তরঙ্গায়িত গতির দিকেই গদ্যের প্রবণতা।

† উদাহরণ— ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে | বাড়ায় মাত্র আঁধার (মধুসূদন)
আজিকার বসন্তের | আনন্দ অভিবাদন (রবীন্দ্রনাথ)

এই নিয়মানুসারে বাংলায় প্রচলিত পর্ব্বসমূহ নিম্নলিখিত আদর্শ (pattern বা ছাঁচ) অনুযায়ী বিভক্ত হইয়া থাকে। এই সঙ্কেতগুলিই বাংলা ছন্দের কাঠাম। পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গের মাত্রা ও সমাবেশের উপরই ছন্দের মূল লক্ষণটি নির্ভর করে।

পর্ব্বের দৈর্ঘ্য— ছইটি পর্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি— তিনটি পর্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি

৪ — ২+২

জল : পড়ে | পাতা : নড়ে

দিনের : আলো | নিবে : এল

— ৩+১ *

কিনু নাপিত | দাড়ি কামায় | আদ্ধেক : তার | চুল

— ১+৩ *

তিন : কন্যে | দান

রাম : সিংহের | জয়

৫ — ৩+২

পঙ্ক : শরে | দগ্ধ : করে | করেছ : একি | সন্ন্যাসী

— ২+৩

পূর্ণ : চাঁদ | হাসে : আকাশ | কোলে

আলোক : -ছায়া | শিব : -শিবানী | সাগর-জলে | দোলে

৬ — ৩+৩ ২+২+২

ভূতের : মতন | চেহারা : যেমন কিশোর কুমার |

বাঁধা : বাহু : তার

২+৪

শিখ : গরজয় | গুরুজীর : জয়

৪+২

সপ্তাহ : মাঝে | সাত শত : প্রাণ

৭ — ৩+৪

পূরব : মেঘ মুখে | পড়েছে : রবি রেখা

৪+৩

বিরহ : তপোবনে | আনমনে : উদাসী

---

* তারকা-চিহ্নিত প্রথায় পর্ব্ব-বিভাগ কচিৎ দৃষ্ট হয়।

পর্ব্বের দৈর্ঘ্য—	দুইটি পর্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি—	তিনটি পর্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি
৮ —	৪ + ৪ পাখী সব : করে রব	৩+৩+২ রাখাল : গরুর : পাল যশোর : নগর : ধাম ২+২+৪ চক্রে : পিষ্ট : আঁধারের ৪+২+২ অতীতের : তীর : হতে ২+৪+২ *† মহা-নিস্তব্ধের প্রান্তে । কোথা ব'সে রয়েছে রমণী (আহ্বান, রবীন্দ্রনাথ) দেশ দেশান্তর মাঝে । যার যেথা স্থান (বঙ্গমাতা, রবীন্দ্রনাথ) ২+৩+৩ *† সাড়ে : আঠারো : শতক অতি : অল্প : দিনেই (আধুনিকা, রবীন্দ্রনাথ) গ্রাম : রত্ন : ফুলিয়া (কৃত্তিবাস)
১০ —		৩+৩+৪ ভারত- : ঈশ্বর : শাজাহান ৪+৩+৩ মহারাজ : বঙ্গজ : কায়স্থ সকরুণ : করুক : আকাশ ৪+৪+২ অশ্রুভরা : আনন্দের : সাজি ২+৪+৪ *† রথ : চালাইয়া : শীঘ্রগতি দিবা : হয়ে এল : সমাপন

---

* তারকা-চিহ্নিত প্রথায় পর্ব্ব-বিভাগ কচিৎ দৃষ্ট হয়।

† এই সব ক্ষেত্রে প্রথম পর্ব্বাঙ্গটি বস্তুতঃ ছন্দঃ-প্রবাহের অতিরিক্ত।

[২৫ ক] বাংলা ছন্দের পর্ব্বাঙ্গবিভাগের সঙ্কেতগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের তাল-বিভাগের অনুরূপ। মূলতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের ও বাংলা প্রভৃতি ভাষার ছন্দের প্রকৃতি এক ; উভয়েরই আদিম ইতিহাস এক। নিম্নে পর্ব্ববিভাগগুলির সহিত তাল-বিভাগের সূত্রের ঐক্য দর্শিত হইল :—

পর্ব্বের মাত্রা	—	পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগের রীতি	—	অনুরূপ তালের নাম
৪	—	২+২	—	ঠুংরী বা খেমটা
৫	—	২+৩, ৩+২	—	ঝাঁপতাল
৬	—	৩+৩	—	দাদ্‌রা, একতালা ইত্যাদি
		২+৪, ৪+২	—	রূপক
৭	—	৩+৪, ৪+৩	—	তেওরা
৮	—	৪+৪	—	কাওয়ালী ইত্যাদি
		২+৩+৩, ৩+৩+২	—	ত্রিপুট তিস্র (দক্ষিণ ভারতীয়)
১০	—	৪+৪+২, ২+৪+৪	—	সুর ফাক্‌তা

[২৬] পরস্পর সমান বা প্রতিসম পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গবিভাগের রীতি একবিধ হওয়ার আবশ্যকতা নাই। *

"আনন্দে ⋮ মোর | দেবতা ⋮ জাগিল | জাগে ⋮ আনন্দ | ভকত প্রাণে"

এই চরণটিতে প্রথম তিনটি পর্ব্ব পরস্পর সমান, প্রত্যেক পর্ব্বেই ছয় মাত্রা আছে। কিন্তু পর্ব্বাঙ্গবিভাগের রীতি বিভিন্ন। প্রথম পর্ব্বে ৪+২, দ্বিতীয় পর্ব্বে ৩+৩, তৃতীয় পর্ব্বে ২+৪।

সেইরূপ,

" মৃত্যুর ⋮ নিভৃত ⋮ স্নিগ্ধ ঘরে | বসে আছ ⋮ বাতায়ন ⋮ পরে, | জ্বালায়ে ⋮ রেখেছো ⋮ দীপখানি |
চিরন্তন ⋮ আশায় ⋮ উজ্জ্বল "

এই চরণটির প্রতি পর্ব্বেই দশ মাত্রা আছে। কিন্তু পর্ব্বাঙ্গবিভাগের রীতি যথাক্রমে ৩+৩+৪, ৪+৪+২, ৩+৩+৪, ৪+৩+৩।

---

* তবে যেখানে পর্ব্বাঙ্গবিভাগের একটি সঙ্কেত-ই বারংবার ব্যবহৃত হয়, এবং সেই সঙ্কেতের অনুযায়ী বিভাগের উপরই কোন বিশেষ ছন্দস্তরঙ্গের প্রভাব নির্ভর করে, সেখানে প্রত্যেক পর্ব্বেই পর্ব্বাঙ্গবিভাগ একবিধ করার চেষ্টা করা হয়। স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে ইহা কখন কখন দেখা যায়। যেখানে প্রসারদীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার থাকে, সেখানেও এরূপ দেখা যায়।

(সূঃ ১৬উ দ্রঃ)

[২৭] উচ্চারণের রীতি বজায় রাখিয়া ছন্দের pattern বা আদর্শ অনুসারেই অক্ষরের মাত্রা স্থির হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলায় কোন কোন শ্রেণীর অক্ষর আবশ্যক-মত দীর্ঘ হইতে পারে। সাধারণ রীতি এই যে, প্রত্যেক অক্ষরই একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইবে, শুধু শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইবে। ছন্দের খাতিরে গোটা শব্দ না ভাঙিয়া উপরে লিখিত নিয়মে পর্ব্বাঙ্গবিভাগ করিবার জন্য অক্ষরের দীর্ঘীকরণ বা হ্রস্বীকরণ করা হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বরাঘাতের প্রভাবে যে কোন হলন্ত অক্ষর হ্রস্ব হইতে পারে। বিভিন্ন গতির অক্ষরের ব্যবহার ও সমাবেশ-সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ আছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। (সূঃ ১৫, ১৬, ১৮ ও ২০ দ্রষ্টব্য)

এই উপলক্ষে কোন কোন স্থলে গোটা শব্দকে ভাঙিয়া পর্ব্ব বা পর্ব্বাঙ্গবিভাগ করা যাইতে পারে, তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। (সূঃ ২১ ও ২২ দ্রষ্টব্য)

পাঠকের রুচি-অনুসারে কবিতাপাঠ-কালে চরণের অন্ত্য স্বরকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া অন্ত্য পর্ব্বের দৈর্ঘ্য বাড়াইতে পারা যায়। অবশ্য প্রতিসম পর্ব্বগুলিতে মোট মাত্রা সমান রাখিতে হইবে। *

[২৮] ছন্দোলিপি করিবার সময়ে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, এক একটি চরণ সমমাত্রিক পর্ব্বের সংযোগে, না, বিভিন্ন মাত্রার পর্ব্বের সংযোগে রচিত হইয়াছে। এইটি বুঝিয়া প্রথমতঃ পর্ব্ব-বিভাগ করিতে হইবে। (শব্দের স্বাভাবিক অন্বয় অনুসারে পাঠ করিলেই সাধারণতঃ পর্ব্ব-বিভাগগুলি অনেক সময়ে ধরা পড়ে।) তাহার পরে পর্ব্বগুলির কত মাত্রা তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। এবং তাহার পরে প্রত্যেক পর্ব্বকে উপযুক্ত পর্ব্বাঙ্গে বিভাগ করিতে হইবে। পর্ব্বের ও পর্ব্বাঙ্গের মাত্রা হিসাব করিবার সময়ে মাত্রা-বিষয়ক

---

* যেমন, কেহ কেহ পাঠ করেন—

গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা

তীরে একা বসে আছি | নাহি ভরসা

যেখানে অন্ত্য পর্ব্বটি হ্রস্বতর, সেখানেই এরূপ চলিতে পারে।

নিয়মগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। দীর্ঘীকরণের আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত তালিকার পর্য্যায় অনুসারে করিতে হইবে :—

(১) শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষর
(২) অন্যান্য হলন্ত অক্ষর
(৩) যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর
} যৌগিক অক্ষর

(৪) আহ্বান ও আবেগ-সূচক এবং অনুকারধ্বনি-সূচক অক্ষর
(৫) লুপ্ত অক্ষরের প্রতিনিধিস্থানীয় মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর
(৬) সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ-স্বরান্ত অক্ষর
(৭) অন্যান্য মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর *

[২৮ ক] যেখানে পর্ব্বে পর্ব্বে মাত্রার সংখ্যা সমান বা সুনিয়মিত, সেখানেই আবশ্যক-মত অক্ষরের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ চলিতে পারে। যেমন, কোন চরণে যদি বরাবরই ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা, কি, ৮ মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়, তখন ছন্দের সেই গতি অব্যাহত রাখার জন্য অক্ষরের আবশ্যক-মত হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘীকরণ হয়।

আমাদের ছোট নদী | চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার | হাঁটু জল থাকে

এখানে প্রতি চরণের প্রথম পর্ব্বে ৮ মাত্রা হইবে, ইহা নির্দ্দিষ্টই আছে। সুতরাং "বৈ" অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধরা হইল।

যেখানে এরূপ সুনির্দ্দিষ্ট একটা রূপকল্প বা ছাঁচ নাই, সেখানে প্রতি অক্ষরই স্বভাবমাত্রিক হইবে ; অর্থাৎ মাত্র শব্দের অন্ত্য হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়া বাকি সব অক্ষরকে হ্রস্ব ধরিতে হইবে। যেমন,

"এই কল্লোলের মাঝে | নিয়ে এস কেহ | পরিপূর্ণ একটি জীবন"

এই চরণটিতে (সঙ্কেত—৮+৬+১০) সমস্ত অক্ষরই স্বভাবমাত্রিক হইবে।

---

* এই শ্রেণীর অক্ষরের দীর্ঘীকরণ যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিতে হইবে। কারণ, সেরূপ করিলে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি লঙ্ঘন করিতে হয়। তত্রাচ ছন্দকে বজায় রাখিবার জন্য সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যতিক্রমও আবশ্যক হইলে করিতে হইবে।

অমিত্রাক্ষর ও অন্যান্য অমিত্তাক্ষর ছন্দেও যেখানে অনেক দিক্ দিয়া একটা অনির্দ্দিষ্টতা থাকে সেখানেও সব অক্ষর স্বভাবমাত্রিক হইবে।

[২৯] পর্ব্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেক সময়ে hyper-metric বা ছন্দের অতিরিক্ত একটি বা দুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাদিগকে ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়।

যথা,

মোর—হার-ছেঁড়া মণি | নেয়নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় | গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন | ঘরের সমুখে | পড়ে আছে শুধু | আঁকা
আমি—কী দিলাম কারে | জানে না সে কেউ | ধূলায় রহিল | ঢাকা

এখানে মূল পর্ব্ব ৬ মাত্রার। 'মোর' 'আমি' এই দুটি শব্দ ছন্দোবন্ধের অতিরিক্ত।

[৩০] ছন্দোলিপিকরণের (Scanning-এর) দুই একটি উদাহরণ নিয়ে দেওয়া হইল—

এই কলিকাতা—কালিকাক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে হেথায়, মহেশের পদধূলে এ পূত।

(স্বাগত, সত্যেন্দ্র দত্ত)

এই দুইটি পংক্তি পড়িলে বা অন্বয় করিলেই প্রতীত হইবে যে, প্রত্যেক পংক্তির মাঝখানে একটি যতি বা পর্ব্ববিভাগ আছে।

এই কলিকাতা—কালিকাক্ষেত্র, | কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণু-চক্র ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের পদধূলে এ পূত।

দেখা যাইতেছে, উপরের চারিটি বিভাগে যথাক্রমে ১০, ৯, ৯, ১০ করিয়া অক্ষর আছে। কিন্তু ইহাতে শ্বাসাঘাতের প্রাবল্য নাই এবং শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের রীতি অনুসারে চারি অক্ষর লইয়া পর্ব্ববিভাগ করিতে গেলে অনুচিত ভাবে শব্দ ভাঙিতে হয় এবং পড়া অসম্ভব হয়। সুতরাং সাধারণ রীতি অনুসারে অন্ততঃ শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষরগুলিকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে। তাহা হইলে বিভাগগুলিতে ১০, ১১, ৯, ১১ মাত্রা করিয়া পড়ে। কিন্তু ১১ মাত্রার পর্ব্ব হয় না, বিশেষতঃ এখানে ধ্বনির চাল মাঝারি রকমের। সুতরাং ৫ বা ৬ মাত্রার পর্ব্ব লইয়া ইহা সম্ভবতঃ গঠিত, এবং উপরের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্ভবতঃ

দুইটি পর্ব্বের সমষ্টি। এই ভাবে দেখিলে নিম্নলিখিত ভাবে পর্ব্ববিভাগ করা যায়—

এই কলিকাতা— | কালিকাক্ষেত্র, | কাহিনী ইহার | সবার শ্রুত,
বিষ্ণু-চক্র | ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের পদ- | ধূলে এ পূত

মাত্রার হিসাব এবং পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ ঠিক করিতে গেলে প্রত্যেক যৌগিক অক্ষরকে দীর্ঘ করিলেই চলে। * সুতরাং ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে—

এই : কলিকাতা— | কালিকা- : ক্ষেত্র | কাহিনী : ইহার | সবার : শ্রুত ||
=(২+৪)+(৩+৩)+(৩+৩)+(৩+২)

বিষ্ণু- : চক্র | ঘুরেছে : হেথায়, | মহেশের : পদ- | ধূলে এ : পূত
=(৩+৩)+(৩+৩)+(৪+২)+(৩+২)

আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক।

নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণ-তল
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী!

সহজেই প্রতীত হইবে যে, এখানে প্রথম তিন পংক্তির পর্ব্ববিভাগ হইবে এইরূপ—

নীল-সিন্ধু-জল- | ধৌত-চরণ-তল
অনিল-বিকম্পিত | -শ্যামল-অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত- | ভাল-হিমাচল

শেষের পংক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। মূল পর্ব্বের মাত্রা স্থির না করিলে উহার বিভাগ স্থির করা কঠিন।

এই কয়টি পংক্তি যে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে লিখিত নয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং এই কয়েকটি পর্ব্বে অন্ততঃ ৬, ৭, ৭, ৬, ৬, ৬ মাত্রা আছে। কিন্তু সমমাত্রিক পর্ব্বে এ কবিতাটি যখন লিখিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক পর্ব্বে অন্ততঃ ৭ মাত্রা আছে ধরিতে হইবে। ৭ মাত্রা করিয়া ধরিলে অবশ্য ২য় ও ৩য় পংক্তিতে পর্ব্বাঙ্গবিভাগের তত অসুবিধা হয় না, কিন্তু প্রথম পংক্তিতে হয়। প্রথম পর্ব্বটিকে ৭ মাত্রা করিতে গেলে, রীতি অনুযায়ী 'সিন্' অক্ষরটিকে দীর্ঘ

* অনেক সময়ে চরণের শেষ পর্ব্বটি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব হয়।

ধরিতে হইবে। প্রথম পর্ব্বে তাহা হইলে পর্ব্ববিভাগ হয় 'নীল-সিন্ : ধু-জল'। দ্বিতীয় পর্ব্বে বিভাগ হয় 'ধৌত চর : ণ তল' বা 'ধৌত চ : রণ তল'। এরূপ বিভাগ বাংলা ছন্দের ও উচ্চারণের রীতির বিরোধী। সুতরাং পর্ব্বগুলিকে ৮ মাত্রার ধরিলে চলে কি না, দেখিতে হইবে। বিশেষতঃ, যখন ৮ মাত্রার পর্ব্বই গম্ভীর ভাবের কবিতার উপযোগী।

ছন্দের নিয়ম অনুসারে দীর্ঘীকরণ করিলে ৮ মাত্রার পর্ব্বে সহজেই ছন্দোলিপি করা যায়—

নীল : -সিন্ধু : -জল | ধৌত : চরণ : -তল = (৩+৩+২) + (৩+৩+২)

অনিল-বি : কম্পিত | শ্যামল : অঞ্চল = (৪+৪) + (৪+৪)

অম্বর : -চুম্বিত | ভাল : হিমা : চল = (৪+৪) + (৩+৩+২)]

শুভ্র : -তুষার : -কিরী | টিনী ! = (৩+৩+২) + ২

অথবা

শুভ্র : -তুষার : -কিরীটিনী = (৩+৩+৪)

এইরূপ হিসাব করিয়াই নিম্নলিখিত পদ্যাংশগুলির ছন্দোলিপি করিতে হইয়াছে—

সন্ধ্যা : গগনে | নিবিড় : কালিমা | অরণ্যে : খেলিছে : নিশি।
ভীত- : বন্দনা | পৃথিবী : হেরিছে | ঘোর অন্ধ : কারে : মিশি ॥

(ছায়াময়ী, হেমচন্দ্র)

"জয় : রাণা | রাম : সিংহের | জয়"
মৈত্রি : পতি | ঊর্দ্ধ : স্বরে | কয়
কনের : বক্ষ | কাঁপে : উঠে | ডরে,
দুটি : চক্ষু | ছল : ছল | করে,
বর : যাত্রী | হাঁকে : সম | স্বরে
"জয় : রাণা | রাম : সিংহের | জয়"।

(কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ)

সর্ব্বদা এইরূপে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ-গঠনের রীতি স্মরণ রাখিয়া মাত্রা-বিচার করিতে হইবে। কোনরূপ বাঁধা নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্রা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট থাকে না,—বাংলা ছন্দের এই ধাতুগত লক্ষণটি ভুলিলে চলিবে না।

(ছন্দোলিপির অন্যান্য উদাহরণ পরে দেওয়া হইয়াছে।)

চরণের লয়

[৩১] পূর্ব্বে (১৪শ সূত্রে) এক একটি অক্ষরের গতির কথা বলা হইয়াছে। বাংলা ছন্দে বিভিন্ন গতির অক্ষরের সমাবেশ একই চরণে হয়, তাহাও দেখান হইয়াছে। সুতরাং বাংলা কবিতায় উচ্চারণের গতির পরিবর্ত্তন প্রায় সর্ব্বদাই করিতে হয়।

কিন্তু এই পরিবর্ত্তন একেবারে যদৃচ্ছ নহে। ইহার সম্পর্কেও বিধি-নিষেধ আছে। যেমন,

আকাশে বজ্র | ঘোর পরিহাসে | হাসিল অট্ট | হাস্য

এই চরণটির ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া

আকাশে বজ্র | নিষ্ঠুর বিদ্রূপে | হাসিল অট্ট | হাস্য

লেখা চলিবে না।

কারণ, প্রত্যেক অক্ষরের গতি ছাড়া, প্রত্যেক চরণের একটা বিশিষ্ট লয় আছে। সেই লয় অনুসারে চরণে বিভিন্ন শ্রেণীর অক্ষরের গ্রহণ বা বর্জ্জন করা হইয়া থাকে। উদ্ধৃত চরণটির সাধারণ লয়ের বিরোধী হইবে বলিয়া ঐ চরণটিতে গুরু অক্ষরের ব্যবহার চলিবে না।

চরণের লয় তিন প্রকার—দ্রুত, ধীর ও বিলম্বিত। বাক্‌তন্ত্রীকে ইহার যে কোন একটিতে বাঁধিয়া আমরা কবিতা পাঠ করিয়া থাকি।

দ্রুত লয়ের চরণে অতিদ্রুত অক্ষর একাধিক ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অক্ষর সাধারণতঃ লঘু হয়। যেমন,

(অ) কোন্ দেশেতে | তরুলতা | সকল দেশের | চাইতে শ্যামল

তবে মাত্রাপদ্ধতির নিয়ম বজায় রাখিয়া অন্যান্য শ্রেণীর অক্ষরও কচিৎ ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন,

(আ) এক কন্তে | না খেয়ে | বাপের বাড়ী | যান

ধীর লয়ের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুরু, অর্থাৎ স্বভাবমাত্রিক অক্ষর ব্যবহৃত হয়। যেমন,

(ই) হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ | অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে | অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত

মাত্রাপদ্ধতির নিয়ম বজায় রাখিয়া বিলম্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হইতে পারে।

(ঈ) সন্ধ্যা গগনে | নিবিড় কালিমা | অরণ্যে খেলিছে নিশি
ভীত বদনা | পৃথিবী হেরিছে | ঘোর অন্ধকারে মিশি

বিলম্বিত লয়ের চরণে লঘু ও বিলম্বিত (ধীর-বিলম্বিত এবং অতি-বিলম্বিত) অক্ষর ব্যবহৃত হয়। অতিদ্রুত ও ধীরদ্রুত (গুরু) অক্ষর বিলম্বিত লয়ের চরণে চলে না।

(উ) গুরু গর্জ্জনে | নীল অরণ্য | শিহরে
উতলা কলাপী | কেকা-কলরবে | বিহরে
নিখিল-চিত্ত- | -হরষা
ঘন গৌরবে | আসিছে মত্ত | বরষা।

(ঊ) সন্ন্যাসী বর | চমকি জাগিল,
স্বপ্ন জড়িমা | পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমা-সুন্দর | চক্ষে

(ঋ) চন্দন : তরু যব | সৌরভ : ছোড়ব | সসধর : বরিখব | আ : গি

(৯) শ্যাম বিটপি ঘন | তট বি-প্লাবিনি | ধূসর তরঙ্গ | ভঙ্গে

(এ) বহিছে : জননি : এ | ভারত : বর্ষে | কত শত : যুগ যুগ | বা : হি

এতৎসম্পর্কে অন্যান্য আলোচনা 'ছন্দের রীতি' এবং 'বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী' নামক দুইটি অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

ছন্দের সৌষম্য

[৩২] বাংলা ছন্দের সৌন্দর্য্যের জন্য পরিমিত মাত্রার পর্ব্বের যোজনা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে অক্ষরের মাত্রা সুনির্দ্দিষ্ট নহে ; হলন্ত অক্ষরের, কখন কখন স্বরান্ত অক্ষরেরও, ইচ্ছামত হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ করা হইয়া থাকে। লঘু অক্ষর ছাড়া অন্যান্য অক্ষরের অর্থাৎ গুরু এবং প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের বিশেষ প্রয়াস ও ক্রিয়া আবশ্যক হয়। সুতরাং ইহাদের ব্যবহারের সময়ে ছন্দের সৌষম্য সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি রীতির অনুসরণ করিতে হয়। পর্ব্বাঙ্গে ও পর্ব্বে কি ভাবে মাত্রা স্থির হয় তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু পরিমিত মাত্রা থাকিলেও সময়ে সময়ে পর্ব্বে বা পর্ব্বাঙ্গে সৌষম্যের অভাব ঘটিতে পারে। এই সম্পর্কে কয়েকটি রীতি আছে।

অতিবিলম্বিত ও অতিদ্রুত অক্ষরের ব্যবহারে সৌষম্যের কথা ২০শ ও ১৬শ সূত্রে আলোচনা করা হইয়াছে।

বিলম্বিত অক্ষর একই পর্ব্বাঙ্গে একাধিক ব্যবহার না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'ব্রহ্মর্ষি' 'পর্জ্জন্য' প্রভৃতি শব্দ ৫ মাত্রার ধরিয়া পড়িলে ছন্দঃপতন না হৌক্, একটু অস্বাভাবিক বোধ হয়।

গুরু অক্ষরের সৌষম্য

[৩২ ক] গুরু অক্ষরের বহুল ব্যবহার বাংলা ছন্দে চলে, কিন্তু তাহাদের সৌষম্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এই কারণেই গুরু অক্ষরের ব্যবহারের জন্য কখনও ছন্দঃ শ্রুতিকটু, আবার কখনও অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও উপাদেয় হয়। নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলিতে যে সৌষম্য রক্ষা হয় নাই, তাহা বেশ বুঝা যায়।

ডগমগ তনু | রসের ভারে
ভারত হীরারে | জিজ্ঞাসা করে (ভারতচন্দ্র)

বীর শিশু | সাহসে বুঝিয়া
উপযুক্ত | সময় বুঝিয়া (রঙ্গলাল)

ব্রজাঙ্গনে | দয়া করি
লয়ে চল | যথা হরি (মধুসূদন)

কয়েকটি উপায়ে গুরু অক্ষরের ব্যবহারে সৌষম্য রক্ষা হইতে পারে :—

(ক) গুরু অক্ষরের সন্নিধানে হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর যোজনা করিলে সৌষম্য রক্ষা হয়। যথা—

আজিকার কোন ফুল | বিহঙ্গের কোন গান | আজিকার কোন রক্তরাগ

এখানে দ্বিতীয় পর্ব্বে 'হঙ্' ও 'গের্,' এবং তৃতীয় পর্ব্বে 'রক্' ও 'রাগ' পরস্পরের সন্নিধানে থাকায় সৌষম্য রক্ষিত হইতেছে।

(খ) প্রতিসম বা সন্নিহিত পর্ব্বাঙ্গে বা পর্ব্বে সমসংখ্যক গুরু অক্ষর যোজনা করিলে সৌষম্য রক্ষা হয়।

যদি চরণে গুরু অক্ষরের সংখ্যাই বেশী হয়, তবে প্রতিসম পর্ব্বাঙ্গে বা পর্ব্বে সমসংখ্যক লঘু অক্ষর যোজনা করিলে সৌষম্য রক্ষা হয়। যথা—

প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি
অনাথ পিণ্ডদ | কহিলা অম্বুদ- | নিনাদে

জয় ভগবান্ | সর্ব্ব : শক্তিমান্ | জয় জয় : ভবপতি

দুর্দান্ত : পাণ্ডিত্য : পূর্ণ | দুঃসাধ্য : সিদ্ধান্ত

যেখানে পরস্পর সন্নিহিত দুইটি পর্ব্বের মধ্যে মাত্রার বৈষম্য আছে, সেখানে এই রীতির ব্যতিক্রম করিলেও সৌষম্য রক্ষা হয়।

সন্ধ্যা রক্ত রাগ সম | তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন

স্পর্শ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নিঃশ্বাস

কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম সর্ব্বদা হয় না।

নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো | নবকুন্দ রাজি

নহ মাতা, নহ কন্যা | নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী

যেখানে ব্যতিক্রম হয়, সেখানেও গুরু অক্ষরের যোজনা মাত্রার অনুপাতেই সাধারণতঃ করা হয়।

কিম্বা বিম্বাধরা রমা | অম্বুরাশি-তলে
জীর্ণ পুষ্পদল যথা | ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দ্দিকে

(গ) কোন বিশিষ্ট ভাবের ব্যঞ্জনার জন্য সন্নিহিত প্রতিসম পর্ব্বে গুরু অক্ষরের প্রয়োগে সৌষম্যের রীতির ব্যভিচার করা যাইতে পারে।

অনুরাগে সিক্ত করি | পারিব না পাঠাইতে | তোমাদের করে
আজি হ'তে শতবর্ষ পরে

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের মাত্রা সমান, কিন্তু গুরু অক্ষরের ব্যবহারে সৌষম্য নাই মনে হইবে। কিন্তু ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলে ছন্দের সুর ক্রমশঃ নামিয়া আসা দরকার। সেইজন্য দ্বিতীয় পর্ব্বকে প্রথম পর্ব্বের চেয়ে নরম সুরে বাঁধা হইয়াছে।

চরণ (Verse)

[৩৩] পর্ব্ব অপেক্ষা বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের নাম চরণ (Verse)। সাধারণতঃ প্রত্যেকটি চরণ এক একটি ভিন্ন পংক্তিতে (line) লিখিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া পংক্তি ও চরণ সর্ব্বদা ঠিক এক নহে। অনেক সময়ে অনুপ্রাসের অবস্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য পদ্যের এক চরণকে নানাভাবে পংক্তিতে সাজান হয়। যেমন, সাধারণ ত্রিপদী ছন্দে এক একটি চরণকে দুই পংক্তিতে লেখা হয়, কিন্তু ঐ দুই পংক্তি আসলে একই চরণের অংশ। 'বলাকা'র ছন্দেও অনেক সময়ে এক চরণকে ভাঙিয়া দুই পংক্তিতে লেখা হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে পংক্তির শেষে উপচ্ছেদ ও অন্ত্যানুপ্রাস আছে, কিন্তু পূর্ণযতি নাই। (সূঃ ৪৩, ৪৪ দ্রঃ।)

[৩৪] প্রত্যেক চরণের মধ্যে কয়েকটি পর্ব্ব এবং শেষে পূর্ণযতি থাকে। চরণের গঠন-প্রণালী হইতেই ছন্দের আদর্শ বা পরিপাটী (pattern) সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়।

[৩৪ক] প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ দুইটি, তিনটি বা চারিটি করিয়া পর্ব্ব থাকে। কখন কখন অপূর্ণ কিংবা এক পর্ব্বের চরণও দেখা যায়। কিন্তু সে

রকম চরণ প্রায়শঃ বৃহত্তর চরণের সহযোগে কোন বিশেষ ছাঁচের স্তবকের গঠনেই ব্যবহৃত হয়। পাঁচ পর্ব্বের চরণও কখন কখন দেখা যায়, কিন্তু সে রকম চরণ বাংলায় খুব শ্রুতিমধুর হয় না।

[৩৫] দ্বিপর্ব্বিক চরণই বাংলায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। অনেক সময়েই, বিশেষতঃ যেখানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ (অর্থাৎ ৮ বা ১০ মাত্রার) পর্ব্বের ব্যবহার আছে সেই সব স্থলে, দ্বিপর্ব্বিক চরণের দুইটি পর্ব্ব অসমান হয়। প্রায়ই শেষ পর্ব্বটি ছোট হইতে দেখা যায়, কখনও আবার শেষটিই বড় হয়। প্রথম প্রকারের চরণকে অপূর্ণপদী (catalectic) এবং দ্বিতীয় প্রকারের চরণকে অতিপূর্ণপদী (hyper-catalectic) বলা যায়।

ত্রিপর্ব্বিক চরণেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। প্রাচীন ছন্দে ত্রিপর্ব্বিক ছন্দ মাত্রেই প্রথম দুইটি পর্ব্ব সমান ও তৃতীয়টি দীর্ঘতর হইত। লঘু ত্রিপদীর সূত্র ছিল ৬+৬+৮ এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর সূত্র ছিল ৮+৮+১০। বর্ত্তমান যুগে কিন্তু নানা ধরণের ত্রিপর্ব্বিক চরণ দেখা যায়। ৮+৮+৬, ৮+১০+৬, ৭+৭+৭, ৮+৬+৬, ৮+১০+১০ ইত্যাদি সূত্রের ত্রিপর্ব্বিক চরণের ব্যবহার দেখা যায়।

চতুষ্পর্ব্বিক চরণে সাধারণতঃ, হয়, চারিটি পর্ব্বই সমান, না হয়, প্রথম তিনটি পরস্পর সমান এবং চতুর্থটি হ্রস্ব হয়। অন্য ধরণের চতুষ্পর্ব্বিক চরণও দেখা যায়; কিন্তু তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে একটি হ্রস্ব ও একটি দীর্ঘ পর্ব্ব থাকে, কিংবা মাঝের পর্ব্ব দুইটি পর পর সমান এবং প্রান্তস্থ পর্ব্ব দুইটিও হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর ও পরস্পর সমান হয়।

('চরণ ও স্তবক' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

স্তবক (Stanza)

[৩৬] সুশৃঙ্খল রীতিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট চরণ-পর্য্যায়ের নাম স্তবক। অনেক সময়েই মিল বা অন্ত্যানুপ্রাসের দ্বারা এই সংশ্লেষ স্পষ্ট হয়।

পরস্পর সমান দুই চরণের মিত্রাক্ষর স্তবকের ব্যবহারই বাংলায় অধিক। পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি বেশীর ভাগ প্রচলিত ছন্দই এই জাতীয়। ১০ম সূত্রে উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্ত পয়ারের ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ। আধুনিক যুগে ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ চরণের স্তবক অনেক সময়ে দেখা যায়। স্তবকে অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহারেও বর্ত্তমান যুগে বহু বিচিত্র কৌশল দেখা যায়।

পূর্ব্বে স্তবকের অন্তর্গত সব কয়টি চরণই সমান হইত এবং এক ধরণের পর্ব্বই ব্যবহৃত হইত। আধুনিক যুগে অনেক সময়ে দেখা যায় যে, স্তবকে একই মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু প্রতি চরণের পর্ব্বের সংখ্যা বা চরণের দৈর্ঘ্য এক নয়। আবার কখন কখন দেখা যায় যে, চরণের দৈর্ঘ্য সমান আছে; কিন্তু বিভিন্ন মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইতেছে।

('চরণ ও স্তবক' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

মিল বা মিত্রাক্ষর (Rime)

[৩৭] একই ধ্বনি পুনঃপুনঃ শ্রুতিগোচর হইলে তাহার ঝঙ্কার মনে বিশেষ এক প্রকার আন্দোলন উৎপাদন করে। এইরূপ একধ্বনিযুক্ত অক্ষর-যুগলকে **মিত্রাক্ষর** বলা যায়। নিয়মিত ভাবে একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলে, ছন্দ শ্রুতিমধুর হয়, এবং ইহা দ্বারা ছন্দের ঐক্যসূত্রও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

বাংলায় স্তবকের এক চরণের শেষে যে ধ্বনি থাকে, স্তবকের অন্য চরণের শেষে তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া একটি সনাতন প্রথা। ইহার এক নাম **মিল** বা **অন্ত্যানুপ্রাস** (Rime)। পূর্ব্বে বাংলা পদ্যে সর্ব্বদাই অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহৃত হইত, বর্ত্তমান কালে ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।

অন্ত্যানুপ্রাস যে মাত্র চরণের শেষেই থাকে, তাহা নহে; অনেক সময়ে চরণের অন্তর্গত পর্ব্বের শেষেও অন্ত্যানুপ্রাস দেখা যায়। সাধারণ ত্রিপদীতে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের শেষ অক্ষরে মিল দেখা যায়। চরণের ভিতরের অন্ত্যানুপ্রাস ছেদের অবস্থান নির্দ্দেশ করে। রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র কৌশলে তাঁহার কাব্যে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন। 'বলাকা'র ছন্দে অনেক সময়ে অন্ত্যানুপ্রাস মাত্র ছেদের অবস্থান-ই নির্দ্দেশ করিয়াছে। (সূঃ ৩৩, ৪৩, ৪৪ দ্রষ্টব্য)

[৩৮] মিত্রাক্ষর ধ্বনি উৎপাদনের জন্য (১) হলন্ত অক্ষর হইলে, শেষ ব্যঞ্জন ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর এক হওয়া দরকার, এবং (২) স্বরান্ত অক্ষর হইলে, অন্ত্য ও উপান্ত স্বর ও অন্ত্যস্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জন এক হওয়া দরকার। এইখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, বাংলা ছন্দের রীতিতে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের ধ্বনি একই বলিয়া বিবেচিত হয়। এইজন্য 'শিখ্' ও 'নির্ভীক,' 'জেগে' ও 'মেঘে,' 'বাজে' ও 'সাঝে' পরস্পর মিত্রাক্ষর।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

[৩৯] মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম বাংলা ভাষায় ইংরেজীর অনুসরণে blank verse লেখেন। ইংরেজীর অনুকরণে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে **অমিত্রাক্ষর**; কারণ, তিনি এই নূতন ছন্দে প্রতি জোড়া চরণের শেষে মিত্রাক্ষর ব্যবহারের প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অমিত্রাক্ষর নামটি সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হয় নাই; কারণ, চরণের শেষে মিল থাকা বা না থাকা ইহার প্রধান লক্ষণ নহে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণের শেষে যদি মিল থাকিত, তাহা হইলেও ইহা সাধারণ মিত্রাক্ষর হইতে ভিন্ন থাকিত। আবার পয়ার প্রভৃতি ছন্দের মিল যদি উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইবে না। তবে প্রচলিত নাম বলিয়া 'অমিত্রাক্ষর' কথার দ্বারাই আমরা 'মেঘনাদবধে'র ছন্দকে নির্দ্দেশ করিতে পারি।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ—এই ছন্দে অর্থ-বিভাগ ও ছন্দোবিভাগ পরস্পর মিলিয়া যায় না, অর্থাৎ যতি ছেদের অনুগামী হয় না। সাধারণতঃ পদ্যে দেখা যায় যে, যেখানে ছেদ, সেখানেই যতি পড়ে। মাঝে মাঝে অবশ্য দেখা যায় যে, উপচ্ছেদ ও অর্দ্ধযতি ঠিক মেলে না; কিন্তু সাধারণ ছন্দে পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি মিলিয়া যাইবেই। এক একটি চরণ এক একটি সম্পূর্ণ অর্থ-বিভাগ। ছন্দের আদর্শ অনুসারে পরিমিত মাত্রার পর যতি পড়ে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ ছন্দে পরিমিত মাত্রার অক্ষরের পর ছেদ পড়ে; কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর এবং আরও অনেক আধুনিক ছন্দোবন্ধে কয় মাত্রার পর ছেদ পড়িবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই, আবেগের তীব্রতা অনুসারে তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে পড়ে। এই সমস্ত নূতন ধরণের ছন্দকে **অমিতাক্ষর** ও সাধারণ ছন্দকে **মিতাক্ষর** বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০ম সূত্রের অন্তর্গত পঞ্চম দৃষ্টান্তটি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের উদাহরণ। যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া তাঁহার অমিত্রাক্ষর পয়ারের অনুরূপ; অর্থাৎ ১৪ মাত্রার প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি এবং চরণের প্রথম ৮ মাত্রার পর অর্দ্ধযতি আছে। কিন্তু প্রায়ই পর্ব্বের মধ্যে কোন পর্ব্বাঙ্গের পর ছেদ আছে। এক একটি চরণ লইয়া অর্থ-বিভাগ সম্পূর্ণ হয় না; এক চরণের সহিত অপর চরণের কোন অংশ মিলাইয়া অথবা এক চরণের কোন ভগ্নাংশ লইয়া এক একটি অর্থ-বিভাগ হয়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ বসাইবার বৈচিত্র্যের দরুণ তাঁহার ছন্দ

অর্থ-বিভাগের দিক্ দিয়া বিচিত্রভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর এক প্রকার অমিতাক্ষর ছন্দ।

[৪০] মধুসূদন ছাড়া আরও অনেকে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অমিতাক্ষরে কিছু কিছু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেন মাঝে মাঝে অন্য এক প্রকার রীতিতে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা করিতেন। তিনি পর্ব্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ বসাইতেন না, কিন্তু যেখানে অর্দ্ধযতির অবস্থান, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ দিতেন—

দূর হোক্ ইতিহাস! | * * দেখ একবার ||
মানবহৃদয় রাজ্য। | * * দেখ নিরন্তর ||
বহিতেছে কি ঝটিকা। | * *

[৪১] রবীন্দ্রনাথ আর এক প্রকারের অভিনব অমিতাক্ষরে বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। এ রকম অমিতাক্ষর ছন্দে প্রতি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু ঠিক একই প্রকারের পর্ব্ব সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, ইচ্ছা-মত বিভিন্ন প্রকারের পর্ব্বের সমাবেশ হয়; পর্ব্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ প্রায় থাকে না, থাকিলেও বিজোড় সংখ্যক মাত্রার পরে বসে না; প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি নির্দ্দেশের জন্য পয়ারের অনুকরণে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ইহা মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দ।

(১০ম সূত্রের অন্তর্গত ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তটি ইহার উদাহরণ)

[৪২] রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে ১৪ মাত্রার চরণই বেশীর ভাগ ব্যবহার করিয়াছেন। কখন কখন আবার তিনি ঈদৃশ ছন্দে ১৮ মাত্রার চরণ ব্যবহার করিয়াছেন। এসব ক্ষেত্রেও লক্ষণাদি পূর্ব্ববৎ, কেবল ৮ মাত্রা ও ১০ মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়।

হে আদি জননী সিন্ধু, | * বসুন্ধরা সন্তান তোমার, || *
একমাত্র কন্যা তব কোলে। | * * তাই * তন্দ্রা নাহি আর ||
চক্ষে তব, * তাই বক্ষ জুড়ি | * সদা শঙ্কা, সদা আশা, ||
সদা আন্দোলন; * *...... (সমুদ্রের প্রতি)

[৪৩] রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'তে আর একপ্রকারের অমিতাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতেও মিত্রাক্ষর আছে; কিন্তু তাহা মাত্র চরণের শেষে না থাকিয়া বিচিত্রভাবে চরণের ভিতরে ছেদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মিত্রাক্ষরের

অবস্থান অনুসারে পংক্তি সাজান হয় বলিয়া আপাততঃ এ রকম ছন্দের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা দুরূহ মনে হয়। যথা,—

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

যতি ও ছেদ বিচার করিয়া ইহার ছন্দোলিপি করিলে স্তবকটি এইরূপ দাঁড়ায়—

(ক) (ক)
হে ভুবন * আমি যতক্ষণ | * তোমারে না ||

(খ) (ক) (খ)
বেসেছিনু ভালো | * * ততক্ষণ *—তব আলো || *

(ক)
খুঁজে খুঁজে পায় নাই | * তার সব ধন। || * *

(ক) (ক) (গ)
ততক্ষণ * নিখিল গগন | * হাতে নিয়ে ||

(গ)
দীপ তার | * শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে || * *

এক একটি অর্থ-বিভাগের শীর্ষে সূচী-বর্ণ দিয়া ইহার মিত্রাক্ষর বসাইবার রীতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর হইতে ইহা বিশেষ বিভিন্ন নহে।

[৪৪] 'বলাকা'য় আর একটু অন্য রকমের ছন্দও আছে। ইহাদের ছন্দোলিপি করা আরও দুরূহ বলিয়া মনে হইতে পারে।

যথা—

হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা,
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্
শুধু থাক্
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

এইরূপ পদ্যের ছন্দোলিপি করার সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পর্ব্বের পূর্ব্বে কখন কখন ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। (২৯ সংখ্যক সূত্র দ্রষ্টব্য)

এই ধরণের ছন্দে রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দ বসাইয়া ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করিয়াছেন।

উপরের উদ্ধৃতাংশের ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে—

হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা *	=০+১০	}
যেন শূন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা *	=৮+১০	
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্ * *	=০+১০	
(শুধু থাক্) এক বিন্দু নয়নের জল *	=০+১০	
কালের কপোল-তলে | শুভ্র সমুজ্জ্বল *	=৮+৬	}
এ তাজমহল * *	=০+৬	

দেখা যাইতেছে যে, এই রকমের ছন্দ মিতাক্ষরের জটিল স্তবকের রূপান্তর মাত্র। উপরের চারিটি চরণ লইয়া একটি স্তবক এবং নীচের দুইটি চরণ লইয়া আর একটি স্তবক। চরণগুলি দ্বিপর্ব্বিক,—হয় পূর্ণ, না হয় অপূর্ণ, অর্থাৎ কোন একটি পর্ব্বের স্থান ফাঁক দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছে। (এইরূপ দীর্ঘ ও হ্রস্ব চরণের সমাবেশ মিতাক্ষর ছন্দের অনেক স্তবকেও দেখা যায়।) ছেদ চরণের অন্তেই পড়িতেছে, ইহাও মিতাক্ষরের লক্ষণ। সুকৌশলে মিত্রাক্ষরের এবং মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহে বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে।

[৪৫] এতদ্ভিন্ন গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর এক প্রকারের ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ "গৈরিশ ছন্দ" নামে অভিহিত হয়। এখানে প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্ব্ব থাকে। ভাবের গাম্ভীর্য্য-অনুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়, এবং পর্ব্ব দুইটি দৈর্ঘ্যে প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে। প্রত্যেক চরণই একটি পূর্ণ অর্থ-বিভাগ, নিকটস্থ অন্যান্য চরণের সহিত তাহার সংশ্লেষ থাকে না। মধ্যে মধ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করা হয়।

গিরিধারী, * নাহি | বাহুবল তব,	=৬+৬
চাহ বুঝাইতে | (তোমা হ'তে) আমি বলাধিক।	=৬+৬
ক্ষত্রিয়-সমাজে | (কথা বটে) সম্মানসূচক,	=৬+৬
ছল নহি আমি | —অতি ছল তুমি	=৬+৬
মুক্ত কণ্ঠে | করি হে স্বীকার।	=৪+৬

ছলে চাহ | ভুলাইতে, =৪ + ৪
ছলে কহ | আশ্রিতে ত্যজিতে, =৪ + ৬
চতুরের | চূড়ামণি তুমি। =৪ + ৬

(সূঃ ৪৩, ৪৪, ৪৫ সম্পর্কে পরিশিষ্টে "বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ" শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

চরণ ও স্তবক

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা ছন্দের মূলসূত্রের আলোচনা করিয়াছি। বাংলা ছন্দের উপকরণ—পর্ব্ব, এবং সমমাত্রিক পর্ব্বের সমাবেশেই চরণ, স্তবক ইত্যাদি গঠিত হয়। সংস্কৃতে এরূপ প্রত্যেক সমাবেশের এক একটি বিশেষ নাম আছে, যথা—অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, ইন্দ্রবজ্রা, স্রগ্ধরা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত প্রভৃতি। বাংলায় এরূপ পয়ার, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি কয়েকটি নাম অনেক দিন হইতে চলিত আছে। এই সকল ছন্দোবন্ধের মধ্যে সুপরিচিত কয়েকটির উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

পয়ারে দুই চরণ, ও প্রতি চরণে দুই পর্ব্ব থাকিত। প্রথম পর্ব্বে ৮ ও দ্বিতীয় পর্ব্বে ৬ মাত্রা থাকিত। চরণ দুইটি পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত।

মহাভারতের কথা | অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান্॥

লঘু ত্রিপদীরও দুই মিত্রাক্ষর চরণ এবং প্রতি চরণে তিনটি পর্ব্ব থাকিত। মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬+৬+৮।

জয় ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্
জয় জয় ভবপতি।
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ—
তোমাতেই থাকে মতি। (ঈশ্বর গুপ্ত)

দীর্ঘ ত্রিপদীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৮+৮+১০।

যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়—
ভয়ে যত নৃপতি তটস্থ॥ (ভারতচন্দ্র)

ত্রিপদী মাত্রেরই চরণের প্রথম দুইটি পর্ব্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত।

একাবলীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬+৫। যথা—

বড়র পীরিতি | বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ' ক্ষণেকে চাঁদ (ভারতচন্দ্র)

লঘু চৌপদীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬+৬+৬+৫। যথা—

এক দিন দেব ¦ তরুণ তপন, | হেরিলেন সুর | নদীর জলে
অপরূপ এক | কুমারী-রতন | খেলা করে নীল | নলিনী দলে।
(বিহারীলাল)

দীর্ঘ চৌপদীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৮+৮+৮+৭। যথা—

ভরদ্বাজ-অবতংস | ভূপতি রায়ের বংশ | সদা ভাবে হত-কংস | ভুরশুটে বসতি ॥
নরেন্দ্র রায়ের সুত | ভারত ভারতীযুত | ফুলের মুখুটি খ্যাত | দ্বিজপদে সুমতি ॥
(ভারতচন্দ্র)

মাল ঝাঁপের মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৪+৪+৪+২; প্রথম তিনটি পর্ব্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত। যথা—

কোতোয়াল | যেন কাল | খাঁড়া ঢাল | হাঁকে (ভারতচন্দ্র)

মালতীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৮+৭; পয়ারের শেষে ১ মাত্রা যোগ করিয়া মালতীর ছন্দ হইত।

বড় ভাল বাসি আমি | তারকার মাধুরী
মধুর মূরতি এরা | জানেনা ক চাতুরী (বিহারীলাল)

এ সমস্ত ছন্দোবন্ধেই মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ লইয়া স্তবক গঠিত হইত।

কিন্তু আধুনিক বাংলায় এত বিচিত্র রকমের চরণ ও স্তবক ব্যবহৃত হইয়াছে যে তাহাদের সকলের নাম দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পক্ষে এরূপ নামকরণেরও বিশেষ সার্থকতা নাই। আমরা কয়েক প্রকারের সুপ্রচলিত চরণ ও স্তবকের উদাহরণ দিতেছি। *

---

* মৎপ্রণীত Studies in Rabindranath's Prosody (Journal of the Department of Letters, Vol XXXI, Calcutta University) নামক প্রবন্ধে আরও অধিক সংখ্যক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

চরণ

চার মাত্রার ছন্দ

(যেখানে মূল পর্ব্বে চার মাত্রা থাকে)

দ্বিপর্ব্বিক—

পূর্ণপদী— জল পড়ে | পাতা নড়ে =৪+৪

ধিন্‌তা ধিনা | পাকা নোনা =৪+৪

অপূর্ণপদী— একটি ছোট | মালা =৪+২

হাতের হবে | বালা =৪+২

অতিপূর্ণপদী— সারাদিন | অশান্ত বাতাস =৪+৬

ফেলিতেছে | মর্ম্মর নিঃশ্বাস =৪+৬

ত্রিপর্ব্বিক—

পূর্ণপদী— মিথ্যে তুমি | গাথলে মালা | নবীন ফুলে =৪+৪+৪

ভেবেছ কি | কণ্ঠে আমার | দেবে তুলে =৪+৪+৪

অপূর্ণপদী— কৃষ্ণ কলি | আমি তারেই | বলি =৪+৪+২

কালো তারে | বলে গাঁয়ের | লোক =৪+৪+২

চতুষ্পর্ব্বিক—

পূর্ণপদী— জলে বাসা | বেঁধে ছিলেম | ডাঙায় বড় | কিচিমিচি =৪+৪+৪+৪

সবাই গলা | জাহির করে | চেঁচায় কেবল | মিছি মিছি =৪+৪+৪+৪

অপূর্ণপদী— রাত্‌ পোহাল | ফরসা হল | ফুটল কত | ফুল =৪+৪+৪+১

কাঁপিয়ে পাখা | নীল পতাকা | জুটল অলি | কুল =৪+৪+৪+১

পঞ্চপর্ব্বিক—

অপূর্ণপদী— পড়্‌তে হবে | করে দিলেম | ইংরেজি এক | নভেল কিনে | এনে

=৪+৪+৪+৪+২

পাঁচ মাত্রার ছন্দ

দ্বিপর্ব্বিক— গোপন রাতে | অচল গড়ে =৫+৫

নহর বাঁরে | এনেছে ধরে =৫+৫

চতুষ্পর্ব্বিক— বসন কার | দেখিতে পাই | জ্যোৎস্না লোকে | লুণ্ঠিত =৫+৫+৫+৪

বদন কার | দেখিতে পাই | কিরণে অব- | গুণ্ঠিত =৫+৫+৫+৪

ছয় মাত্রার ছন্দ

দ্বিপর্ব্বিক— নীরবে দেখাও | অঙ্গুলি তুলি =৬+৬

অকূল সিন্ধু | উঠেছে আকুলি =৬+৬

শুধু অকারণ | পুলকে =৬+৩

ছুটে যা ঝলকে | ঝলকে =৬+৩

ত্রিপর্ব্বিক— তোমরা হাসিয়া | বহিয়া চলিয়া | যাও =৬+৬+২

কুলু কুলু কল | নদীর স্রোতের | মত =৬+৬+২

ঐ (লঘু ত্রিপদী)— শাখী শাখা যত | ফল ভরে নত | চরণে প্রণত তারা =৬+৬+৮

পল্লব নড়িছে | সলিল পড়িছে | ঝর ঝর প্রেম ধারা =৬+৬+৮

চতুষ্পর্ব্বিক— সব ঠাঁই মোর | ঘর আছে আমি | সেই ঘর মরি | খুঁজিয়া =৬+৬+৬+৩

দেশে দেশে মোর | দেশ আছে, আমি | সেই দেশ লবো | বুঝিয়া

=৬+৬+৬+৩

সাত মাত্রার ছন্দ

দ্বিপর্ব্বিক— পুরব মেঘ মুখে | পড়েছে রবিরেখা =৭+৭

অরুণ রথচূড়া | আধেক যায় দেখা =৭+৭

ঐ (অপূর্ণপদী)— সমাজ সংসার | মিছে সব =৭+৪

মিছে এ জীবনের | কলরব =৭+৪

ত্রিপর্ব্বিক— ললাটে জয়টীকা | প্রসূন হার গলে | চলে রে বীর চলে =৭+৭+৭

সে কান্না নহে কান্না | যেখানে ভৈরব | রুদ্র শিখা জ্বলে =৭+৭+৭

চতুষ্পর্ব্বিক— এসেছে সখা সখী | বসিয়া চোখোচোখি | দাঁড়ায়ে মুখোমুখি | হাসিছে শিশুগুলি

এসেছে ভাইবোন | পুলকে ভরা মন, | ডাকিছে ভাই ভাই | আঁখিতে আঁখি তুলি
=৭+৭+৭+৭

ঐ (অপূর্ণপদী)— খাঁচার পাখি ছিল | সোনার খাঁচাটিতে | বনের পাখী ছিল | বনে
=৭+৭+৭+২

একদা কি করিয়া | মিলন হ'ল দোঁহে | কি ছিল বিধাতার | মনে
=৭+৭+৭+২

আট মাত্রার ছন্দ

দ্বিপর্ব্বিক— সেই দিন ও চরণে | ডালি দিনু এ জীবন =৮+৮

হাসি অশ্রু সেই দিন | করিয়াছি বিসর্জ্জন =৮+৮

(পয়ার)— রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে =৮+৬

শিশুগণ দেয় মন | নিজ নিজ পাঠে =৮+৬

সুখের শিশির কাল | সুখে পূর্ণ ধরা =৮+৬

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ | তবু রঙ্গ ভরা =৮+৬

গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা =৮+৫

তীরে একা বসে আছি | নাহি ভরসা =৮+৫

ত্রিপর্ব্বিক— নদীতীরে বৃন্দাবনে | সনাতন একমনে | জপিছেন নাম =৮+৮+৬

হেন কালে দীন বেশে | ব্রাহ্মণ চরণে এসে | করিল প্রণাম =৮+৮+৬

ত্রিপর্ব্বিক (দীর্ঘ ত্রিপদী)—

ব'লো না কাতর স্বরে | বৃথা জন্ম এ সংসারে | এ জীবন নিশার স্বপন

দারা পুত্র পরিবার | তুমি কার কে তোমার | ব'লে জীব ক'রো না ক্রন্দন
=৮+৮+১০

চতুষ্পর্ব্বিক—

বনের মর্ম্মর মাঝে | বিজনে বাঁশরি বাজে | তারি সুরে মাঝে মাঝে | ঘুঘু দুটি গান গায়

ঝুরু ঝুরু কত পাতা | গাহিছে বনের গাথা | কত না মনের কথা | তারি সাথে মিশে যায়
=৮+৮+৮+৮

রাশি রাশি ভারা ভারা | ধান কাটা হ'ল সারা | ভরা নদী ক্ষুরধারা | খর-পরশা
=৮+৮+৮+৫

দশ মাত্রার ছন্দ

দ্বিপর্ব্বিক—ওর প্রাণ আঁধার যখন | করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি =১০+১০
দুয়ারেতে সজল নয়ন | এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি =১০+১০

বিবিধ

দ্বিপর্ব্বিক— হে নিস্তব্ধ, গিরিরাজ | অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত =৮+১০
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে | অনুদাত্ত, উদাত্ত, স্বরিত =৮+১০

ত্রিপর্ব্বিক— ঈশানের পুঞ্জ মেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চ'লে আসে | বাধা বন্ধ হারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে | নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া | হানি দীর্ঘ ধারা
=৮+১০+৬

স্তবক

বাংলা কাব্যে আজকাল অসংখ্য প্রকারের স্তবক দেখা যায়। মাত্র কয়েকটি সুপ্রচলিত স্তবক ও তাহাদের গঠন-প্রণালীর উল্লেখ করা এখানে সম্ভব।

স্তবকের গঠনে বহু বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রায় সর্ব্বদাই দেখা যাইবে যে কোন এক বিশিষ্ট-সংখ্যক মাত্রার পর্ব্ব-ই ইহার মূল উপকরণ। স্তবকের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি চরণের পর্ব্বসংখ্যা সমান না হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা মূলে সমান। অবশ্য অনেক সময়েই চরণের শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণ হইয়া থাকে, এবং কখন কখন স্তবকের মধ্যে খণ্ডিত চরণের ব্যবহার দেখা যায়।

স্তবকের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিলের দ্বারাই সাধারণতঃ চরণে চরণে সংশ্লেষ নির্দ্দিষ্ট হয়। আমরা ক, খ, গ,...ইত্যাদি বর্ণের দ্বারা অন্ত্যানুপ্রাস যোজনার রীতি নির্দ্দেশ করিব। কোন স্তবককে ক-খ-খ-ক এই সঙ্কেত দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে বুঝিতে হইবে যে ঐ স্তবকে চারিটি চরণ আছে, এবং প্রথম ও চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের মধ্যে মিল আছে।

দুই চরণের স্তবক

পরস্পর সমান ও মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ দিয়া স্তবক বা শ্লোক রচনার রীতি-ই বহুকাল হইতে আজও সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। পূর্ব্বে ত ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রকার স্তবক ছিলই না। পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি সবই এই জাতীয়। নানাবিধ চরণের উদাহরণ দিবার সময়ে এইরূপ বহু স্তবকের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

আধুনিক কালে কখনও কখনও দেখা যায় যে এইরূপ স্তবকের চরণ দুইটি ঠিক সর্ব্বাংশে এক নহে ; যথা—

কতবার মনে করি | পূর্ণিমা নিশীথে | স্নিগ্ধ সমীরণ =৮+৬+৬
নিদ্রালস আঁখি সম | ধীরে যদি মুদে আসে | এ শ্রান্ত জীবন =৮+৮+৬

আবার অনেক সময়ে দেখা যায় যে চরণ দুইটির পর্ব্বসংখ্যা সমান নহে ; যথা—

শুধু অকারণ | পুলকে =৬+৩
ক্ষণিকের গান | গা রে আজি প্রাণ | ক্ষণিক দিনের | আলোকে =৬+৬+৬+৩

তিন চরণের স্তবক

এরূপ স্তবকের ব্যবহার আগে ছিল না, আজকাল দেখা যায়। ইহাতে নানাভাবে মিল দেওয়া যায় ; যেমন ক-ক-ক, ক-খ-ক, ক-খ-খ, ক-ক-খ। তিনটি চরণই ঠিক একরূপ হইতে পারে ; যেমন—

নিত্য তোমার | চিত্ত ভরিয়া | স্মরণ করি =৬+৬+৫
বিশ্ব-বিহীন | বিজনে বসিয়া | বরণ করি =৬+৬+৫
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি =৬+৬+৫

বিভিন্ন-সংখ্যক পর্ব্বের চরণ লইয়াও এরূপ স্তবক গঠিত হইতে পারে। বিশেষতঃ প্রথম দুইটি ছোট, এবং তৃতীয়টি বড়—এইরূপ স্তবক বেশ প্রচলিত ; যেমন—

সবার মাঝে আমি | ফিরি একেলা =৭+৫
কেমন করে কাটে | সারাটা বেলা =৭+৫
ইঁটের পরে ইঁট | মাঝে মানুষ কীট | নাইকো ভালবাসা | নাইকো খেলা =৭+৭+৭+৫

চার চরণের স্তবক

এরূপ স্তবকের ব্যবহার বেশ প্রচলিত। ক-খ-ক-খ, ক-খ-খ-ক, ক-ক-ক-খ চ-ক-ছ-ক, এইরূপ নানাভাবে এখানে মিল দেওয়া যায়। চরণগুলি ঠিক একরূপ হইতে পারে ; যেমন—

অঙ্গে অঙ্গ | বাঁধিছ রঙ্গ | পাশে =৬+৬+২
বাহুতে বাহুতে | জড়িত ললিত | লতা =৬+৬+২
ইঙ্গিত রসে | ধ্বনিয়া উঠিছে | হাসি =৬+৬+২
নয়নে নয়নে | বহিছে গোপন | কথা =৬+৬+২

আবার, বিভিন্ন-সংখ্যক পর্ব্বের চরণ লইয়াও এইরূপ স্তবক রচিত হইতে পারে। তন্মধ্যে, নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রকার আজকাল বেশ প্রচলিত ; যেমন,

(ক) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ছোট, এবং তৃতীয়টি বড় ; যথা—

সে কথা শুনিবে না | কেহ আর =৭+৪
নিভৃত নির্জ্জন | চারি ধার =৭+৪
দু'জনে মুখোমুখি | গভীর দুখে দুখী, | আকাশে জল ঝরে | অনিবার =৭+৭+৭+৪
জগতে কেহ যেন | নাহি আর =৭+৪

(খ) প্রথম ও চতুর্থটি বড়, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ছোট ; যথা—

বহে মাঘ মাসে | শীতের বাতাস, | স্বচ্ছ-সলিলা | বরুণা। =৬+৬+৬+৩
পুরী হতে দূরে | গ্রামে নির্জ্জনে =৬+৬
শিলাময় ঘাটে | চম্পক-বনে =৬+৬
স্নানে চলেছেন | শত সখী সনে | কাশীর মহিষী | করুণা। =৬+৬+৬+৩

(গ) প্রথম ও তৃতীয়টি বড় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থটি ছোট ; যেমন—

পঞ্চশরে | দগ্ধ ক'রে | করেছো এ কি, | সন্ন্যাসী, =৫+৫+৫+৪
বিশ্বময় | দিয়েছো তারে | ছড়ায়ে ; =৫+৫+৩
ব্যাকুলতর | বেদনা তার | বাতাসে উঠে | নিঃশ্বাসি' =৫+৫+৫+৪
অশ্রু তার | আকাশে পড়ে | গড়ায়ে। =৫+৫+৩

পাঁচ চরণের স্তবক

পাঁচ চরণের স্তবক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায়। বিশেষতঃ প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চমটি বড়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থটি ছোট, এইরূপ স্তবক তাঁহার বেশ প্রিয় বলিয়া মনে হয়। যেমন,—

বিপুল গভীর | মধুর মন্দ্রে | কে বাজাবে সেই | বাজনা। =৬+৬+৬+৩
উঠিবে চিত্ত | করিয়া নৃত্য | বিস্মৃত হবে | আপনা। =৬+৬+৬+৩
টুটিবে বন্ধ | মহা আনন্দ, =৬+৬
নব সঙ্গীতে | নূতন ছন্দ, =৬+৬
হৃদয়সাগরে | পূর্ণচন্দ্র | জাগাবে নবীন | বাসনা। =৬+৬+৬+৩

ছয় চরণের স্তবক

ছয় মাত্রার পর্ব্বের ন্যায় ছয় চরণের স্তবক-ও আজকাল খুব প্রচলিত। তন্মধ্যে কয়েক প্রকারের স্তবক খুব জনপ্রিয়। প্রথম প্রকারের স্তবকের ছয়টি চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম চরণ পরস্পর সমান ও ছোট হয়, এবং ৩য় ও ৬ষ্ঠ চরণ অপেক্ষাকৃত বড় ও পরস্পর সমান হয়। যথা,—

"প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি,	=৬+৬
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি"	=৬+৬
অনাথ-পিণ্ডদ | কহিলা অম্বুদ- | নিনাদে।	=৬+৬+৩
সদ্য মেলিতেছে | তরুণ তপন	=৬+৬
আলস্যে অরুণ | সহাস্য লোচন	=৬+৬
শ্রাবস্তী পুরীর | গগন-লগন | প্রাসাদে।	=৬+৬+৩

দ্বিতীয় প্রকার স্তবকের ছয়টি চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ পরস্পর সমান ও বড় হয়, এবং ৩য় ও ৪র্থ চরণ অপেক্ষাকৃত ছোট ও পরস্পর সমান হয়। যথা—

আজি কী তোমার | মধুর মুরতি | হেরিনু শারদ | প্রভাতে,	=৬+৬+৬+৩
হে মাতঃ বঙ্গ | শ্যামল অঙ্গ | ঝলিছে অমল | শোভাতে।	=৬+৬+৬+৩
পারে না বহিতে | নদী জল-ধার,	=৬+৬
মাঠে মাঠে ধান | ধরে নাকো আর,	=৬+৬
ডাকিছে দোয়েল, | গাহিছে কোয়েল | তোমার কানন- | সভাতে,	=৬+৬+৬+৩
মাঝখানে তুমি | দাঁড়ায়ে জননী | শরৎ কালের | প্রভাতে।	=৬+৬+৬+৩

ইহা ছাড়া আরও নানা ছাঁচের ও নক্সার স্তবক দেখিতে পাওয়া যায়। সাতটি, আটটি, নয়টি, দশটি চরণ দিয়াও স্তবক গঠিত হইতে দেখা যায়। হেমচন্দ্রের "ভারতভিক্ষা" ইত্যাদি Ode জাতীয় কয়েকটি কবিতা, রবীন্দ্রনাথের "উর্ব্বশী", "ঝুলন" প্রভৃতি কবিতা এই সম্পর্কে উল্লেখ-যোগ্য। বলা বাহুল্য যে মিত্রাক্ষরের সংশ্লেষ এবং একই মূল পর্ব্বের ব্যবহারের দ্বারাই এইরূপ দীর্ঘ স্তবকের গঠন সম্ভব হইয়াছে। দীর্ঘ স্তবকগুলিতে কিন্তু প্রায়ই পর্ব্বসংখ্যা ও দৈর্ঘ্যের দিক্ দিয়া চরণে চরণে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। নহিলে অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া এই সমস্ত স্তবক অত্যন্ত ক্লান্তিকর মনে হইত। দৈর্ঘ্যের বৈচিত্র্যের দ্বারা ভাব-প্রবাহের ব্যঞ্জনার-ও সুবিধা হয়।

সনেট্

এই উপলক্ষে সনেট্ (Sonnet) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। সনেট্ য়ুরোপীয় কাব্যে খুব সুপ্রচলিত। সুপ্রসিদ্ধ ইতালীয় কবি পেত্রার্ক ইহার প্রচলন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যেও সনেট্ লেখা আরম্ভ হয়। সনেট্ সাধারণতঃ দীর্ঘ কবিতার উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যধর্ম্মী চরণে লিখিত হয়, এবং ইহাতে ১৪টি করিয়া চরণ থাকে। ইহার মধ্যে প্রথম ৮টি চরণ লইয়া একটি বিভাগ (অষ্টক), এবং শেষের ৬টি চরণ লইয়া আর একটি বিভাগ (ষট্‌ক); সনেটের ভাবের দিক দিয়াও এইরূপ বিভাগ দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে মিত্রাক্ষর-স্থাপনের যে বিচিত্র কৌশল আবশ্যক, তাহাতেই ইহার বিশেষত্ব। সাধারণতঃ ইহাতে ক-খ-খ-ক, গ-ঘ-ঘ-গ, চ-ছ-চ-ছ-চ-ছ / চ-ছ-জ-চ-ছ-জ এই পদ্ধতি-ক্রমে মিত্রাক্ষর যোজনা করা হয়। কিন্তু মোটামুটি এই কাঠাম রাখিয়া একটু আধটু পরিবর্ত্তন করা চলে, ও করা হইয়া থাকে।

বাংলায় মধুসূদন-ই চতুর্দ্দশপদী কবিতা নাম দিয়া সনেটের প্রথম প্রচলন করেন। তিনি পয়ারের ৮+৬ এই সঙ্কেতের চরণকেই বাংলা সনেটের বাহন করিয়া লইলেন, এবং তাহাই অদ্যাপি চলিত আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ৮+১০ সঙ্কেতের চরণ লইয়াও সনেট্ রচনা করিয়াছেন। ('কড়ি ও কোমল' দ্রষ্টব্য।)

মধুসূদন পয়ারের চরণ লইয়া সনেট্ রচনা করিলেও ছন্দের প্রবাহে অনেক সময়েই তাঁহার অমিতাক্ষরের লক্ষণ দেখা যায়। মিত্রাক্ষর-যোজনা-বিষয়ে তিনি পেত্রার্কের রীতিই মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি বাংলা সনেটের সুন্দর উদাহরণ।

বাল্মীকি		মিত্রাক্ষর-স্থাপনের রীতি	
স্বপনে ভ্রমিনু আমি | গহন কাননে	... ৮+৬ ...	ক	অষ্টক
একাকী। দেখিনু দূরে | যুবা একজন,	... ৮+৬ ...	খ	
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে | প্রাচীন ব্রাহ্মণ,	... ৮+৬ ...	খ	
দ্রোণ যেন ভয়শূন্য | কুরুক্ষেত্র-রণে।	... ৮+৬ ...	ক	
"চাহিস বধিতে মোরে | কিসের কারণ?"	... ৮+৬ ...	খ	
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর | মধুর বচনে।	... ৮+৬ ...	ক	
"বধি তোমা হরি আমি | লব সব ধন"	... ৮+৬ ...	খ	
উত্তরিলা যুবজন | ভীম গরজনে।	... ৮+৬ ...	ক	

			মিত্রাক্ষর-স্থাপনের রীতি	
পরিবরতিল স্বপ্ন, | শুনিনু সত্বরে	···	৮+৬ ···	গ	ষট্‌ক
সুধাময় গীতধ্বনি ; | আপনি ভারতী,	···	৮+৬ ···	ঘ	
মোহিতে ব্রহ্মার মন, | স্বর্ণবীণা করে,	···	৮+৬ ···	গ	
আরম্ভিলা গীত যেন | — মনোহর অতি।	···	৮+৬ ···	ঘ	
সে দুরন্ত যুবজন, | সে বৃদ্ধের বরে,	···	৮+৬ ···	গ	
হইল, ভারত, তব | কবি-কুল-পতি।	···	৮+৬ ···	ঘ	

মধুসূদনের পর যাঁহারা সনেট্ লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় মোটামুটি পেত্রার্কীয় সনেটের ধারার অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সনেটে মিতাক্ষর ও অমিতাক্ষর উভয়েরই প্রবাহ দেখা যায়। কিন্তু মিত্রাক্ষর-যোজনা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে তাঁহার সনেট্, সাতটি দুই চরণের স্তবকের সমষ্টি মাত্র। ('চৈতালি', 'নৈবেদ্য' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)

বাংলা ছন্দে জাতি-ভেদ (?)

বাংলা ছন্দের যে কয়েকটি সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সমস্ত বাংলা কবিতাতেই খাটে। ঐ সূত্রগুলি বাংলা ভাষার প্রকৃতি, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। নানা ভঙ্গীতে কবিরা কাব্যরচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু সকলেরই ছন্দের 'কান' ঐ সূত্রগুলি মানিয়া চলে। দেখা যাইবে যে, অ-দুষ্ট ছন্দের সমস্ত বাংলা কবিতারই ঐ সূত্র অনুসারে সুন্দর ছন্দোলিপি করা যায়। এতদ্দ্বারা সমগ্র বাংলা কাব্যের ছন্দের একটি ঐক্যসূত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি ইহার নাম দিয়াছি The Beat and Bar Theory বা **পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদ**।

বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই বাংলা ছন্দঃপদ্ধতির মূল ঐক্যটি ধরিতে পারেন নাই। বাংলায় অক্ষরের (syllable-এর) মাত্রা বাঁধা-ধরা কিংবা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নহে, ছন্দের আবশ্যকতা মত অক্ষরের (syllable-এর) হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘীকরণ হইয়া থাকে ; কিন্তু ছন্দের আবশ্যকতার সূত্র কি, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, তাঁহারা বাংলায় নানারকম 'স্বতন্ত্র' রীতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা বাংলা ছন্দকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া 'স্বরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' এবং 'অক্ষরবৃত্ত' এই তিনটি নাম দিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে, তিনটি বিভিন্ন রীতিতে বাংলায় ছন্দ রচিত হয়। কখন কখন তাঁহারা আবার চারিটি, পাঁচটি, কি ততোঽধিক বিভাগ কল্পনা করিতেছেন।

অবশ্য অনেক দিন পূর্ব্বেই, বাংলায় তিন ধরণের ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। যাঁহারা কবি, তাঁহারা ত স্বীকার করিতেন-ই, যাঁহারা ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করিতেন, তাঁহারাও করিতেন। ১৩২৩ সনে দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে স্বর্গীয় রাখালরাজ রায় মহাশয় এতৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন—"বাঙ্গালায় এখন তিন প্রকারের ছন্দ চলিয়াছে। প্রথম—অক্ষর গণনা করিয়া, ২য় প্রকার—মাত্রা গণনা করিয়া, আর এক প্রকারের ছন্দ খনার বচন, ছেলে ভুলান ছড়া, মেয়েলি ছড়ায় আবদ্ধ হইল। ব্যঙ্গ কবিতায় ৺রাজকৃষ্ণ রায় এবং ৺কবি হেমচন্দ্র এই ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখন কবিবর স্যর রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উচ্চাঙ্গের

কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতেছেন। * * * প্রথম প্রকার ছন্দের 'অক্ষর-মাত্রিক,' ২য় প্রকারের 'মাত্রাবৃত্ত' এবং ৩য় প্রকারের 'স্বরমাত্রিক' বা 'ছড়ার ছন্দ' নাম দেওয়া যাইতে পারে।" আজকাল অনেকে 'অক্ষরমাত্রিক' স্থলে 'অক্ষরবৃত্ত', এবং 'স্বরমাত্রিক' স্থলে 'স্বরবৃত্ত' ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু এই নামগুলি অপেক্ষা রাখালরাজ রায় মহাশয়ের দেওয়া নামগুলিই বরং সমীচীনতর; কারণ, যথার্থ 'বৃত্তছন্দ' বাংলায় নাই। সমমাত্রিক পর্ব্বের উপরই বাংলা প্রভৃতি ভাষার ছন্দ প্রতিষ্ঠিত, 'বৃত্তছন্দ' তদ্রূপ নহে। সংস্কৃত 'বৃত্তছন্দ'গুলি প্রাচীন বৈদিক ছন্দ হইতে সমুদ্ভূত এবং মাত্রাসমক ছন্দ হইতে মূলতঃ পৃথক্। 'বৃত্তছন্দ' এবং মাত্রাসমক ছন্দের rhythm বা ছন্দঃস্পন্দনের প্রকৃতি এবং আদর্শ একেবারেই বিভিন্ন। বলা বাহুল্য, বাংলা ছন্দমাত্রেই মাত্রাসমক-জাতীয়। সংস্কৃত 'অক্ষরবৃত্তে'র অনুরূপ কোন ছন্দ বাংলায় চলে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

১৩২৫ সনে 'ভারতী' পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ 'ছন্দ-সরস্বতী' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতেও এইরূপ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের প্রথম 'প্রকাশে' তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত', দ্বিতীয় 'প্রকাশে' তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত', এবং তৃতীয় 'প্রকাশে' তথাকথিত 'স্বরবৃত্তে'র কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি কেহ কেহ বাংলা ছন্দের যে আর একটি চতুর্থ বিভাগের অর্থাৎ মাত্রাসমক-স্বরসমক ছন্দের কথা তুলিয়াছেন, তাহার বিষয় 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধের পঞ্চম 'প্রকাশে' বলা হইয়াছে। পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রতি কেহ কেহ যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাহা ঐ প্রবন্ধের দ্বিতীয় 'প্রকাশে' 'ছন্দোময়ী'-র মতের অনুযায়ী। বাংলা ছন্দে যে বিদেশী সব রকম ছন্দের অনুকরণ করা যায়, এ মতটিও 'ছন্দ-সরস্বতী'-র চতুর্থ 'প্রকাশে' আছে। 'অক্ষরবৃত্ত' শব্দটিও ঐ প্রবন্ধের, এবং মধ্য যুগের লেখকেরা যে ছন্দোজ্ঞান না থাকার দরুণ সংখ্যা ভর্ত্তি করার জন্য "বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়ুং ঠুকে দিয়েছিলেন" এ মতটিও ঐ প্রবন্ধে আছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে যে, বাংলা ছন্দের তিন ধারায় বঙ্গের কাব্যসাহিত্যে "যুক্তবেণীর সৃষ্টি হয়েছে"—এই মত এবং এই উপমা উভয়ই 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে পাওয়া যায়। কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে ছন্দঃ-সম্পর্কীয় যত সূক্ষ্ম প্রশ্ন ও চিন্তার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা আর কেহ করেন নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ধরণের ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু মূলে যে একটা

ঐক্য থাকিতে পারে, তাহা একেবারে বিস্মৃত হ'ন নাই। তৃতীয় 'প্রকাশে' তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"আচ্ছা, এই অক্ষর-গোণা ছন্দ এবং syllable বা শব্দ-পাপড়ি-গোণা ছন্দ, মূলে কি একই জিনিস নয়?" ইহার স্পষ্ট উত্তর তিনি কিছু দেন নাই,—তামিল, ফার্সী বা আসামী হইতে পয়ারের উৎপত্তি হইয়াছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্থাপন মাত্র করিয়াছেন। তাঁহার মতাবলম্বীরা বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা না করিয়া একেবারেই স্বতন্ত্র তিনটি (চারিটি ?) বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন।

মতটি যাহারই হউক, ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

প্রথমতঃ, a priori কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রণালী সর্ব্বত্রই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দেখিতে পায়। বাংলা ছন্দের জগতে নানাবিধ রীতি (style) থাকিতে পারে, যেমন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জগতে গোয়ালিয়রি, জৌনপুরি ইত্যাদি নানাবিধ ঢঙ্ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ছন্দোবন্ধনের কোন একটা মূলনীতি থাকা সম্ভব নয় কি ? বাংলার ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে যদি একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে বাংলা ছন্দে থাকিবে না কেন? তিনটি বা চারিটি বা পাঁচটি স্বতন্ত্র জাতির ছন্দ একই ভাষায় একই সময়ে প্রচলিত থাকা সম্ভব কি? বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধ বলিয়া কোন জিনিস নাই কি? যদি থাকে, তবে তাহার কি কোন সহজবোধ্য মূল সূত্র পাওয়া যায় না?

ছন্দোদুষ্ট কবিতার দুর্ব্বলতা সহজেই বাঙালীর কানে ধরা দেয়। কিন্তু যদি বাস্তবিক-ই তিন চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতির ছন্দ প্রচলিত থাকিত, তবে অত শীঘ্র ও সহজে ছন্দের দোষ কানে ধরা দিত কি ? কারণ, তিনটি পদ্ধতি স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন এক কবিতার ছন্দ, একটি বিশেষ পদ্ধতি মতে শুদ্ধ হইলেও অপরাপর পদ্ধতি মতে দুষ্ট। যেমন—

আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে

এই চরণটি তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত' এবং তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে দুষ্ট, কিন্তু তথাকথিত 'স্বরবৃত্ত' রীতির হিসাবে নির্ভুল। সুতরাং কোনও কবিতার চরণ শুনিয়া তখনই তাহাতে ছন্দঃপতন হইয়াছে বলা চলিত না, তিনটি রীতির নিয়ম মিলাইয়া তবেই তাহাকে ছন্দোদুষ্ট বলা যাইত।

তাহা ছাড়া, যে ভাবে এই তিনটি রীতির বিভাগ করা হয়, তাহাতে কি putting the cart before the horse এই fallacy আসে না? কেহ কি প্রথমে কোনও কবিতার জাতি নির্ণয় করিয়া, পরে তাহার ছন্দোবিভাগ করেন, না, প্রথমে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি নির্ণয় করেন?

অনেকে বলেন যে স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রাকৃত বাংলার ছন্দ, এবং হসন্তবহুল। কিন্তু

ভূতের মতন | চেহারা যেমন | নির্বোধ অতি | ঘোর =৬+৬+৬+২
যা কিছু হারায় | গিন্নী বলেন | কেষ্টা বেটাই | চোর =৬+৬+৬+২

এখানে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার হইয়াছে, অথচ ছন্দ যে 'স্বরবৃত্ত' নহে, 'মাত্রাবৃত্ত', তাহা ছন্দোবিভাগ না করিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে?

মুক্ত বেণীর | গঙ্গা যেথায় | মুক্তি বিতরে | রঙ্গে =৬+৬+৬+৩
আমরা বাঙ্গালী | বাস করি সেই | তীর্থে—বরদ | বঙ্গে =৬+৬+৬+৩

এখানেও ছন্দ হসন্তবহুল, সুতরাং ইহাকে 'স্বরবৃত্ত' মনে করাই স্বাভাবিক। একমাত্র অসুবিধা এই যে, 'স্বরবৃত্তে' ইহার ছন্দোবিভাগ 'মিলান' যায় না, সুতরাং 'মাত্রাবৃত্ত' বলিতে হয়। কার্য্যতঃ সকলেই আগে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি-নির্ণয় করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ছন্দোবিভাগের সূত্র কি, তাহাই নির্ণীত হওয়া দরকার। জাতি-বিভাগের হিসাবে ছন্দের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হয় না। ছন্দের মাত্রা ও বিভাগ ইত্যাদি স্থির হইলে পর তাহাকে এ জাতি, সে জাতি, যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজী ছন্দের কয়েকটি নিয়ম ধরিয়া বাংলা ছন্দের আলোচনায় অগ্রসর হইলে এবং বাংলা ভাষার তথা বাঙালীর ছন্দের মূল প্রকৃতির বিষয়ে অবহিত না হইলে নানাবিধ প্রমাদে জড়িত হইতে হয়।

তাহার পর, বাস্তবিকই কি তিনটি 'বৃত্তে' মাত্রার পদ্ধতি বিভিন্ন? 'স্বরবৃত্তে' ও 'অক্ষরবৃত্তে' পার্থক্য কি? 'স্বরবৃত্তে' স্বর গুণিয়া মাত্রা ঠিক করিতে হয়। 'অক্ষরবৃত্তে' কি হরফ্ গুণিয়া ঠিক করা হয়? ছন্দের পরিচয় কানে; সুতরাং যাহা নিতান্ত দর্শনগ্রাহ্য এবং কেবলমাত্র লেখার কৌশল হইতে উৎপন্ন (অর্থাৎ হরফ্), তাহা কখনও ছন্দের ভিত্তি হইতে পারে না। নিরক্ষর লোকেও তো ছন্দঃপতন ধরিতে পারে। রোমান্ বর্ণমালায় তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দের কবিতা লিখিলে কিরূপে তাহার হিসাব হইবে? ধ্বনির দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্তে' স্বর গুনিয়াই মাত্রা ঠিক করা

হয়; কিন্তু কোন শব্দের শেষে যদি closed syllable অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর থাকে, তবে তাহাতে দুই মাত্রা ধরা হয়। কিন্তু তাহাও কি সর্ব্বত্র হয়?

'যাদঃপতিরোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে'

'তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট মূক পারাবার'

এখানে 'যাদঃ', 'রজঃ' শব্দে দুই মাত্রা, যদিও 'দঃ' 'বা' 'জঃ' যৌগিক অক্ষর (closed syllable)। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই দেখা যায় যে, 'দিক্-প্রান্ত' শব্দটি 'অক্ষরবৃত্তে' কখনও তিন মাত্রার, কখনও চার মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। 'দিক্' শব্দটিও কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার বলিয়া ধরা হয়।

তব চিত্ত গগনের | দূর দিক্-সীমা =৮+৬
বেদনার রাঙা মেঘে | পেয়েছে মহিমা =৮+৬

মনের আকাশে তার | দিক্ সীমানা বেয়ে =৮+৬
বিবাগী স্বপনপাখী | চলিয়াছে ধেয়ে। =৮+৬

'ঐ' শব্দটী কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

'মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি উঠে গভীর নিশীথে'

এ রকম পংক্তিতে 'ভৈঃ' পদান্তের যৌগিক অক্ষর হইয়াও এক মাত্রার। তাহা ছাড়া, শব্দের প্রারম্ভে কি অভ্যন্তরে যদি closed syllable বা যৌগক অক্ষর থাকে, তবে তাহাও সর্ব্বদা এক মাত্রার বলিয়া গণ্য হয় না।

ভবানী বলেন তোর | নায়ে ভরা জল।
আল্‌তা ধুইবে পদ | কোথা থুব বল॥

এখানে 'আল্' ও 'ধুই' শব্দের আদ্য স্থান অধিকার করিয়াও দুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত। সেইরূপ—

চিম্‌নি ফেটেছে দেখে | গৃহিণী সরোষ =৮+৬
ঝি বলে ঠাকরুণ মোর | নেই কোন দোষ =৮+৬

এখানে 'চিম্' দীর্ঘ। সম্প্রতি কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, 'অক্ষরবৃত্তে' সংস্কৃত

শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত closed syllable বা যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণ চলে না। কিন্তু এ মত কি ঠিক ?—

গিয়েছিনু : কাঞ্চন : পল্লী =৪+৩+৩

সর্ব্বাঙ্গ : জ্বলে' গেল | অগ্নি দিল : গায় =৮+৬

বাতাসে দুলিছে যেন | শীর্ষ সমেত =৮+৬

অথবা,

আসে অবগুণ্ঠিতা | প্রভাতের অরুণ দুকূলে =৮+১০
শৈলতটমূলে।

যুগান্তরের ব্যথা | প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে =৮+১০

এ রকম স্থলে এই মত খণ্ডিত হইতেছে। সুতরাং এই মাত্র বলা যায় যে, 'অক্ষরবৃত্তে' closed syllable কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার হয়। বাঁধা-ধরা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কোনও রীতি নাই। কিন্তু, কোন্ ক্ষেত্রে যে তথাকথিত অক্ষরবৃত্তে যৌগিক অক্ষর দীর্ঘ হইবে তাহার কোন নির্দ্দেশ কেহ দিতে পারিতেছেন না। কিন্তু পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদ অনুসারে তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়।

'স্বরবৃত্তে'-ও কি সর্ব্বদা স্বর গুণিয়া মাত্রা স্থির হয় ?

(১) গর্ গর্ গর্ | গর্জ্জে মেঘা | ঝর্ ঝর্ ঝর্ | বৃষ্টি
(২) আয়্ আয়্ সই | জল্ আনি গে | জল্ আনি গে | চল্
(৩) আই আই আই | এই বুড়ো কি | ঐ গৌরীর | বর লো
(৪) কিছু নাপিত | দাড়ি কামায় | আর্দ্ধেক তার | চুল
(৫) এক পয়সায় | কিনেছে সে | তালপাতার এক | বাঁশী
(৬) এ সংসার | রসের কুটি
গাই দাই আর | মজা লুটি
(৭) নির্ভয়ে তুই | রাখ্‌রে মাথা | কাল রাত্রির | কোলে
(৮) বসেছে আজ | রথের তলায় | স্নান যাত্রার | মেলা
(৯) আগাগোড়া | সব শুন্‌তেই | হবে
(১০) বাপ বল্‌লেন, | কঠিন হেসে, | "তোমরা মায়ে | ঝিয়ে
এক লগ্নেই | বিয়ে ক'রো | আমার মরার | পরে
(১১) এমনি করে | হায়, আমার | দিন যে কেটে | যায়

(১২) কপালে যা | লেখা আছে | তার ফল তো | হবেই হবে

(১৩) গেছে দোঁহে | ফরাকাবাদ চলে
সেইখানেতেই | ঘর পাতবে | ব'লে।

(১৪) হায় কি হ'লো | পেটের কথা | বেরিয়ে গেল | কত
ইস্তক সে | লাটু টম্‌সন্ | বেরাল ইন্দুর | যত

(১৫) বাইরে শুধু | জলের শব্দ | ঝুপ্ ঝুপ্ | ঝুপ
দস্যি ছেলে | গল্প শুনে | একেবারে | চুপ

এগুলি কোন্ বৃত্তে রচিত? 'স্বরবৃত্তে' ত? নিম্নরেখ পর্ব্বগুলিতে যে স্বর গুণিয়া মাত্রা স্থির করা হয় নাই, তাহা তো সুস্পষ্ট। কারণ ঐ পর্ব্বগুলিতে স্বরের সংখ্যা কখন তিন, কখন দুই হওয়া সত্ত্বেও সন্নিহিত চতুঃস্বর পর্ব্বের সহিত মাত্রায় সমান হইতেছে। তাহা হইলে স্বরবৃত্তেও কখন কখন closed syllable-কে দুই মাত্রা ধরা হয়, স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বলিতে হয় যে, 'স্বরবৃত্ত' ছন্দেও আবশ্যক-মত syllable-কে দীর্ঘ করিতে হয়। কিন্তু সেই আবশ্যকতার স্বরূপ কি? পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদে তাহারই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত-জাতীয় কবিতাতেও যে সর্ব্বদা 'মাত্রাবৃত্তে'র নিয়ম বজায় থাকে, তাহা নহে। হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' কবিতাটিতে বা রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' কবিতাটিতে 'মাত্রাবৃত্তে'র নিয়মগুলি প্রতিপালিত হইয়াছে কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ কবিতাগুলি সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত। বাংলায় open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ প্রায় হয় না; ঐ কবিতাগুলিতে বহু open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ হইতেছে। কিন্তু উচ্চারণ অনেক সময়ে সংস্কৃতানুগ হইলেও, ছন্দ সংস্কৃতের নহে, ছন্দ বাংলার। ইচ্ছা করিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ যে বাংলা কবিতায় চালান যায় না—ইহা বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ছন্দের মূল ধাত ও নিয়ম বজায় রাখিলে open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ স্বভাবতঃই হইতে পারে। যেমন—

স্নেহ বিহ্বল | করুণা ছল ছল | শিয়রে জাগে কার | আঁখি রে

রূঢ় দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমা-সুন্দর | চক্ষে

তথাকথিত মাত্রাবৃত্তে সমস্ত স্বরান্ত অক্ষর হ্রস্ব বলিয়া ধরার রীতি থাকিলেও এখানে 'স্নে', 'রূ' অনায়াসেই দীর্ঘ হইতেছে। ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র,

রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবির বহু রচনায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই সমস্ত সংস্কৃতগন্ধি কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ বাস্তবিক যে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম অনুসারে হয় না, বাংলা ছন্দের নিয়ম অনুসারে হয়, তাহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে। (১৬ক সূত্র দ্রষ্টব্য)

Open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ 'অক্ষরবৃত্ত', 'স্বরবৃত্ত' প্রভৃতিতেও যে হয় না, এমন নহে। যথা—

'বল্ ছিন্ন বীণে, | বল্ উচ্চৈঃস্বরে—
না—না—না— | মানবের তরে—'

'কাজি ফুল | কুড়ুতে | পেয়ে গেলুম | মালা
হাত ঝুম্‌ঝুম্ | পা ঝুম্‌ঝুম্ | সীতারামের | খেলা'

সুতরাং আসলে দেখা যাইতেছে যে, সব রকম রীতির কবিতাতেই ছন্দের আবশ্যক মত open ও closed সব রকম syllable-ই দীর্ঘ হইতে পারে। কাজে কাজেই মাত্রা-পদ্ধতির দিক্ দিয়া তিনটি 'বৃত্তে' বাংলা ছন্দের ভাগ করার কোন কারণ নাই। আজকাল অনেকে এজন্য 'অক্ষরবৃত্ত'কে 'যৌগিক' অর্থাৎ মিশ্র বলিতেছেন। কিন্তু 'স্বরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'যৌগিক' (mixed)—এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ যে কিরূপ illogical বা যুক্তির বিরুদ্ধ তাহা সহজেই প্রতীত হয়।

বাংলা কাব্য হইতে বহু শত উদাহরণ দিয়া দেখান যায় যে, প্রস্তাবিত ত্রিধা বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংলা কবিতাই ছন্দের রাজ্য হইতে বাদ পড়ে। নিম্নে বিভিন্ন যুগের লেখা হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি; কিন্তু ইহাদের কোনটিতেই কোন 'বৃত্তের' নিয়ম খাটে না।

(১) জন : জামাই | ভাগ্‌না
তিন : নয় | আপ্‌না।

(২) বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান
শিব ঠাকুরের, বিয়ে হল | তিন্ কন্তে | দান।

(৩) ডাক দিয়ে কয় | দেবীবর

নিষ্কুল | শোভাকর

ডাক্ দিয়ে কয় | শোভাকর

নির্ব্বংশ | দেবীবর।

(৪) যে রন্ধন | খেয়েছি (=খেয়্ ছি) আমি | বার বৎসর | আগে

আজ কেন | জিভে আমার | সেই রন্ধন | লাগে।

(৫) শুক বলে | আমার কৃষ্ণ | জগতের | কালো

শারী বলে | আমার রাধার | রূপে জগৎ | আলো।

(৬) কহিছেন | মুনিবর | এম্‌নি ক'রে | যেতেই কি হয়

চাই] লক্ষ কথা | সমাপন | এই কথার | উত্থাপন,

দিনক্ষণ | চাই নিরূপণ | ওই্ ছুঁড়ী তোর | বিয়ে নয়

(৭) কি বলিলে : পোড়ারমুখ | কুল করিতে : যায়

সর্ব্বাঙ্গ : জ্বলে' গেল | অগ্নি দিল : গায়।

(৮) এরা) পর্দ্দা তুলে | ঘোমটা খুলে | সেজে গুজে | সভায় যাবে

ড্যাম হিন্দু | য়ানি বোলে | বিন্দু বিন্দু | ব্র্যাণ্ডি খাবে।

(৯) কোথায় কৈ | শবী দল ? | বিদ্যাসাগর | কোথা ?

মুখুজ্যের | কারচুপিতে | মুখ হৈল | ভোঁতা।

ও যতীন্দ্র | কৃষ্ণদাস ! | একবার দেখ | চেয়ে,

বকুলতলার | পথের ধারে | কত শত | মেয়ে।

(১০) সন্ধ্যাগগনে | নিবিড় কালিমা | অরণ্যে খেলিছে নিশি
ভীত বদনা | পৃথিবী হেরিছে | ঘোর অন্ধকারে মিশি
হী হী শবদে | অটবী পূরিছে | জাগিছে প্রমথগণ
অট্টহাসেতে | বিকট ভাবেতে | পূরিছে বিটপী বন
কুট করতালি | কবন্ধ তালিছে | ডাকিনী ঢুলিছে ডালে
বিম্ব বিটপে | ব্রহ্ম পিশাচ | হাসিছে বাজায়ে গালে।

(১১) "জয় রাণা | রামসিংহের | জয়"—
মৈত্রিপতি | উর্দ্ধস্বরে | কয়
কনের বক্ষ | কেঁপে উঠে | ডরে,
দুটি চক্ষু | ছল্ ছল্ | করে,
বরযাত্রী | হাঁকে সম | স্বরে
"জয় রাণা | রামসিংহের | জয়।"

(১২) ছুটিল কেন : মহেন্দ্রের | আনন্দের : ঘোর
টুটিল কেন : উর্বশীর | মঞ্জিরের : ডোর
বৈকালে : বৈশাখী : এল | আকাশ : লুণ্ঠনে
শুক্লরাতি : ঢাক্‌ল মুখ | মেঘাব : গুণ্ঠনে

এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, এখানে বিভিন্ন 'বৃত্তে'র নিয়মের ব্যভিচারী যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইল, সেগুলি শুদ্ধ 'স্বরবৃত্ত', শুদ্ধ 'অক্ষরবৃত্ত' বা শুদ্ধ 'মাত্রাবৃত্তে'র উদাহরণ নহে। এই সমস্ত 'ব্যভিচারী' কবিতাকে তবে কি বলা হইবে? আশা করি, তাহাদিগকে ছন্দোদুষ্ট বলিতে কেহ সাহস করিবেন না—বহুকাল হইতে বাঙালীর কান ঐ সমস্ত কবিতার ছন্দে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। বাংলা ছন্দের জগতে তাহাদের কোনও একটা

স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। তবে কি প্রত্যেক 'বৃত্তে'র প্রাচীন ও আধুনিক, শুদ্ধ ও ব্যভিচারী ভেদে ছয়টি কি নয়টি, কি ততোঽধিক বিভাগ করিতে হইবে? কিন্তু বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন 'স্বরবৃত্ত' বা প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ত' বা প্রাচীন 'অক্ষরবৃত্ত'—ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট একই মাত্রা-পদ্ধতি দেখা যায় না। আবশ্যক মত হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ করাই চিরন্তন রীতি। তাহা ছাড়া, 'ব্যভিচারী স্বরবৃত্ত' ইত্যাদি সংজ্ঞা দিলে তো কোন পদ্ধতি স্থির করা হয় না, কেবল মাত্র 'স্বরবৃত্ত' ইত্যাদির প্রস্তাবিত নিয়মের ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত সতীদেহের ন্যায় বাংলা ছন্দকে বহু খণ্ডে বিভাগ করিতে হইবে, তাহাতেও সব অসুবিধার পার পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

বাংলা ছন্দের প্রস্তাবিত ত্রিধা বিভাগ সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। বাংলা ভাষার কোন যুগেই তথাকথিত তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে কবিতা রচিত হয় নাই। 'বৌদ্ধগান ও দোহা', 'শূন্যপুরাণ' ইত্যাদি রচনার সময় হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন সময়েই তিনটি পৃথক্ মাত্রা-পদ্ধতি বাংলা ছন্দে দেখা যায় না। সর্ব্বদাই Beat and Bar Theory বা পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদ অনুযায়ী রীতিতে মাত্রা নির্ণীত হইতেছে দেখা যায়। একই চরণের মধ্যে কতকটা তথাকথিত 'স্বরবৃত্তে'র, কতকটা তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্তে'র লক্ষণ নানাভাবে জড়িত হইয়া আছে দেখা যায়। যে ছন্দ বাংলা কবিতার প্রধান বাহন, যাহাতে বাংলার সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত কোন গভীর ভাবপূর্ণ কবিতায় যে ছন্দ অপরিহার্য্য, সেই ছন্দে অর্থাৎ পয়ার-জাতীয় ছন্দে প্রস্তাবিত কয়েকটি "বৃত্তের" নিয়মগুলির মিশ্রণ তো সুস্পষ্ট। যাঁহারা পূর্ব্বে ইহাকে 'অক্ষরবৃত্ত' বলিয়াছেন, তাঁহারা এই সংজ্ঞার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া এখন বলিতেছেন যে, ইহা 'যৌগিক' ছন্দ, অর্থাৎ 'স্বরবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্তে'র বর্ণসঙ্কর। কিন্তু তাঁহারা যাহাকে 'স্বরবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্ত' বলিতেছেন, তাহার বয়স অতি কম। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুকারকগণের কাব্য দেখিয়া তাঁহারা বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের 'স্বরবৃত্ত' তাঁহাদের কল্পিত নিয়ম মানিয়া চলে না, প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ত'ও তাঁহাদের নিয়ম মানে না। আধুনিক 'স্বরবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্ত' মিশাইয়া যে পয়ার-জাতীয় ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এ মত একান্ত অগ্রাহ্য। তাঁহাদের স্বকল্পিত ছন্দঃশাস্ত্র অনুসারে যদি তাঁহারা পয়ার-জাতীয় ছন্দের ব্যাখ্যা খুঁজিয়া না পান, তবে সে দোষ তাঁহাদের কল্পিত ছন্দঃশাস্ত্রের ;

বাংলা ছন্দের মূল তত্ত্বটি যে তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাত্রাপদ্ধতির দিক্ দিয়া বাংলায় যে তিনটি স্বতন্ত্র 'বৃত্ত' আছে, তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। এই division সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ,—যত রকম fallacies of division আছে, সমস্তই ইহাতে পাওয়া যায়।

আধুনিক অনেক কবিতাকেই অবশ্য যে কোন একটি 'বৃত্তে' ফেলিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু আসলে বাংলা ছন্দের পদ্ধতি এক ও অপরিবর্ত্তনীয়। পূর্ব্বোক্ত Beat and Bar Theory-তে সূত্রাকারে সেই পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। আধুনিক কবিরা সেই পদ্ধতি বজায় রাখিয়াই কোন কোন দিক্ দিয়া এক-একপ্রকার বাঁধা-ধরা রীতি বাংলা কাব্যের ছন্দে আনিতেছেন। কিন্তু সেই রীতি দেখিয়াই বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি বুঝা যায় না। আধুনিক এক একটি রীতিতে বাংলা ছন্দের কোন একটি প্রবৃত্তির চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে। আধুনিক অনেক 'স্বরমাত্রিক' ছন্দে যৌগিক অক্ষর মাত্রেরই হ্রস্বীকরণ হয়; পক্ষান্ত আধুনিক 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেরই দীর্ঘীকরণ হয়। ইচ্ছা করিলে অন্যান্য বিশিষ্ট রীতির ছন্দও কবিরা চালাইতে পারেন; যেমন, এমন এক রীতির ছন্দ চালান সম্ভব যে, তাহাতে কেবল মাত্র ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরেরই দীর্ঘীকরণ হইবে, কিন্তু যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ চলিবে না। কিন্তু বাংলা ছন্দের যে প্রবৃত্তিকেই কবিরা বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া তুলুন না কেন, মূল সূত্রগুলিকে তাঁহাদের মানিয়া চলিতেই হইবে। আধুনিক কবিরা যে সর্ব্বদাই আধুনিক 'স্বরমাত্রিক' বা আধুনিক 'মাত্রাবৃত্ত' বা 'বর্ণমাত্রিক' ছন্দে লেখেন, তাহাও নয়।

যাহা হউক, মাত্রা-পদ্ধতির দিক্ দিয়া যে বাংলা ছন্দে তিনটি স্বতন্ত্র জাতি আছে, এরূপ মনে করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই।

ছন্দের রীতি

যে তিন ধরণের কবিতার কথা আধুনিক কবিরা বলেন, তাহাদের বিশেষত্ব ও পরস্পরের সহিত পার্থক্য—লয়ে, মাত্রা গুণিবার পদ্ধতিতে নয়। ছন্দোবন্ধনের জন্য অবশ্য মাত্রার হিসাব ঠিক-ঠাক বজায় রাখা আবশ্যক, কিন্তু কোথায় কোন্ অক্ষরটি হ্রস্ব, কোন্ অক্ষরটি দীর্ঘ—এইটুকু স্থির করিতে পারিলেই ছন্দের ধাত্‌টি ঠিক জানা হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন তাল ছাড়াও রাগ-রাগিণী আছে, তেমনি ছন্দেও সংস্কৃত সাহিত্যের গৌড়ী, বৈদর্ভী প্রভৃতির প্রতিরূপ নানা রকম রীতি (style) আছে। যে তিন রকম রীতির কবিতা বাংলায় প্রচলিত, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে দিতেছি। চরণের লয়ের উপরই এক এক রকম রীতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।

[১] ধীর লয়ের ছন্দ বা তান-প্রধান ছন্দ (পয়ার-জাতীয় ছন্দ)

বাংলা কাব্যে যেটি সনাতন ও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত রীতি, তাহার নাম দিতেছি পয়ারের রীতি। এই রীতিতে যে সমস্ত কবিতা রচিত তাহাদিগকে 'পয়ার-জাতীয়' বলা যাইতে পারে :

এই ছন্দকেই 'অক্ষরমাত্রিক,' 'বর্ণমাত্রিক,' 'অক্ষরবৃত্ত' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় ; কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই রীতির কবিতার মাত্রাসংখ্যা হরফ্ বা বর্ণের সংখ্যা অনুযায়ী হইয়া থাকে। ধ্বনি-বিজ্ঞানসম্মত কোন ব্যাখ্যা খুঁজিলে বলিতে হয় যে, এই ছন্দে সাধারণতঃ প্রত্যেক syllable বা অক্ষরকে একমাত্রা ধরা হয়, কেবল কোন শব্দের শেষে হলন্ত syllable বা অক্ষর থাকিলে তাহাকে দুই মাত্রার ধরা হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই মাত্রা-পদ্ধতি যে সর্ব্বত্র বজায় থাকে, তাহা নহে। মাত্রা-পদ্ধতির দিক্ দিয়া ইহার যথার্থ স্বরূপ ধরা যায় না।

পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ। পয়ারের রীতিতে কোন কবিতা পাঠ করার

সময়ে শুদ্ধ অক্ষর-ধ্বনি ছাড়াও একটা টানা সুর আসে। **এই টানটাই পয়ারের বিশেষত্ব।** এই টানটুকুকে সংস্কৃতের 'তান' শব্দ দ্বারা অভিহিত করিতেছি (ইংরেজীতে vocal drawl)। অক্ষরের ধ্বনির সহিত এই টান বা তান মিশিয়া থাকে, কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও উঠে, এবং স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়। উপমা দিয়া বলা যায় যে, পয়ার-জাতীয় ছন্দে এক একটি ছন্দোবিভাগ যেন এক একটি তানের প্রবাহ। স্রোতের মধ্যে ছোট-বড় উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন সহজেই তাহারা স্থান করিয়া লইতে পারে, পয়ারের একটানা সুরের মধ্যে তদ্রূপ মৌলিক-স্বরান্ত বা যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর প্রভৃতি সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারে। পয়ারের এক একটি মাত্রা এই ধ্বনি-প্রবাহের এক একটি অংশ। এক একটি পূর্ণকায় হরফ্ বা বর্ণ—('ং, ঃ, ৎ' ইত্যাদিকে গণনার বাহিরে রাখা হয়) এইরূপ এক একটি অংশ মোটামুটি নির্দ্দেশ করে। সুতরাং অনেক সময়ে হরফ্ গুণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয়া যায়। এই হিসাবে এ ছন্দকে 'বর্ণমাত্রিক' বলা হইয়া থাকে, যদিও এ নামটিতে এই ছন্দের মূল কথাটি নির্দ্দেশ করা হয় না। কেবল মাত্র অক্ষরধ্বনি দিয়াই পয়ারের এক একটি মাত্রা পূর্ণ হয় না, এই জন্য শুদ্ধ ধ্বনি-হিসাবে যে সমস্ত অক্ষর সমান নয়, তাহারাও পয়ারে সমান হইতে পারে। বিদেশীর কানে এই বিশেষ লক্ষণটি সহজেই ধরা পড়ে, এই জন্য তাঁহারা বাঙালীর আবৃত্তিকে sing-song গোছের অর্থাৎ সুর করিয়া পাঠ করার মতন বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক, গানে যেমন সুর আছে, বাঙালীর এই সুপ্রচলিত ছন্দে তেমনি একটা টান বা তান আছে। এই টানটিকে বাদ দিলে পয়ার-জাতীয় কবিতা পড়া-ই অসম্ভব হইবে। এই লক্ষণটি কেবল যে প্রাচীন পয়ারে পাওয়া যায়, তাহা নহে; আধুনিক-কালে লিখিত পয়ার-জাতীয় কবিতা মাত্রেই ইহা আছে। অন্যত্র বলিয়াছি যে, "ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া দুই একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে"। পয়ার-জাতীয় রচনায় অক্ষরের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া মূল স্বরের ঝঙ্কারকেই অবলম্বন করিয়া ছন্দ গড়িয়া উঠে। মূল স্বরের ধ্বনিই এ ছন্দে প্রধান, ব্যঞ্জনাদি অপরাপর বর্ণকে মূল স্বরের অধীন এবং মাত্র ইহার আকার-সাধক বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং ছন্দো-বন্ধনের হিসাবে ব্যঞ্জনাদি গৌণধ্বনির এখানে মূল্য দেওয়া হয় না। অক্ষরের স্বরাংশকে প্রাধান্য দিয়া যে পয়ার-জাতীয় ছন্দে একটানা একটা ধ্বনিপ্রবাহ সৃষ্টি করা হয়, এবং এই ধ্বনিপ্রবাহের এক একটি অংশে যে কোন প্রকারের

অক্ষরের স্থান সঙ্কুলান করা যায়, তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। নিম্নোক্ত যে কোন কবিতাতেই ইহা লক্ষিত হইবে।

(১) মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

(২) বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,
বিমর্ষ নিস্তব্ধ ভাব চিন্তিত ব্যাকুল॥

(৩) জয় ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্
জয় জয় ভবপতি।
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ—
তোমাতেই থাকে মতি।

(৪) হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
তা' সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি'
পরধন-লোভে মত্ত করিণু ভ্রমণ।

(৫) এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।

শুদ্ধ অক্ষরধ্বনিকে প্রাধান্য না দিয়া, তাহাকে সুরের টানের অধীন রাখা হয় বলিয়া পয়ার-জাতীয় ছন্দে যতগুলি অক্ষর এক পর্ব্বে সমাবেশ করা যায়, অন্য রীতিতে লেখা কবিতায় ততগুলি করা যায় না। আট মাত্রা, দশ মাত্রার পর্ব্ব এই পয়ার-জাতীয় ছন্দেই দেখা যায়।

অন্যান্য রীতিতে লেখা কবিতা হইতে পয়ার-জাতীয় ছন্দের পার্থক্য বুঝিতে হইলে এইরূপ টানা সুরের প্রবাহ আছে কিনা, অক্ষরকে অতিক্রম করিয়া ধ্বনিপ্রবাহ চলিতেছে কিনা, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। কেবল-মাত্র মাত্রার হিসাব হইতে কবিতার রীতি অনেক সময়ে বুঝা যাইবে না।

পয়ার-জাতীয় ছন্দের আর একটি নিয়মের (অর্থাৎ কোন শব্দের শেষের হলন্ত অক্ষরকে দুই মাত্রা ধরার) হেতু বুঝিতে হইলে, পয়ারের আর একটি লক্ষণ বুঝিতে হইবে। 'বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা বাংলা উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তি। পয়ার-জাতীয় কবিতায় এই প্রবৃত্তির চরম অভিব্যক্তি দেখা যায়। ঐ প্রবন্ধে যে বলিয়াছি, "বাংলা ছন্দের এক একটি

পর্ব্বকে কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মনে না করিয়া, কয়েকটি শব্দের সমষ্টি বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে," তাহা পয়ার-জাতীয় ছন্দের পক্ষেই বিশেষরূপে খাটে। বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক শব্দের প্রথমে স্বরের গাম্ভীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, শব্দের শেষে সর্ব্বাপেক্ষা কম। কিন্তু হলন্ত অক্ষরকে এক মাত্রার ধরিয়া উচ্চারণ করিতে গেলে উচ্চারণ কিছু দ্রুত হওয়া দরকার; সুতরাং বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ক্ষিপ্রতর ও অবলীল হওয়া দরকার। কিন্তু যেখানে স্বর-গাম্ভীর্য্য কমিয়া আসিতেছে, সেখানে এবংবিধ ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়; সুতরাং শব্দের অন্তিম হলন্ত অক্ষরকে একমাত্রার ধরিয়া পড়িতে গেলে শব্দের শেষে স্বর-গাম্ভীর্য্যের বৃদ্ধি হওয়া দরকার। কিন্তু সেরূপ করা স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের বিরোধী; সুতরাং পয়ার-জাতীয় ছন্দে শব্দের অন্তিম হলন্ত অক্ষরকে একমাত্রার না ধরিয়া দুইমাত্রার ধরা হয়। বিশেষতঃ যেখানে স্বর-গাম্ভীর্য্যের হ্রাস হইতেছে, সে ক্ষেত্রে গতি স্বভাবতঃই একটু মন্থর হইয়া থাকে। এই কারণেও শব্দের অন্তিম হলন্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। অর্থাৎ, পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ বলিয়া **এখানে স্বভাবমাত্রিক অক্ষরই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।**

পয়ার-জাতীয় ছন্দের ব্যবহারই বাংলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ সাধারণ কথাবার্ত্তায় এবং গদ্যে আমরা যে রীতির অনুসরণ করি, সেই রীতি ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বজায় থাকে। কয়েক লাইন গদ্য বা নাটকীয় ভাষা লইয়া তাহার মাত্রা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, পয়ারের ও গদ্যের মাত্রানির্ণয় একই রীতি অনুসারে হইতেছে। উদাহরণ-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে রামায়ণী কথা' ও 'হাস্যকৌতুক' হইতে উদ্ধৃত অংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কারণে নাট্যকাব্যে, মহাকাব্যে, চিন্তাগর্ভ কাব্যে এই রীতির ব্যবহার দেখা যায়।

পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহার অপর কয়েকটি বিশেষ গুণের তাৎপর্য্য পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ পয়ারের আশ্চর্য্য 'শোষণ-শক্তি'-র কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ পয়ারের (৮+৬=) ১৪ মাত্রা বজায় রাখিয়াই যুক্তাক্ষরহীন পয়ারকে যুক্তাক্ষর-বহুল পয়ারে পরিবর্ত্তিত করা যায়। ইহার হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পয়ারের একটানা তান বা ধ্বনি-স্রোতের এক একটি অংশের মধ্যে লঘু, গুরু—সব রকম অক্ষরই সহজে ডুবিয়া যায় বলিয়া এইরূপ হওয়া সম্ভব। বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকে. সেই ফাঁকটা সাধারণতঃ সুরের টান দিয়া ভরান থাকে।

সুতরাং লঘু অক্ষরের স্থানে গুরু অক্ষর বসাইলে ছন্দের হানি হয় না। এই জন্য তৎসম, অর্দ্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, সব রকমের শব্দ সহজেই পয়ারে স্থান পাইতে পারে।

কিন্তু পয়ার-জাতীয় ছন্দে অক্ষর-যোজনার একটা সীমা আছে। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন যে, 'দুর্দ্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' এইরূপ চরণেই যেন পয়ারের ধ্বনির স্থিতিস্থাপকতার চরম সীমা রক্ষিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে (১৮শ সূত্রে) এই সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—পর্ব্বাঙ্গের শেষ অক্ষরটি লঘু হওয়া আবশ্যক। 'বৈদান্তিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' বলিলে, তাহা আর কিছুতেই ১৪ মাত্রার বলিয়া ধরা চলিবে না, কারণ 'তিক্' অক্ষরটিকে পয়ারে দীর্ঘ ধরিতেই হইবে।

পয়ারের লয় ধীর বলিয়া পয়ারের ছন্দে কখন নৃত্যচপল বা ক্ষিপ্র গতি, কিংবা গা-ঢালা আরাম বা বিলাসের ভাব আসে না—পরন্তু স্বভাবতঃই একটা অবহিত, সংযত সুতরাং গম্ভীর ভাব আসে। এই জন্য উচ্চাঙ্গের কবিতা পয়ার-জাতীয় ছন্দেই রচিত হইয়া থাকে। অন্যত্র বলিয়াছি যে, এই ছন্দে যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ-কৌশলে সংস্কৃত 'বৃত্ত' ছন্দের অনুরূপ একটা মন্থর, গম্ভীর, উদার ভাব আসিতে পারে। 'কারণ এই ছন্দে পদ-মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না এবং তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না। সুতরাং এখানে ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত আছে। সুতরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার-কৌশলে একটা ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।' সুতরাং যে rhythmic harmony 'বৃত্ত' ছন্দের প্রাণ, তাহা অন্ততঃ মাত্রা-সমকত্বের অতিরিক্ত অলঙ্কাররূপেও পয়ার ছন্দে পাওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কৃতী। রবীন্দ্রনাথের 'তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্ম্মরিত পল্লব বীজনে' প্রভৃতি চরণেও এইরূপ ভাব পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে পয়ার-জাতীয় ছন্দের সুর উঁচু করিয়া বাঁধা যায়। বাংলা ছন্দে পয়ারই ধ্রুপদ-জাতীয়।

রবীন্দ্রনাথ এই রীতির ছন্দকে সাধু ভাষার ছন্দ বলেন, কারণ এ ছন্দে যুক্তাক্ষরবহুল সাধু ভাষার শব্দ-প্রয়োগের সুবিধা বেশী। কিন্তু সাধু ভাষা হইলেই যে এই রীতির ছন্দ হইবে তাহা নয়। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষা এবং বহু তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ঐ কবিতাটি এই রীতিতে রচিত নয়।

পয়ারের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। রবীন্দ্রনাথ

দেখাইয়াছেন যে, পয়ারে দুই বা দুইয়ের গুণিতক যে কোন সংখ্যক মাত্রার পরে ছেদ বসান যায়। কিন্তু পয়ার-জাতীয় ছন্দে তিন মাত্রার পরেও ছেদ বসান চলে। যথা,—

বিশেষণে সবিশেষ | কহিবারে পারি।
জান তো * স্বামীর নাম | নাহি লয় নারী ॥

এখানে অন্বয় অনুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথম তিন অক্ষরের পর একটি উপচ্ছেদ বসান চলে। অমিত্রাক্ষরে ইহার উদাহরণ যথেষ্ট ; যথা—

নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা ॥
রে দূত ! * * অমর-বৃন্দ | যার ভুজবলে ॥
কাতর, * সে ধনুর্দ্ধরে | রাঘব ভিখারী ॥ (মধুসূদন)

কি স্বপ্নে কাটালে তুমি | দীর্ঘ দিবানিশি
অহল্যা, * পাষাণরূপে | ধরাতলে মিশি (রবীন্দ্রনাথ)

আসলে, রবীন্দ্রনাথ পয়ার-জাতীয় ছন্দের একটি ধর্ম্মের বিশেষ একটি প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন। পয়ার-জাতীয় ছন্দে যে কোন পর্ব্বাঙ্গের পরেই ছেদ বসান যায় ; কেবল উপচ্ছেদ নহে, পূর্ণচ্ছেদ পর্য্যন্ত বসান চলে। পয়ার ছন্দে শব্দের মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখা যায় বলিয়াই এইরূপ করা চলে। এ ছন্দে ছেদ যতির অধীনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে। এই কারণে যথার্থ blank verse বা অমিতাক্ষর কাব্য মাত্র পয়ার-জাতীয় ছন্দেই রচিত হইতে পারে।

পয়ার-জাতীয় ছন্দের বিরুদ্ধে কেহ কেহ যে সমস্ত 'নালিশ' আনিয়াছেন, সেগুলি একান্ত ভিত্তিহীন। ইহাতে যে 'বাংলা ভাষার যথার্থ রূপটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে' এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত-সিদ্ধান্ত-প্রণোদিত ; বরং সাধারণ উচ্চারণ-রীতি এই ছন্দেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বজায় আছে। যদি কেহ ইহাকে 'একঘেয়ে' বলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তিনি 'মেঘনাদবধ-কাব্য' অথবা রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' অথবা 'দেবতার গ্রাস' প্রভৃতি কবিতা বিশ্লেষ বা বিচার করেন নাই। যিনি ইহাকে 'নিস্তরঙ্গ' বলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ,' 'সিন্ধুতরঙ্গ' প্রভৃতি কবিতার প্রতি সুবিচার করেন নাই। পয়ার-জাতীয় ছন্দ যে লিপিকরদিগের চাতুরী হইতে উৎপন্ন, অথবা ইহাতে যে ধ্বনিশাস্ত্রকে ফাঁকি দেওয়া হয়, এ কথা বলিলে মাত্র বাংলা ছন্দের ইতিহাস ও প্রকৃতি

সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বোধের অভাব প্রকাশ করা হয়। পয়ার-জাতীয় ছন্দে 'যতি অনিয়মিত এবং পর্ব্ববিভাগ অস্পষ্ট', এরূপ অভিযোগ অভিযোক্তার ছন্দোবোধের গভীরতা বা সূক্ষ্মতা-সম্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন করে। পয়ার-জাতীয় ছন্দ মিশ্র বা যৌগিক ছন্দ নহে। ইহাই বাংলার সনাতন ছন্দ, এবং বাংলার স্বাভাবিক মাত্রা-পদ্ধতি ইহাতেই রক্ষিত হয়।

পূর্ব্বকালে যে সমস্ত ছন্দোবদ্ধ কাব্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলি সমস্তই পয়ার-জাতীয়। শুধু পয়ার নহে, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি সমস্তই তান-প্রধান বা পয়ার-জাতীয় ছন্দে রচিত হইত।

প্রাচীনকালের পয়ারাদি ছন্দে সর্ব্বদাই অক্ষর গণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয় যাইবে না। আবশ্যক মত হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। যথা।—

বাক্য চাতুরী করি | দিবাতে মাগিয়া
সন্ধ্যাকালে যাও ভাল | গৃহস্থ দেখিয়া
(বংশীবদন, মনসা-মঙ্গল)

গ্রাম রত্ন ফুলিয়া | জগতে বাখানি
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে | গঙ্গা তরঙ্গিণী
(কৃত্তিবাস, আত্মপরিচয়)

পিককুল কলকল | চঞ্চল অলিদল, | উছলে সুরব জল | চল লো বনে
(মধুসূদন)

আধুনিক কালেও পয়ার-জাতীয় ছন্দে সর্ব্বদা অক্ষর গণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয়া যায় না। 'বাংলা ছন্দে জাতিভেদ' অধ্যায়ে তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

[২] বিলম্বিত লয়ের ছন্দ বা ধ্বনি-প্রধান ছন্দ
(আধুনিক মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দ)

আর এক রীতির কবিতাকে 'মাত্রাবৃত্ত' নাম দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এই নামটি খুব সুষ্ঠু বলা যায় না। কারণ, বাংলা তথা উত্তর-ভারতীয় সমস্ত

প্রাকৃত ভাষাতেই সমমাত্রিক পর্ব্ব লইয়া ছন্দ রচিত হয়। সংস্কৃতে 'মাত্রাবৃত্ত' যে অর্থে প্রচলিত, সেই অর্থে সমস্ত বাংলা ছন্দ-ই মাত্রাবৃত্ত বলা যাইতে পারে।

কেবল-মাত্র মাত্রাপদ্ধতির খোঁজ করিলে অন্যান্য রীতির কবিতার সহিত এই রীতির কবিতার পার্থক্য বুঝা যাইবে না। আধুনিক সময়ে কবিরা মোটামুটি একটি স্থির পদ্ধতি অনুসারে এই ধরণের কবিতায় মাত্রা-যোজনা করেন, অর্থাৎ যৌগিক অক্ষরমাত্রকেই দীর্ঘ ধরেন এবং অপর সব অক্ষরকে হ্রস্ব ধরেন। তবে সর্ব্বদাই যে তাঁহারা অবিকল এই নিয়ম অনুসরণ করেন, তাহা নহে; মৌলিক স্বরের দীর্ঘীকরণের উদাহরণও যে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে কিন্তু অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থির পদ্ধতি ছিল না। পদাবলী-সাহিত্যে তাহাই দেখা যায়। নিম্নোক্ত উদাহরণ হইতেই ইহা বুঝা যাইবে —

চম্পক দাম হেরি | চিত অতি কম্পিত | লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তর | জাগয়ে নিরন্তর | ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥

এখানে হ্রস্ব বা দীর্ঘ বলিয়া অক্ষরের দুই বিভিন্ন জাতি স্বীকার করা হয় নাই; অথচ ইহা খাঁটি 'মাত্রাবৃত্ত' রীতির উদাহরণ। অতি প্রাচীন কালের মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাতে—যেমন 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'য়—এই লক্ষণ দেখা যায়;—

ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গঢ়ই
পারগামি লোঅ | নিভর তরই

বস্তুতঃ বাংলা প্রভৃতি ভাষাতে কবিতায় কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অক্ষরের মাত্রা স্থির থাকে না। অর্ব্বাচীন প্রাকৃত হইতে প্রাচীন বাংলা প্রভৃতির পার্থক্যের এই অন্যতম লক্ষণ।

সুতরাং তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ ও পয়ার-জাতীয় ছন্দের তুলনা করিলে মাত্রাপদ্ধতির দিক্ দিয়া খুব বেশী পার্থক্য দেখা যাইবে না। ছন্দের আবশ্যক মত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ উভয়-জাতীয় ছন্দেই চলে, তবে 'মাত্রাবৃত্ত'-জাতীয় ছন্দে দীর্ঘীকরণ অপেক্ষাকৃত বহুল।

তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দের মূল লক্ষণটি এই যে ইহা বিলম্বিত লয়ের ছন্দ। সুতরাং এই ছন্দে যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে।

এমন কি, প্রয়োজন মত মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষরেরও যদৃচ্ছ দীর্ঘীকরণ চলিতে পারে। (সূ: ৩১ দ্র:)

পয়ার-জাতীয় ছন্দের সহিত এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অন্যতম পার্থক্য এই যে, **'মাত্রাবৃত্তে' উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমাণই প্রধান।** পয়ারে অক্ষর-ধ্বনির অতিরিক্ত যে একটা সুরের টান থাকে, 'মাত্রাবৃত্তে' তাহা থাকে না। সুতরাং পয়ারের ন্যায় 'মাত্রাবৃত্তে'র স্থিতি-স্থাপকতা গুণ নাই, শোষণ-শক্তিও নাই। যদি দেখা যায় যে, কোন একটি কবিতার চরণ কি রীতিতে লিখিত তাহা মাত্রার হিসাব হইতে বুঝিবার উপায় নাই, তখন এই সুরের টান আছে কি না আছে তাহা দেখিয়া রীতি স্থির করিতে হয়।

যত পায় বেত | না পায় বেতন | তবু না চেতন মানে

এবং

বসি' তরু 'পরে | কলরব করে, | মরি মরি, আহা মরি

এই উভয় চরণেই মাত্রার হিসাব এক। কিন্তু প্রথমটি যে 'মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে এবং দ্বিতীয়টি যে পয়ারের রীতিতে রচিত, তাহা ঐ সুরের টান আছে কি না আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়।

'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে স্বরবর্ণের ধ্বনির প্রাধান্য দেখা যায় না। প্রত্যেক স্পষ্টোচ্চারিত ধ্বনিরই ইহাতে হিসাব রাখিতে হয়। এই জন্য যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণের দিকে ইহার প্রবৃত্তি আছে। (এই দীর্ঘীকরণ কি ভাবে হয়, তাহা "বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব" শীর্ষক অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।) যৌগিক অক্ষরকে অন্যান্য অক্ষরের সহিত সমান হ্রস্ব ধরিয়া পড়িতে গেলে, একটু অধিক জোরের সহিত দ্রুত লয়ে উচ্চারণ করা দরকার হইয়া পড়ে। কিন্তু 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ দ্রুত লয়ের একান্ত বিরোধী। বস্তুতঃ 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে আরামপ্রিয়তার ও আয়াসবিমুখতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই জন্য এই ছন্দে বর্ণসংঘাত ও হ্রস্বীকরণ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া চলিতে হয়, কোন যৌগিক অক্ষর থাকিলেই তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দুই মাত্রা পূরাইয়া দেওয়া হয়। এই ধরণের ছন্দে যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্‌যন্ত্রকে একটুখানি আরাম দেওয়া হয়। এবং সেই অক্ষরটির উচ্চারণের পর খানিকক্ষণ শেষ ধ্বনির ঝঙ্কারটিকে টানিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই দুই মাত্রার অক্ষর বলিয়া পরিগণিত হয়।

'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে শ্বাসবায়ুর পরিমাণের খুব সূক্ষ্ম হিসাব রাখিতে হয়। কতটুকু শ্বাসবায়ুর খরচ হইল, ধ্বনি-উৎপাদক কয়েকটি বাগ্‌যন্ত্রে কতটুকু আয়াস হইল—সমস্তই ইহাতে বিবেচনা করিতে হয়। তাহা ছাড়া, গা ছাড়িয়া দিয়া বিলম্বিত লয়ে উচ্চারণ করাই এই ছন্দের প্রকৃতি। সুতরাং এই ছন্দ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ছন্দ। বেশী মাত্রার পর্ব্ব এ ছন্দে ব্যবহার করা যায় না। ইহার শক্তি ও উপযোগিতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই ছন্দে দীর্ঘীকরণের বাহুল্য আছে বলিয়া হ্রস্ব ও দীর্ঘের সমাবেশে ইহাতে বিচিত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু তাহাতে যে ধ্বনি-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা যে ঠিক ইংরেজী বা সংস্কৃতের অনুরূপ ছন্দঃস্পন্দন নহে, তাহা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। তবে বিদেশী ছন্দের অনুকরণ করিতে গেলে আমাদের 'মাত্রাবৃত্ত' ভিন্ন উপায় নাই, কারণ অক্ষর-পরম্পরার মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি, তাহার কতকটা অনুকরণ এক মাত্রাবৃত্তেই সম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল্ ইস্‌লাম প্রভৃতি কবিরা তাহাই করিয়াছেন। ছড়ার ছন্দে অর্থাৎ স্বরাঘাত-প্রবল ছন্দে অবশ্য গুণগত পার্থক্য খুব স্পষ্ট ; কিন্তু তাহাতে মাত্র একটার বেশী pattern বা ছাঁচ নাই, সুতরাং তাহাতে বিদেশী ভাষার বিচিত্র ছাঁচের ছন্দের অনুকরণ করা চলে না।

পয়ারের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয়, 'মাত্রাবৃত্ত' মেয়েলি ছন্দ, পয়ার যেন পুরুষালি ছন্দ। যেটুকু কাজ মাত্রাবৃত্তের দ্বারা পাওয়া যায়, সেটুকু বেশ সুন্দর হয় ; কিন্তু 'ইস্তক্ জুতা-সেলাই নাগাদ্ চণ্ডীপাঠ' ইহাতে চলে না। পয়ারে কিন্তু 'পাখী সব করে রব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখা'র নির্ঘোষ, এমন কি 'চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন' পর্য্যন্ত প্রকাশ করা যায়।

[৩] দ্রুত লয়ের ছন্দ বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ (বল-প্রধান ছন্দ)

আর এক রীতির ছন্দকে 'ছড়ার ছন্দ,' কখন কখন বা 'স্বরবৃত্ত'-ও বলা হয়। এ ধরণের ছন্দ পূর্ব্বে গ্রাম্য ছড়াতেই ব্যবহৃত হইত, এ জন্য ইহাকে ছড়ার ছন্দ বলা হয়। আজকাল সাধু ভাষাতেও এ ছন্দ চলিতেছে। সাধারণতঃ এ রকম ছন্দে প্রত্যেক syllable বা অক্ষর একমাত্রার বলিয়া গণ্য করা হয়, অর্থাৎ শুধু কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহার হইয়াছে তাহা গণনা করিলেই অনেক সময়ে মাত্রার হিসাব পাওয়া যায়। এ জন্য কেহ কেহ ইহাকে স্বরমাত্রিক বা স্বরবৃত্ত বলেন।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মাত্রা গুণিবার পদ্ধতি হইতেই এই রীতির ছন্দের আসল স্বরূপটি বোঝা যায় না। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, এ রকম ছন্দেও মধ্যে মধ্যে কোন অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। তা-ছাড়া, পয়ার-জাতীয় ছন্দেও তো স্বরধ্বনির প্রাধান্য আছে, এবং কেবল শব্দের শেষ অক্ষর ভিন্ন অন্য অক্ষর সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং, স্থানে স্থানে মাত্রাগণনার বিশেষ আছে —ইহাই কি পয়ারের সহিত এই ছন্দের পার্থক্য? তাহা হইলে পয়ার কি স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি ব্যভিচারী বা অনৈসর্গিক রূপ? কিন্তু পয়ারের ও স্বরমাত্রিকের রীতি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা তো শোনামাত্র বোঝা যায়।

ঐ দেখো গো | বর্ষা এলো | দৈববাণী | নিয়ে

এই-রকম কোন চরণের মাত্রার হিসাব পয়ার এবং স্বরমাত্রিক ছন্দ এই উভয়ের রীতি অনুসারেই এক। কিরূপে তবে ইহার প্রকৃতি বুঝা যাইবে?

এই জাতীয় ছন্দের লয় দ্রুত। **প্রায় প্রত্যেক পর্ব্বেই অন্ততঃ একটি প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে।** সেই শ্বাসাঘাতের প্রভাবেই এই ছন্দের বিশেষ লক্ষণগুলি উৎপন্ন হয়। এই জন্য ইহাকে 'শ্বাসাঘাত-প্রবল' বা 'শ্বাসাঘাত-প্রধান' ছন্দ বলাই সঙ্গত। শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের একটা সচেষ্ট প্রয়াস আবশ্যক; এবং সুনিয়মিত সময়ান্তরে তাহার পুনঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই কারণে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের বৈচিত্র্য খুব কম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই ছন্দে কেবল এক ধরণের পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়; প্রতি পর্ব্বে চার মাত্রা ও দুইটি পর্ব্বাঙ্গ থাকে। সাধারণতঃ এই ধরণের ছন্দে প্রতি চরণে চারিটি পর্ব্ব থাকে, তাহাদের মধ্যে শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণ থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের

আকাশ জুড়ে | চল্ নেমেছে | সূয্যি ঢলে | ছে
চাঁচর চুলে | জলের গুঁড়ি | মুক্তো ফলে | ছে

এই ছন্দের সুন্দর উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ দুই, তিন, চার, পাঁচ পর্ব্বের চরণও এই ছন্দে রচনা করিয়াছেন। 'পলাতকা'য় এইরূপ নানা দৈর্ঘ্যের চরণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্বাসাঘাত থাকার দরুণ যৌগিক অক্ষর হ্রস্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্বাসাঘাতের দরুণ বাগ্‌যন্ত্রের অঙ্গগুলির প্রবল আন্দোলন, এবং বোধ হয়, সঙ্কোচন

হয় ; তজ্জন্য উচ্চারণের ক্ষিপ্রতা এবং লঘুতা অবশ্যম্ভাবী। এই লঘুতাকে লক্ষ্য করিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

আল্‌গোছে যা' | গায় লাগে তা' | গুণ্‌ছে বল | কে ?

কিন্তু শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ-ও বাংলা মাত্রা-পদ্ধতির সাধারণ নিয়মের অধীন। সুতরাং এ ছন্দে-ও মাঝে মাঝে দীর্ঘীকরণ চলে। উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

যৌগিক অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত না পড়িলে ইহার প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয় না। এই জন্য এই ছন্দে মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়িলে তাহাতেও একটু ঝোঁক দিয়া যৌগিক অক্ষরের ন্যায় পড়িতে হয়। যেমন—

ধিন্‌তা ধিনা | পাকা-া নোনা

কালো-ে া ঃ তা সে | যতোই কালো | হোক্‌

দেখে-ে-ছি তার | কালো-ে া হরিণ | চোখ

শ্বাসাঘাত-যুক্ত অক্ষরের পরবর্ত্তী অক্ষরটি সেই পর্ব্বাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলে লঘু হওয়া দরকার। শ্বাসাঘাতের প্রয়াসের পর বাগ্‌যন্ত্র একটু আরামের আবশ্যকতা বোধ করে, পুনশ্চ হ্রস্বীকরণের প্রয়াস করিতে চাহে না।

শ্বাসাঘাত-যুক্ত ছন্দের ছাঁচ বাঁধা থাকে বলিয়া এই ছন্দে একটি মূল শব্দ ভাঙিয়া দুইটী পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে দেওয়া চলে। পয়ারের মত এ ছন্দে অতিরিক্ত কোন ধ্বনি-প্রবাহ থাকে না, অক্ষরের গায়ে অক্ষর লাগিয়া থাকে। প্রবল স্বরাঘাত-যুক্ত একটি যৌগিক অক্ষর এবং তাহার প্রতিক্রিয়াশীল একটি হ্রস্ব অক্ষর—এইভাবে প্রথম একটি পর্ব্বাঙ্গ গঠিত হয়; দ্বিতীয় পর্ব্বাঙ্গে ইহারই একটা মৃদুতর অনুকরণ থাকে। এইভাবে অক্ষর-বিন্যাস হয় বলিয়া এক রকম 'চোখ কান বুজিয়া' এই ছন্দের আবৃত্তি করা যায়।

এই ছন্দে মাত্রার হিসাবের জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি নূতন রকমের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, চারটি হ্রস্ব অক্ষর দিয়া এই ছন্দে একটি পর্ব্ব গঠিত হইলে, প্রথম পর্ব্বাঙ্গের একটি অক্ষরের উপর ঝোঁক দিয়া তাহাকে যৌগিক অক্ষরের মতন করিয়া পড়া হয়। সুতরাং তাঁহার ধারণা হয় যে, এই ছন্দে প্রতি পর্ব্বে মাত্রা-সংখ্যা ৪ নহে, ৪½। শ্রুতবোধের 'একমাত্রো ভবেদ্‌হ্রস্বো...ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্‌' এই সূত্রের অনুসরণ করিয়া তিনি প্রস্তাব করেন যে, যৌগিক অক্ষরকে ১½ মাত্রা এবং অন্যান্য অক্ষরকে

১ মাত্রা ধরা উচিত। ইহাতে অবশ্য অনেক জায়গায় মাত্রা-সমকত্বের হিসাব পাওয়া যায় ; যেমন—

১½ + ১½ + ১½	১½ + ১ + ১ + ১	১½ + ১ + ১ + ১	
আয় আয় সই	জল আনি গে	জল আনি গে	চল
১ + ১½ + ১ + ১	১½ + ১ + ১ + ১	১½ + ১ + ১ + ১	
আকাশ জুড়ে	চল্ নেমেছে	সুযি চলে	ছে

এসব স্থলে প্রত্যেক সম্পূর্ণ পর্ব্বের ৪½ মাত্রা হইতেছে। কিন্তু আবার বহু স্থলে এই হিসাব অনুসারে মাত্রাসমকত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না ; যেমন—

১½ + ১ + ১ + ১½	১ + ১½ + ১ + ১	১½ + ১ + ১ + ১½	
সুপ্ত বীজের	গোপন কথা	অঙ্কুরে আজ	ছায়
১½ + ১ + ১ + ১½	১½ + ১ + ১ + ১½	১ + ১½ + ১ + ১	
কামধেনু আর	কল্প লতার	ভুল (-২) নাতে	ভুলবো না
১½ + ১ + ১½ + ১½	১ + ১½ + ১ + ১½	১½ + ১ + ১ + ১	
তাল পাতার ঐ	পুঁথির ভিতর	ধর্ম্ম আছে	বল্লে কে

(অথবা, তাল্ পাতারে = ১½ + ১ + ১ + ১½ = ৫)

এসব স্থলে দেখা যাইতেছে যে, সমমাত্রিক পর্ব্বপরম্পরার এই হিসাবে কাহারও মাত্রা ৫½, কাহারও ৫, কাহার ৪½ হইতেছে। সুতরাং কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় না। তিনিও শেষ পর্য্যন্ত তাহা বুঝিয়া এই হিসাব বাদ দিয়াছিলেন, এবং সমসংখ্যক হ্রস্ব ও সমসংখ্যক যৌগিক অক্ষর দিয়া পর্ব্ব রচনা করিয়া হিসাবের গোলমাল এড়াইয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধতি যে গ্রহণ-যোগ্য নয়, তাহা অন্যভাবেও বোঝা যায়। শ্বাসাঘাত-ই যে এ ধরণের ছন্দে প্রধান তথ্য, তাহা তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই। শ্বাসাঘাতের উপরেই এই ছন্দের সমস্ত লক্ষণ নির্ভর করে। বাংলায় মাত্রা-পদ্ধতি বাঁধা-ধরা বা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নহে ; প্রত্যেক ক্ষেত্রে শব্দ-সংস্থান, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি অনুসারে মাত্রা নির্ণীত হয়। কাজে কাজেই ওরূপ কোন বাঁধা নিয়মে মাত্রার হিসাব করা চলিতে পারে না।

শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃতে দেখা যায় না। বঙ্গের সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের ভাষাতেও ইহা বড় একটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বিহারের গ্রাম্য ছড়া ও নৃত্যের তালে এই ছন্দ দেখা যায়। হোলির দিনে বিহার-অঞ্চলের অশিক্ষিত লোকে

"ছ্যা´´ র‍্যা : র‍্যা´-র‍্যা । ছ্যা´´-র‍্যা : র‍্যা´-র‍্যা । ছ্যা´´-র‍্যা : র‍্যা´-র‍্যা । র‍্যা´´—"

এই সঙ্কেতের তালে নৃত্য করে। এই সঙ্কেত আর বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের সঙ্কেত একই। কলিকাতার রাস্তায় পশ্চিমা (বিহারী) ফেরিওয়ালারা এই সঙ্কেতের অনুসরণ করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক জিনিষ বিক্রয় করে—

"লেজ্´´-জা : বা-বু | দোদ্´´ দো : পয়্´-সা ‖ লেহ্´´-জা : বা-বু | দোদ্´´-দো : পয়্´-সা ‖"

ছন্দে এই রীতি বোধ হয় বাঙালীর পূর্ব্বপুরুষের-ও নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, কারণ বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের সাহিত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। বাংলা ভাষার একটি লক্ষণ—অর্থাৎ দীর্ঘস্বর-বিমুখতা—এই রীতির ছন্দেরও বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার আদিম ইতিহাস নির্ণয় করা কঠিন, তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, আজও মাদল প্রভৃতি সাঁওতালি বাদ্যে এই ছন্দের সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়, যেমন—

"দ্রি-পির : দ্রিপাং | দ্রি-পির : দ্রি-পাং | দ্রি-পির্ : দ্রি-পাং | তাং"
"তু-তুর : তুয়া | তু-তুর্ : তুয়া | তু-তুর : তুয়া | তু"

বাংলার ঢোল ও ঢাকের বাদ্যের সঙ্কেতও তাই—

"গিজ্-তা : গি-জোড়্ | গিজ্-তা : গি-জোড়্ | গিজ্-তা : গি-জোড় | গাং"

অথবা

"লাক্ চ : ড়া চড়্ | লাক্ চ : ড়া চড়্ | লাক্ চ : ড়া চড়্ | চড়্"—

সম্ভবতঃ বাঙালীর আদিম ইতিহাসে কোল-জাতির প্রভাবের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। কেহ কেহ বলেন, বাংলার শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ আর ইংরেজী ছন্দ এক জিনিস। এই মত একান্ত ভ্রান্ত। যিনি কিঞ্চিৎ অনুধাবন-পূর্ব্বক ইংরেজী ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনি কখনও এরূপ ভ্রান্ত মতের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিয়াছি।

উপসংহারে একটি কথা পুনর্ব্বার বলিতে চাই। উপরে বাংলা ছন্দের তিন রীতির কথা বলিয়াছি। কিন্তু বাংলা কবিতার তিনটি স্বতন্ত্র জাতি-ভেদের কথা বলি নাই। একই কবিতার স্থানে স্থানে বিভিন্ন রীতির ব্যবহার থাকিতে পারে। দ্রুত লয়ের স্থলে ধীর লয়, ধীর লয়ের স্থলে বিলম্বিত লয়ের ব্যবহার কখনও কখনও দেখা যায়।

এমন কি একই চরণের খানিকটা এক লয়ে, বাকি অন্য লয়ে রচিত, ঐ রকমও দেখা যায়। *

খাড়া বড়ি । শাক্ পাতাড়ে । বিলক্ষণ । টান — (দ্রুত)
কালিয়ে কাবাব রেধে । দেমাকে অজ্ঞান — (ধীর)

তোমা সবা । জানি আমি । প্রাণাধিক । করি — (ধীর)
প্রাণ ছাড়া যায় । তোমা সবা । ছাড়িতে না । পারি — (দ্রুত+ধীর)

বাংলা ছন্দের ভিত্তি পর্ব্ব, এবং পর্ব্বের পরিচয় মাত্রা-সংখ্যায়। কিন্তু মাত্রাসমকত্ব ছাড়া ছন্দের আরও নানাবিধ গুণ আছে, তদনুসারে তাহার রীতি নির্ণয় করা যায়। বাংলা ছন্দের মাত্রা-পদ্ধতি এক ও অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা ছন্দের রীতির উপর নির্ভর করে না। কবিতা-বিশেষে পর্ব্ব-গঠন ও মাত্রা-বিচার হইতে একটি বিশিষ্ট ভাব বা রীতির আভাস আসিতে পারে। আবার, মাত্রা-সংখ্যাদি স্থির রাখিয়াও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বা রীতিতে একই কবিতা পড়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন রীতির আলোচনা-প্রসঙ্গে মাত্রা-সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছি, তাহা সেই রীতির চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতাতেই খাটে। কিন্তু সকল কবিতাতেই যে কোন-না-কোন রীতির চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণমাত্রায় থাকিবে, তাহা নহে।

---

* বিভিন্ন লয়ের পর্ব্ব একই চরণে থাকিলে তাহাদের সম-জাতীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই চরণে দ্রুত ও ধীর (নাতিদ্রুত) লয় থাকিতে পারে। কিন্তু বিলম্বিত লয়ের স্থলে দ্রুত বা ধীর (নাতিদ্রুত) লয়ের প্রয়োগ হইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ের স্থলে অপেক্ষাকৃত মন্থর লয়ের প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু ইহার বিপরীত করা যায় না। সুতরাং ধীর লয়ের স্থলে বিলম্বিত লয়ের ব্যবহার সম্ভব।

বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী

বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ-সম্পর্কে আলোচনা পূর্ব্বে কয়েকটি অধ্যায়ে করা হইয়াছে। আরও দুই একটি কথা এখানে বলা হইতেছে।

যাহাকে ধীর লয়ের ছন্দ বা পয়ার-জাতীয় ছন্দ বলা হইয়াছে, তাহাকে কেহ কেহ ৮ মাত্রার ছন্দ বলেন। কিন্তু এই রীতির ছন্দে কেবল ৮ মাত্রার নহে, ১০ মাত্রার পর্ব্বেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এতদ্ভিন্ন ৪ মাত্রার, ৫ মাত্রার, ৬ মাত্রার, ৭ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহারও এই রীতির ছন্দে বিরল নহে। যথা—

৪ মাত্রার পর্ব্ব—নাসা তুল | তিল ফুল | চিন্তাকুল | ঈশ
বাক্য স্ফূর্ত্তি | সুধা বৃষ্টি | লোল দৃষ্টি | বিষ

৫ „ „ —এককানে শোভে | ফণিমণ্ডল
আর কানে শোভে | মণিকুণ্ডল

৬ „ „ —জয় ভগবান্ | সর্ব্ব শক্তিমান্ | জয় জয় ভবপতি
করি প্রণিপাত | এই কর নাথ | তোমাতেই থাকে মতি

৭ „ „ —কন্যা বলি পৃথিবী | সীতারে ডাকে ঘনে
কোলে করি সীতারে | তুলিল সিংহাসনে
নানাবিধ বসন | ভূষণ পরিধান
মূর্ত্তিমতী পৃথিবী | হইল বিদ্যমান (কৃত্তিবাস)

বিলম্বিত লয়ের (ধ্বনি-প্রধান) ছন্দকে কেহ কেহ ৬ মাত্রার ছন্দ বলেন। কখন কখন তাঁহারা বলেন যে কেবল ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার পর্ব্ব এই ছন্দে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ৪ ও ৮ মাত্রার পর্ব্ব-ও বিলম্বিত লয়ের ছন্দে পাওয়া যায়।

জ্যোৎস্নায় | নাই বাঁধ =৪+৪
এই চাঁদ | উন্মাদ =৪+৪
এই মন | উন্মন =৪+৪
তন্ময় | এই চাঁদ =৪+৪

(সত্যেন্দ্রনাথ)

অঞ্চল সিঞ্চিত | গৈরিকে স্বর্ণে =৮+৭ (৮ ?)

গিরি-মল্লিকা দোলে | কুন্তলে কর্ণে =৮+৭ (৮ ?)

(সত্যেন্দ্রনাথ)

বংশ : রয়েছে : চাপা | মেসোপোটা : মিয়ারই =৮+৭

মার্জার : গুষ্টির | হবে সে কি : ঝিয়ারি =৮+৭

(মাম্‌লা—ছড়া—রবীন্দ্রনাথ)

পয়ার-জাতীয় ছন্দে কেবল দুই মাত্রার চলন আছে, এ মতও যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে | বলের অন্যায় (রবীন্দ্রনাথ—নৈবেদ্য)

এই চরণটিতে দুই মাত্রার চলন আছে, এ কথা বলা যায় না। দুই মাত্রা ধরিয়া ইহার পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ করা যায় না।

বিলম্বিত লয়ের ছন্দে যে কেবল তিন মাত্রার চলন আছে, এ কথাও স্বীকার করা যায় না।

অশ্রুর মৌক্তিক !
হাস্তের স্ফূর্ত্তি।
লহরের লীলা ঠিক
লাস্তের মূর্ত্তি (সত্যেন্দ্রনাথ)

এ ক্ষেত্রে তিন মাত্রা ধরিয়া পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ করা সম্ভবপর নয়।

বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ এক হইতে পারে মূল পর্ব্বের মাত্রা-সংখ্যা ধরিয়া,—যেমন ৪ মাত্রার, ৫ মাত্রার ছন্দ ইত্যাদি। এইরূপ শ্রেণীবিভাগে ছন্দের ওজন বোঝা যায়। আর এক রকম শ্রেণীবিভাগ করা যায়—চরণে বিভিন্ন গতির অক্ষরের সমাবেশ-অনুসারে। ১৪নং সূত্রে গতি-অনুসারে পাঁচ রকমের অক্ষরের কথা বলা হইয়াছে—লঘু, গুরু, বিলম্বিত, অতিবিলম্বিত, অতিদ্রুত। ইহাদের মধ্যে এক লঘু অক্ষর সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যায়—অন্য প্রত্যেক প্রকার অক্ষরেরই পরস্পরের সহিত সমাবেশের বিধি-নিষেধ

আছে। নিম্নের নক্সা দ্বারা ইহাদের পরস্পরের সম্পর্ক বুঝান যাইতে পারে। (১৫নং সূত্র দ্রঃ)
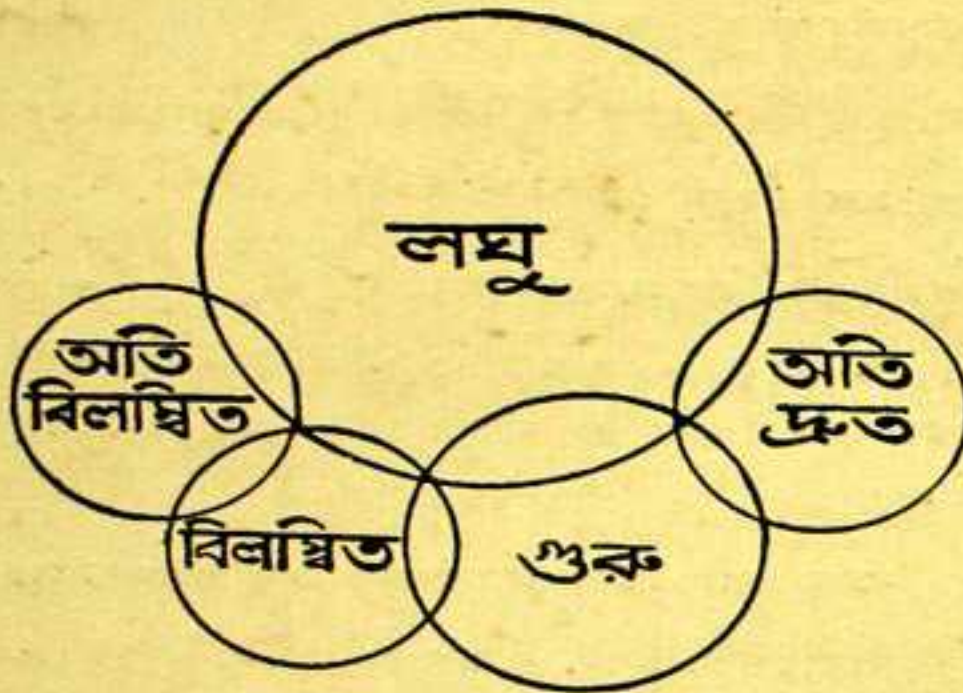
চরণে বিভিন্ন গতির অক্ষরের ব্যবহার-অনুসারে ছন্দের নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা যায় :—

(১) লঘু ছন্দ—

এরূপ ছন্দের চরণে মাত্র লঘু অক্ষর ব্যবহৃত হয়।

> পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
> কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।
> যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
> তুমি হাসো শুধু, মধুরহাসিনী,
> বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে,
> তোমার মনে।

এরূপ ছন্দে প্রতি চরণ ধীর লয়ে বা বিলম্বিত লয়ে পড়া যায়।

(২) গুরু ছন্দ (শুদ্ধ)—

এরূপ ছন্দের চরণে লঘু ও গুরু এই দুই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইহাই সনাতন পয়ার-জাতীয় ছন্দ। ইহা তান-প্রধান এবং ইহার লয় ধীর।

[৩১ সূত্রে উদাহরণ (ই) দ্রঃ]

(২ক) গুরু ছন্দ (মিশ্র)—

এরূপ ছন্দের চরণে লঘু ও গুরু ছাড়া ব্যভিচারী হিসাবে বিলম্বিত বা

অতিবিলম্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোন পর্ব্বাঙ্গেই একাধিক ব্যভিচারী অক্ষর থাকে না। [৩১ সূত্রের উদাহরণ (ঈ) দ্রঃ]

(৩) বিলম্বিত ছন্দ (শুদ্ধ)—

এরূপ ছন্দে লঘু ও বিলম্বিত এই দুই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইহাই ধ্বনি-প্রধান আধুনিক মাত্রাছন্দ। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রচলন করেন। ইহার লয়—বিলম্বিত। [৩১ সূত্রের উদাহরণ (উ) দ্রঃ]

(৩ক) বিলম্বিত ছন্দ (মিশ্র)—

এরূপ ছন্দে ব্যভিচারী হিসাবে অতিবিলম্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হয়।

[৩১ সূত্রের উদাহরণ (ঊ) দ্রঃ]

(৪) অতিবিলম্বিত ছন্দ—

এরূপ ছন্দে প্রতি চরণে একাধিক অতিবিলম্বিত অক্ষরের প্রয়োগ হয়। অন্যান্য অক্ষর লঘু বা বিলম্বিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে এরূপ চরণের সাধারণ লয়—বিলম্বিত। সংস্কৃত উচ্চারণের কথঞ্চিৎ অনুকরণ এই ছন্দেই মাত্র সম্ভব। [৩১ সূত্রের উদাহরণ (ঋ), (ঌ), (এ) দ্রঃ]

(৫) দ্রুত ছন্দ (শুদ্ধ)—

ইহাই তথাকথিত ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ। ইহার লয়—দ্রুত। এরূপ ছন্দে লঘু ও অতিদ্রুত এই দুই প্রকার অক্ষর সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। গুরু অক্ষর-ও সৌষম্য রাখিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে।

[৩১ সূত্রের উদাহরণ (অ) দ্রঃ]

(৫ক) দ্রুত ছন্দ (মিশ্র)—

এরূপ ছন্দের চরণে ব্যভিচারী হিসাবে বিলম্বিত ও অতিবিলম্বিত অক্ষর ক্বচিৎ স্থান পাইয়া থাকে। [৩১ সূত্রের উদাহরণ (আ) দ্রঃ]

ছন্দের জাতি, রীতি ও লয় সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে এ কয় শ্রেণীর ছন্দের বিবিধ উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে বাংলা ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি মূলতঃ এক। উপরে যে কয় শ্রেণীর ছন্দের কথা বলা হইল সর্ব্বত্রই সেই পদ্ধতি ও উহার মূল সূত্রগুলি মানিয়া চলিতে হয়।

বাংলা পদ্যের এক একটি চরণে কোন এক প্রকার অক্ষরের প্রাধান্য থাকে। লঘু অক্ষরের সহিত সেই প্রকারের অক্ষরের সমাবেশ হওয়াতে চরণের একটা

বিশিষ্ট লয় ও রীতির উদ্ভব হয়। যে পাঁচ প্রকার অক্ষর আছে, তদনুসারে উল্লিখিত পাঁচটি শুদ্ধ বর্গের ছন্দ বাংলায় সম্ভব। শুদ্ধ বর্গের চরণে ব্যভিচারী অক্ষর কচিৎ স্থান পাইয়া থাকে তাহাতে মিশ্র বর্গের উদ্ভব হয়, তবে ব্যভিচারী অক্ষর কোন পর্ব্বাঙ্গে একাধিক থাকিতে পারে না এবং চরণেও তাহাদের মোট সংখ্যা স্বল্পই থাকে, নহিলে লয়ের বৈশিষ্ট্য থাকে না। তবে একথা স্বীকার করিতে হয় যে ব্যভিচারী অক্ষরের কচিৎ প্রয়োগে লয়-পরিবর্ত্তনের জন্য ছন্দ কখন কখন মনোজ্ঞ, বৈচিত্র্যসুন্দর, ও ব্যঞ্জনা-সম্পদে গরীয়ান্ হইয়া থাকে।

সম্প্রতি একজন লেখক বাংলা ছন্দকে তিনটি জাতে বিভক্ত করিয়াছেন—পদভূমক, পর্ব্বভূমক ও ছড়ার ছন্দ। 'বাংলা ছন্দের জাতি ও ঢং'-শীর্ষক অধ্যায়ে যে ত্রিধা বিভাগের ত্রুটি আলোচনা করা হইয়াছে, ইহা তাহারই পুনরাবৃত্তি ; শুধু নাম-করণে অভিনবত্ব আছে। পয়ার-জাতীয় ছন্দের এক একটি বিভাগকে ইনি নাম দিয়াছেন 'পদ'। 'পদ' কথাটির নানা অর্থ হয়, সুতরাং এই কথাটি ব্যবহার না করাই সঙ্গত। তাহা ছাড়া পদভূমক বলায় ঐ জাতীয় ছন্দের কোন পরিচয় দেওয়া হয় না, বরং একটা petitio principii দোষ ঘটে। বাংলা ছন্দের এক একটি measureএর প্রতিশব্দ-হিসাবে কোন শব্দ তিনি গ্রহণ করেন নাই। তথা-কথিত তিন জাতীয় ছন্দ কি এতই পরস্পর-বিরোধী ? ঐ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা পুর্ব্বে করা হইয়াছে।

ছেদ ও যতি শব্দ দুইটি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে না পারায় তাহাদের প্রয়োগে অনেক গোলযোগ করিয়াছেন।

'পদগুলি ঠিক সমান সমান মাপের হয় না'—তাহার ইত্যাদি মত গ্রহণযোগ্য নয়। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই যে উদাহরণগুলি আছে, তদ্দ্বারা ইহার খণ্ডন করা যায়।

বাংলা ছন্দে কখন কখন যে অক্ষর হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়, সে সম্বন্ধে তিনি কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। 'ছন্দের প্রয়োজন বুঝিয়া অক্ষরগুলি হ্রস্ব দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয়'—কিন্তু সে প্রয়োজন কি, কি ভাবে তাহা বোঝা যায়, এবং সে প্রয়োজনের প্রভাব কিরূপে ব্যক্ত হয়, তাহা তিনি বুঝাইতে পারেন নাই।

ছন্দোলিপি

অনেক পাঠকের সুবিধা হইতে পারে বলিয়া বিভিন্ন প্রকারের ছন্দোবন্ধের কয়েকটি কবিতার ছন্দোলিপি দেওয়া হইল।

(১)

ভূতের : মতন | চেহারা : যেমন | নির্ব্বোধ : অতি | ঘোর = (৩ + ৩) + (৩ + ৩) + (৪ + ২) + ২

যা কিছু : হারায়, | গিন্নি : বলেন, | "কেষ্টা : বেটাই | চোর" !

= (৩ + ৩) + (৩ + ৩) + (৩ + ৩) + ২

পর্ব্ব—ষণ্মাত্রিক।

চরণ—চতুষ্পর্ব্বিক, অপূর্ণপদী (শেষ পর্ব্বটি হ্রস্ব)।

স্তবক—পরস্পর সমান সমপদী দুই চরণে মিত্রাক্ষর।

রীতি—ধ্বনিপ্রধান।

লয় - বিলম্বিত।

(২)

প্রণমি : তোমারে : আমি | সাগর- : উত্থিতে = (৩ + ৩ + ২) + (৩ + ৩)

ষড়ৈশ্বর্য্য : ময়ী, : অয়ি | জননি : আমার। = (৪ + ২ + ২) + (৩ + ৩)

তোমার : শ্রীপদ : রজঃ | এখনো : লভিতে = (৩ + ৩ + ২) + (৩ + ৩)

প্রসারিছে : করপুট | ক্ষুদ্র : পারাবার। = (৪ + ৪) + (২ + ৪)

পর্ব্ব—অষ্টমাত্রিক।

চরণ—দ্বিপর্ব্বিক, অপূর্ণপদী (catalectic) (পয়ার)।

স্তবক—সমপদী ; ৪ চরণ, মিত্রাক্ষর (ক-খ-ক-খ)।

রীতি—তানপ্রধান।

লয়—ধীর।

(৩)

স্বনের : শেষে | ঘুমের : দেশে | ঘোম্‌টা : পরা | ঐ : ছায়া

= (২ + ২) + (২ + ২) + (২ + ২) + (১ + ২)

ভুলা : লরে | ভুলা : ল মোর | প্রাণ = (২ + ২) + (২ + ২) + ১

ও পা : রেতে | সোনার : কূলে | আঁধার : মূলে | কোন্ : মায়া
=(২+২)+(২+২)+(২+২)+(১+২)

গেয়ে : গেল | কাজ-ভা : ভানো | গান। =(২+২)+(২+২)+১

পর্ব্ব—চতুর্মাত্রিক।

চরণ—চতুষ্পর্ব্বিক ও ত্রিপর্ব্বিক, অপূর্ণপদী।

স্তবক—অসমপদী ৪ চরণ (১ম=৩য়, ২য়=৪র্থ), মিত্রাক্ষর (ক-খ-ক-খ)।

রীতি—শ্বাসাঘাতপ্রধান।

লয়—দ্রুত।

(৪)

"রে সতি, : রে সতি" | কাঁদিল : পশুপতি | পাগল : শিব প্রম : থেশ
=(৪+৪)+(৪+৪)+(৪+৪+২)

যোগ : মগন : হর | তাপস : যত দিন | তত দিন : নাহি ছিল : ক্লেশ
=(৪+৪)+(৪+৪)+(৪+৪+২)

পর্ব্ব—অষ্টমাত্রিক।

চরণ—ত্রিপর্ব্বিক, অতিপদী (hyper-catalectic) (দীর্ঘ ত্রিপদী)।

স্তবক—সমপদী ২ চরণ, মিত্রাক্ষর।

রীতি—ধ্বনিপ্রধান।

লয়—বিলম্বিত (অতিবিলম্বিত ছন্দ)

(৫)

ছিল আশা : * মেঘনাদ,* | মুদিব : অন্তিমে ॥ =(৪+৪)+(৩+৩)

এ নয়ন : দ্বয় : আমি | তোমার : সম্মুখে ; ** ॥ =(৪+২+২)+(৩+৩)

সঁপি রাজ্য : ভার : ,* পুত্র,* | তোমায়,* : করিব ॥ =(৪+২+২)+(৩+৩)

মহাযাত্রা : ! * * কিন্তু বিধি | *—বুঝিব : কেমনে ॥ =(৪+৪)+(৩+৩)

ভাঁর লীলা ? : *—ভাঁড়াইলা | সে সুখ : আমারে ! * * ॥ =(৪+৪)+(৩+৩)

পর্ব্ব—অষ্টমাত্রিক
চরণ—দ্বিপর্ব্বিক অপূর্ণপদী (পয়ার)
স্তবক— × , অমিত্রাক্ষর, সমপদী
} সাধারণ অমিত্রাক্ষর ছন্দোবদ্ধ

রীতি—তানপ্রধান।

লয়—ধীর।

(৬)

যদি তুমি : মুহূর্ত্তের তরে |
ক্লান্তিভরে :
দাঁড়াও থমকি, || — =১০+১০
তখনি : চমকি |
উচ্ছ্রিয়া : উঠিবে : বিশ্ব | পুঞ্জ পুঞ্জ : বস্তুর : পর্ব্বতে ; — =৬+৮+১০
পঙ্গু মূক | কবন্ধ : বধির : আঁধা |
স্থূলতনু : ভয়ঙ্করী : বাধা || — =৪+৮+১০
সবারে : ঠেকায়ে : দিয়ে | দাঁড়াইবে : পথে ; || — =৮+৬
অণুতম : পরমাণু | আপনার : ভারে |
সঞ্চয়ের : অচল : বিকারে || — =৮+৬+১০
বিদ্ধ : হবে | আকাশের : মর্ম্মমূলে |
কলুষের : বেদনার : শূলে । || — =৪+৮+১০

পর্ব্ব—মিশ্র (৪, ৬, ৮ বা ১০ মাত্রার)
চরণ—দ্বিপর্ব্বিক ও ত্রিপর্ব্বিক
স্তবক—বিষমপদী, মিশ্র, জটিল মিত্রাক্ষর
রীতি—তানপ্রধান।
লয়—ধীর।

'বলাকা'র ছন্দ

(৭)

বিনুর বয়স | তেইশ তখন, | রোগে ধ'রলো | তা'রে, — =৪+৪+৪+২
ওষুধে ডা | ক্তারে — =৪+২
ব্যাধির চেয়ে | আধি হ'লো | বড়ো ; — =৪+৪+২
নানা মাপের | জমলো শিশি, | নানা মাপের | কৌটো হ'লো | জড়ো। — =৪+৪+৪+৪+২
বছর দেড়েক | চিকিৎসাতে | করলো যখন | অস্থি জর | জর — =৪+৪+৪+৪+২
তখন বললে, | "হাওয়া বদল | করো"। — =৪+৪+২
এই সুযোগে | বিনু এবার | চাপলো প্রথম | রেলের গাড়ি, — =৪+৪+৪+৪
বিয়ের পরে | ছাড়্‌লো প্রথম | শ্বশুর বাড়ি। — =৪+৪+৪

পর্ব্ব—চতুর্ম্মাত্রিক।
চরণ—মিশ্র (দ্বিপর্ব্বিক হইতে পঞ্চ-পর্ব্বিক), প্রায়শঃ অপূর্ণপদী।
স্তবক—মিশ্র, মিত্রাক্ষর।
রীতি—শ্বাসাঘাতপ্রধান।
লয়—দ্রুত।

তৃতীয় ভাগ

বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব

(১)

ছন্দ, ভাষা ও বাক্য

Metrics বা ছন্দঃসম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ rhythm বা ছন্দঃস্পন্দন সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। বাংলায় ছন্দ শব্দটি metre ও rhythm উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয় বলিয়া metre ও rhythm যে দুইটি পৃথক্ concept অর্থাৎ প্রত্যয় বা ভাব, তাহা সাধারণের ধারণায় সব সময়ে আসে না। কবি যখন লেখেন যে—

> "ছন্দে উদিছে তারকা, ছন্দে কনকরবি উদিছে,
> ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে"

—তখন তিনি ছন্দ শব্দটি rhythm অর্থেই ব্যবহার করেন। Metre বা পদ্যের ছন্দ rhythm বা সাধারণ ছন্দঃস্পন্দনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশ মাত্র।

রসানুভূতির সঙ্গে ছন্দোবোধের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। মনে রসের উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দঃস্পন্দনে। যেখানেই কোন ভাবে রসোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানেই ছন্দ লক্ষিত হয়। শিশুর চপল নৃত্যেও একরকমের ছন্দঃ আছে, মানুষের শিল্পের অভিব্যক্তির মধ্যেও ছন্দ আছে। যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা বিশ্বের লীলাতেও ছন্দের খেলা দেখিতে পান। ছন্দোবোধের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুতে স্পন্দন আরম্ভ হয়, সেই স্পন্দনের ফলে মনের মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধ আবেশের ভাব আসে, "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু" এই রকম একটা বোধ হয়।* এই অনুভূতিটুকু কবিতার ও অন্যান্য সুকুমার কলার প্রাণ।

এখন প্রশ্ন এই যে, ছন্দোবোধের উপাদান কি? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে কি লক্ষণ থাকিলে মনে ছন্দোবোধ আসিতে পারে? সূর্যাস্তের সময়কার আকাশে রঙের খেলায়, বাউল গানের সুরে বা তাজমহলের গঠনশিল্পের মধ্যে

---

* ছাদয়তে ইতি ছন্দঃ - যাহাতে পূর্বে অসুরগণ আচ্ছন্ন (মন্ত্রমুগ্ধ ও অভিভূত) হইয়াছিল।

এমন কি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহার জন্য আমরা এ সমস্তের মধ্যেই ছন্দঃ বলিয়া একটা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারি? চক্ষু, কর্ণ বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আমরা রঙ্, বা সুর বা গন্ধ কিংবা ঐ রকম কোন না কোন গুণ প্রত্যক্ষ করি। তাহাদের কি রকম সমাবেশ হইলে আমরা ছন্দোময় বলিয়া তাহাদের উপলব্ধি করি?

কেহ কেহ বলেন যে, ঘটনাবিশেষের পৌনঃপুনিকতাই ছন্দের লক্ষণ। তাহারা বলেন যে, সমপরিমিত কালানন্তরে যদি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় এবং তাহার দ্বারাই যদি সময়ের বিভাগের বোধ জন্মে, তবে সেখানে ছন্দ আছে বলা যায়। সুতরাং ঘড়ির দোলকের গতি, তরঙ্গের উত্থান-পতন ইত্যাদিতে ছন্দ আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ছন্দের এই সংজ্ঞা খুব সুষ্ঠু বলা যায় না। কোন কোন প্রকারের ছন্দে অবশ্য পৌনঃপুনিকতাই প্রধান লক্ষণ; কিন্তু ছন্দের এমন সব ক্ষেত্র আছে, যেখানে পৌনঃপুনিকতা এক রকম নাই, বা থাকিলেও তাহার জন্য ছন্দোবোধ জন্মে না। সূর্য্যাস্তের সময়ে আকাশে কিংবা বড় বড় চিত্রকরের ছবিতে যে রঙের সমাবেশ দেখা যায়, তাহাতে ত পৌনঃপুনিকতা বিশেষ লক্ষিত হয় না, কিন্তু তাহাতে কি rhythm নাই? গায়কেরা যখন তান ধরেন, তখন তাহাতে কি পৌনঃপুনিকতা লক্ষিত হয়? আসল কথা—rhythm-এর কাজ মানসিক আবেগের অনুযায়ী স্পন্দনের সৃষ্টি করা, কেবলমাত্র কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা নহে।

কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থের উপর আঘাত করিলে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। আমাদের বাহেন্দ্রিয়গুলির গঠন-কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা স্থিতিস্থাপক উপাদানে তৈয়ারি। বাহিরের জগতের প্রত্যেক ঘটনা ও পরিবর্ত্তন অক্ষিগোলক বা কর্ণপটহের স্থিতিস্থাপক স্নায়ুতে গিয়া আঘাত করিয়া স্পন্দন উৎপাদন করে, এবং সেই স্পন্দনের ঢেউ মস্তিষ্কের কোষে ছড়াইয়া অনুভূতিতে পরিণত হয়। অহরহঃ বাহ্য জগতের সম্পর্কে আসার দরুণ নানা রকমের স্পন্দনের ঢেউয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় অভিভূত হইতেছে। যখন কোন এক বিশেষ রকমের স্পন্দনের পর্য্যায়ের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য অনুভূত হয়, তখনই ছন্দোবোধ জন্মে।

এই সামঞ্জস্যের স্বরূপ কি? যদি সমধর্ম্মী ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কোন বিশেষ গুণের তারতম্যের জন্য মনে আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই সেখানে ছন্দঃস্পন্দন আছে বলা যাইতে পারে। কোন ঘটনা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে

তজ্জাতীয় অন্য ঘটনার জন্য প্রত্যাশা জন্মে। কানে যদি 'সা' সুর আসিয়া লাগে, তবে মন স্বভাবতঃই তাহার পরে 'পা' কিংবা এমন কোন সুরের প্রত্যাশা করে, যাহাতে কানের স্বাভাবিক তৃপ্তি জন্মিতে পারে; তেমনি সিঁদুর (vermilion) রং দেখিলে তাহার পরে গাঢ় নীল (ultra-marine) রং দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যাশিত ঘটনা না আসিয়া যদি অন্য ঘটনা আসিয়া পড়ে, তবে মনে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়; আবার যাহা প্রত্যাশিত, তাহা আসিলেও আর এক প্রকার আন্দোলন হয়। এবংবিধ আন্দোলনেই আবেগের ব্যঞ্জনা হয়। এইরূপে বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনের সমাবেশ-বৈচিত্র্য বা প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব-জনিত আন্দোলনই ছন্দের প্রাণ। কোন রাগরাগিণীর আলাপে নানা সুরের সমাবেশ বা কোন চিত্রপটে রঙের সমাবেশ লক্ষ্য করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রতীত হইবে। কেবল দেখিতে হইবে যে, বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনে স্পন্দনে যেন বিরোধ না থাকে, অথবা সঙ্গীতের ভাষায় বলিতে গেলে, তাহারা যেন পরস্পর 'বিবাদী' না হয়। নানা রকমের স্পন্দনের নানা ভাবে সমাবেশের দরুণ আবেগানুরূপ জটিল স্পন্দনের উৎপত্তি হয়। সেই জটিল স্পন্দনই মানসিক আবেগের প্রতীক।

কিন্তু বৈচিত্র্য ছাড়াও ছন্দে আর একটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক। সেটি হইতেছে,—ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে কোন প্রকারের ঐক্যসূত্র। সঙ্গীতে সুর আবেগানুযায়ী বৈচিত্র্য আনিয়া দেয়, তাল সেই সুরসমুদায়কে ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করে। যেখানে স্পন্দন, সেখানে সতত দুইটি প্রবৃত্তির লীলা দেখা যায়; একটি গতির ও একটি স্থিতির। বেগের বশে কোন এক দিকে গতির প্রবৃত্তি এবং স্থির অবস্থানে ফিরিবার প্রবৃত্তি—এই দুইয়ের পরস্পর প্রতিক্রিয়ায় স্পন্দনের উৎপত্তি। ছন্দেও এক দিকে বৈচিত্র্যের জন্য গতির এবং অপর দিকে ঐক্যসূত্রের জন্য স্থিতির মিলন ঘটে বলিয়া স্পন্দনের লক্ষণ অনুভূত হয়।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, যেখানেই ছন্দ, সেখানেই প্রথমতঃ সহধর্ম্মী ঘটনাপরম্পরা থাকা দরকার; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্তের মধ্যে কোন এক রকমের ঐক্যসূত্র থাকা দরকার; তৃতীয়তঃ, তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণের তারতম্যের জন্য একটা সুন্দর বৈচিত্র্যের আবির্ভাব হওয়া দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গীতে সুরের পারম্পর্য্যে তাল-বিভাগের দ্বারা ঐক্য এবং আপেক্ষিক তীব্রতা বা কোমলতার দ্বারা বৈচিত্র্য সাধিত হয়, এবং এইরূপে ছন্দোবোধ জন্মে।

পদ্যছন্দের মধ্যেও এই লক্ষণগুলি বিশিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বাক্যের সঙ্গে বাক্যের বন্ধনই পদ্যছন্দের কাজ। পদ্যছন্দের ক্ষেত্রে সমধর্ম্মী ঘটনাপরম্পরা বলিতে অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি—এইরূপ কোন বাক্যাংশ বুঝিতে হইবে ; এবং পারম্পর্য্য বলিতে, কালানুযায়ী পারম্পর্য্য বুঝিতে হইবে। বাক্যাংশের কোন কোন গুণের দিক্ দিয়া ঐক্যের সূত্র থাকিবে ; অর্থাৎ সেই গুণের দিক্ দিয়া পর পর বাক্যাংশ অনুরূপ হইবে, বা কোন obvious অর্থাৎ সহজবোধ্য pattern বা আদর্শের অনুযায়ী হইবে। এই আদর্শ বা নক্সাই সময়ে সময়ে অভীষ্ট ভাবের ব্যঞ্জনা করে, এবং একাধারে ঐক্যের ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ করে। কিন্তু এ ধরণের বৈচিত্র্যে নিয়মের নিগড় অত্যন্ত বেশী, সুতরাং ঐক্যের বাঁধনই অধিক প্রতীত হয়। আবেগের অনুধর্ম্মী বৈচিত্র্য-সম্পাদনের জন্য অন্য কোন গুণের দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। কবি স্বাধীন ভাবে সেই গুণের তারতম্য ঘটাইয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন এবং অভীষ্ট আবেগের দ্যোতনা করেন। কেবলমাত্র নক্সা ধরিয়া চলিয়া গেলে ছন্দঃ একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয় এবং তাহাতে আবেগের দ্যোতনা হয় না। এই সত্যটি অনেক কবি ও ছন্দঃশাস্ত্রকার বিস্মৃত হ'ন বলিয়া তাঁহারা ছন্দঃসৌন্দর্য্যের মূল-সূত্রটি ধরিতে পারেন না।

Metrics বা পদ্যছন্দের আলোচনা করিতে গেলে মুখ্যতঃ ছন্দের ঐক্য-বন্ধনের সূত্রটি আলোচনা করিতে হয়। কবি ইচ্ছামত বৈচিত্র্য আনয়ন করেন, সে বিষয়ে মাত্র দিঙ্‌নির্ণয় করা যাইতে পারে, বাঁধা-ধরা নিয়ম করিয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু ছন্দের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের সূত্র কি হইতে পারে, তাহা ভাষার প্রকৃতি, ইতিহাস ও ব্যবহারের রীতির উপর নির্ভর করে, সে বিষয়ে ছন্দের ব্যাকরণ রচিত হইতে পারে।

কাব্যছন্দের প্রকৃতি বাক্যের ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রথমতঃ বাক্যের ধর্ম্ম কি কি এবং তাহাতে কি ভাবে ছন্দ রচনা হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝিতে হইবে।

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা Syllable। বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম আয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর। প্রত্যেকটি অক্ষর উচ্চারণের সময়ে, কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হইবার কালে কণ্ঠস্থ বাগ্‌যন্ত্রের অবস্থান অনুসারে শ্বাসবায়ু কোন এক বিশেষ স্বরে পরিণত হয়, এবং পরে মুখগহ্বরের আকার ও জিহ্বার গতি অনুসারে উপরন্তু ব্যঞ্জনধ্বনিরও

উৎপাদন অনেক সময়ে করে। বাগ্‌যন্ত্রের অঙ্গসমূহের পরস্পর অবস্থানের ও গতির পার্থক্য অনুসারে অক্ষরে রূপের বা ধ্বনির ভেদ ঘটে এবং বহুবিধ অক্ষরের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বর থাকিবে এবং সেই স্বরই অক্ষরের মূল অংশ। অতিরিক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সেই স্বরেরই একটি বিশেষ রূপ প্রদান করে মাত্র।

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধর্ম্ম—(১) তীব্রতা (pitch)—শ্বাস বহির্গত হইবার সময়ে কণ্ঠস্থ বাক্‌তন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অনুসারে তাহাদের দ্রুত বা মৃদু কম্পন সুরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে। (২) গাম্ভীর্য্য (intensity or loudness)—অক্ষর উচ্চারণের সময়ে যত বেশী পরিমাণ শ্বাসবায়ু একযোগে বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতে ও স্পষ্টরূপে স্বর শ্রুতিগোচর হইবে। (৩) স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (length or duration)—যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্‌যন্ত্র কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। (৪) স্বরের রঙ্ (tone colour)—শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্বরের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনিরও সৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা যায় স্বরের রঙ্।

এই ত গেল স্বরের স্বধর্ম্মের কথা। তাহা ছাড়া কয়েকটি অক্ষর গ্রথিত হইয়া যখন বাক্যের সৃষ্টি হয়, তখনও আর দুই একটি বিশেষ ধ্বনিলক্ষণ দেখা যায়। কথা বলিবার সময়ে ফুস্‌ফুসে শ্বাসবায়ুর অপ্রতুল হইলেই নিঃশ্বাস-গ্রহণের জন্য থামিতে হয়, ঠিক নিঃশ্বাস-গ্রহণের সময়ে কোনও ধ্বনির উৎপাদন করা যায় না। এই জন্য বাক্যের মাঝে মাঝে pause বা ছেদ দেখা যায়। তদ্ভিন্ন যেখানে ছেদ নাই, সেখানেও জিহ্বাকে বারংবার প্রয়াসের পর কখন কখন একটু বিশ্রাম দিবার জন্য বিরামস্থল থাকে।

কথা বলিবার সময়ে নানা লক্ষণাক্রান্ত অক্ষর ও অক্ষর-সমষ্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া দুই একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে। ছন্দোবদ্ধ রচনার ঐক্য এবং তদুচিত আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় বাক্যের কোন এক বিশেষ ধর্ম্মে। আবার ছন্দোবদ্ধ রচনায় আবেগের প্রকাশও হয় বাক্যের অপর কোন ধর্ম্মের

মাত্রার বৈচিত্র্যে।—যেমন বৈদিক সংস্কৃতে ছন্দের ঐক্যসূত্র পাওয়া যায় প্রতি পদের অক্ষর-সংখ্যায় এবং পাদান্তস্থ কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা-সন্নিবেশের রীতিতে ; সেই কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা-সন্নিবেশের জন্য পাদান্তে একটা বিশেষ রকমের cadence বা দোলন অনুভব করা যায়। আবার প্রতি পাদের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্বর-তীব্রতার দরুণ আবেগদ্যোতক বৈচিত্র্য অনুভূত হয়। লৌকিক সংস্কৃতের প্রায় সমস্ত প্রাচীন ছন্দে প্রতি চরণের অক্ষর-সংখ্যার এবং তাহাদের মাত্রা-সংখ্যার দিক্ দিয়া ঐক্যসূত্র পাওয়া যায় ; কিন্তু হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে অক্ষর সাজাইবার রীতি হইতেই বৈচিত্র্যের অনুভূতি জন্মে। অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে এবং উত্তর-ভারতের চল্‌তি ভাষাসমূহের ছন্দে আবার ঐক্যসূত্র অন্যবিধ ; সেখানে প্রতি পর্ব্বের মোট মাত্রা-সংখ্যা হইতেই ছন্দের ঐক্যবোধ হয়। Measure বা পর্ব্বের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার অক্ষর সাজাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কবিকে দেওয়া হয়। ইংরেজী ছন্দে আবার accent বা অক্ষরবিশেষের উচ্চারণের জন্য স্বাভাবিক স্বরগাম্ভীর্য্যই ধ্বনির প্রধান লক্ষণ। প্রতি চরণে কয়েকটি নিয়মিত সংখ্যার foot বা গণ থাকার দরুণ ঐক্যবোধ জন্মে ; কিন্তু গণের মধ্যে accent-যুক্ত এবং accent-হীন অক্ষরের সমাবেশ হইতে বৈচিত্র্য-বোধ জন্মে।

এইরূপে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় ছন্দের প্রকৃতি ও আদর্শ বিভিন্ন। ছন্দের উপাদানীভূত বাক্যাংশের প্রকৃতি, ঐক্যবোধের ও বৈচিত্র্যবোধের ভিত্তিস্থানীয় ধর্ম্ম, ঐক্যের আদর্শ, ঐক্য ও বৈচিত্র্যের পরস্পর সমাবেশের রীতি—এই সমস্ত বিষয়েই পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে। সময়ে সময়ে আবার এক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছন্দের পৃথক্ রীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, লৌকিক সংস্কৃতের বৃত্তচ্ছন্দের এবং অর্ব্বাচীন সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত বা জাতিচ্ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির দৈহিক বিশেষত্ব এবং সভ্যতার ইতিহাস অনুসারে এই পার্থক্য নিরূপিত হয়। সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে অনার্য্য-ভাবিত হওয়াতে এবং অনার্য্য ছন্দের প্রভাবে আসাতেই সম্ভবতঃ বৃত্তচ্ছন্দের স্থানে জাতিচ্ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। বাক্যের নানা ধর্ম্ম থাকিলেও প্রত্যেক জাতির পক্ষে দুই একটি বিশেষ ধর্ম্মই সমধিকরূপে মন ও শ্রবণ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভাষায় ছন্দোবন্ধনের রীতি তুলনা করিলে বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

(২)

বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি

বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্বগুলি বুঝিতে গেলে, প্রথমতঃ বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির কয়েকটি বিশেষত্ব মনে রাখা দরকার। সেই বিশেষত্বগুলির সহিত বাংলা ছন্দের প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

প্রথমতঃ, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে খুব বাঁধাধরা লক্ষণ কোন দিক্ দিয়া নাই। অবশ্য সব দেশেই যখন লোকে কথা বলে, তখন ব্যক্তিভেদে এবং সময়ভেদে একই শব্দের ধ্বনির অল্পাধিক তারতম্য ঘটে। কিন্তু অনেক ভাষাতেই শব্দের কোন না কোন একটি ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রধান হইয়া থাকে, এবং সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই ছন্দঃসূত্র রচিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতে অক্ষরের মধ্যে কোন্‌টি হ্রস্ব, কোন্‌টি দীর্ঘ হইবে, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট আছে, গদ্যে পদ্যে সর্ব্বত্রই তাহা বজায় থাকে, এবং তদনুসারে ছন্দ রচিত হয়। ইংরেজীতে যদিও অক্ষরের দৈর্ঘ্য সুনির্দ্দিষ্ট নয় এবং পদ্যে ছন্দের খাতিরে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কমাইতে বা বাড়াইতে হয়, তত্রাচ এক দিক্ দিয়া অর্থাৎ accent-এর দিক্ দিয়া উচ্চারণের যথেষ্ট বাঁধাবাঁধি আছে। শব্দের কোন্ অক্ষরের উপর accent বা একটু বেশী জোর পড়িবে, তাহা এক রকম নির্দ্দিষ্ট আছে এবং accent-অনুসারেই ছন্দ রচিত হয়। বাংলায় ছন্দ মাত্রাগত, কিন্তু বাংলায় অক্ষরের মাত্রা বা কাল-পরিমাণ যে কি হইবে, সে বিষয়ে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই।

চল্‌তি বাংলার একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক্ :—

"আর (,) টের পেলেই বা কি? | ধরা কি মুখের কথা! | ত্যাপ্, শ্রীকান্ত, | কিচ্ছু ভয়
নেই; | ব্যাটাদের চারখানা | ডিঙ্গি আছে বটে— | কিন্তু যদি দেখিস্ | ঘিরে ফেলে
ব'লে | আর পালাবার | যো নেই, তখন | ঝুপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে | এক ডুবে
যতদূর পারিস্ গিয়ে | ভেসে উঠলেই হ'ল। | এ অন্ধকারে আর | দেখবার জো-টি
নেই।" |

("শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব্ব," শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

"এই ত চাই | কিন্তু আস্তে ভাই | —ব্যাটারা ভারী পাজী। | আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে | মক্কা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে | এম্‌নি বার ক'রে নিয়ে যাব | যে শালারা টেরও পাবে না। |

("শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব্ব," শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

(উপরের উদ্ধৃতাংশগুলিতে মোটা লম্বা দাঁড়ি দিয়া উচ্চারণের বিরামস্থল নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং ভারতীয় সঙ্গীতবিজ্ঞানের চল্‌তি সঙ্কেত অনুসারে অক্ষরের মাথায় চিহ্ন দিয়া মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছি ; মাথায় ।, মানে একমাত্রা ; ॥, মানে, দুই মাত্রা ; ।।।, মানে, তিন মাত্রা বুঝিতে হইবে।)

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলির মাত্রা বিচার করিলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত করা যায় :—

(১) সাধারণতঃ বাংলা উচ্চারণে প্রতি অক্ষর হ্রস্ব বা এক মাত্রা ধরা হইয়া থাকে।

(২) কিন্তু প্রায়শঃ দীর্ঘতর অক্ষর এবং কখন কখন হ্রস্বতর অক্ষরও দেখা যায়।

(ক) একাক্ষর হলন্ত শব্দ সাধারণতঃ দীর্ঘ বা দুই মাত্রা ধরা হয় ; যথা— উদ্ধৃতাংশের 'আর্', 'টের্', 'স্বাখ্' ; কিন্তু কখন কখন হ্রস্বও হইয়া থাকে— যথা—'ঝুপ্'।

(খ) শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ হয় (যথা—'ব্যাটাদের' শব্দে 'দের্', 'দেখিস্' শব্দে 'খিস্'), আবার কখনও হ্রস্ব হইতে পারে (যথা— 'ঝাউবনের' পদে 'নের্')।

(গ) পদ-মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ (যথা—'শ্রীকান্ত' শব্দের 'কান্'), কখন হ্রস্ব (যথা—'কিচ্ছু' শব্দের 'কিচ্', 'যতদূর' [যদ্দূর] পদের 'যৎ'), আবার কখন প্লুত—(যথা—'ফেল্‌লে' পদের 'ফেল্') হইতে পারে।

(ঘ) যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর প্রায়ই দীর্ঘ হয় (যথা—'নেই', গিয়ে (= গিএ), 'লাফিয়ে' শব্দের 'ফিয়ে' (= ফিএ) ; কখনও প্লুতও হয় (যথা—'চাই') ; আবার কখনও 'হ্রস্ব' হয় (যথা—'পেলেই' শব্দে 'লেই')।

(ঙ) মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর প্রায়ই হ্রস্ব হয়, কিন্তু ইচ্ছামত তাহাদেরও

দীর্ঘ করা যায় ; যথা—'ধরা' শব্দের 'রা', 'জো-টি' পদের 'জো', 'ভারি' পদের 'ভা' ;

চলতি ভাষায় লিখিত পদ্য হইতেও ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। একটা উদাহরণ লওয়া যাক্—

(১) নিধিরাম চক্রবর্ত্তী | শোণ কাটিছেন ব'সে,

(২) খেলারাম ভট্টাচার্য্য | উত্তরিল এসে।

(৩) নিধিরামকে খেলারাম | করিল সম্ভাষ।

(৪) নিধিরাম বলে তোমার | কোথায় নিবাস ?

(৫) কি বলিলে পোড়া মুখ | কুল করিতে যায় ?

(৬) সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল | অগ্নি দিল গায়।

(৭) ওর কপালে যদি | অন্য মেয়ে হইত,

(৮) এথ দিন ওর ভিটেয় | ঘুঘু চ'রে যেত।

(৯) কখন বলিনে যে | দিন গেল রে কিসে ?

(১০) আমার খলিয়ায় রস আছে তাই | খাচ্চে ব'সে ব'সে।

এখানেও দেখা যায় যে,—

(ক) একাক্ষর হলন্ত শব্দ কখনও দীর্ঘ (যথা—১ম পংক্তিতে 'রাম'), কখনও হ্রস্ব (যথা—১ম পংক্তির 'শোণ', ১০ম পংক্তির 'রস'), কখনও প্লুত (যথা—৭ম পংক্তির 'ওর') হইয়া থাকে।

(খ) শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ (যথা—৪র্থ পংক্তির 'নিবাস'

শব্দের 'বাস,' ৩য় পংক্তির 'সম্ভাষ' শব্দের 'ভাষ'), এবং কখনও হ্রস্ব (যথা—৪র্থ পংক্তির 'তোমার' পদের 'মার', ১০ম পংক্তির 'আমার' পদের 'মার') হয়।

(গ) পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর কখনও হ্রস্ব (১ম ও ২য় পংক্তির যুক্তবর্ণবিশিষ্ট অক্ষর মাত্রেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে), কখনও দীর্ঘ (যথা—৬ষ্ঠ পংক্তির 'সর্ব্বাঙ্গ' পদে 'বাঙ্')।

(ঘ) স্বরান্ত অক্ষর প্রায়শঃ হ্রস্ব, কিন্তু কদাচ দীর্ঘও হইতে পারে (যথা—৯ম পংক্তির 'কথন' শব্দের 'ন')।

তা'ছাড়া স্থান-ভেদে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে :—

(১) পঞ্চ নদীর তীরে | বেণী পাকাইয়া শিরে

(২) পঞ্চ ক্রোশ জুড়ি কৈলা | নগরী নির্ম্মাণ

এই দুই পংক্তিতে 'পঞ্চ' শব্দের উচ্চারণ এক নহে ; ১ম পংক্তিতে 'পঞ্চ' তিন মাত্রার এবং ২য় পংক্তিতে 'পঞ্চ' দুই মাত্রার ধরা হইয়াছে। তদ্রূপ,

(৩) এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক | ময়ী

(৪) ফেরে দূরে, মত্ত সবে—উৎসব-কৌতুকে

এই দুই উদাহরণেও 'কৌতুক' শব্দের উচ্চারণ একবিধ নহে।

নব্য বাংলার একজন ইংরেজী-শিক্ষিত কবির রচনা হইতেও উপরিলিখিত মতের প্রমাণ পাওয়া যায়—

কোথায় কৈশবী দল ? | বিদ্যাসাগর কোথা ?

মুখুয্যের কারচুপিতে | মুখ হইল ভোঁতা।

আস্‌বে রাজা রাজ্‌পরিষদ্ | লাট্ সাহেবের মেয়ে,

মার্‌বেল-মারা গিল্‌টি হলে | একবার দেখ চেয়ে।

("বাজিমাৎ", হেমচন্দ্র)

এখানেও দেখা যায়, পদান্তের হলন্ত অক্ষর কোথাও দীর্ঘ (যথা—'মুখুয্যের'

পদে 'যোর্'), কোথাও হ্রস্ব (যথা—'বিদ্যাসাগর' পদে 'গর্') হইতেছে ; পদ-মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর সেইরূপ কখনও হ্রস্ব, কখনও দীর্ঘ হইতেছে।

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি যে কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

ভারতীয় সঙ্গীতেও এই লক্ষণটি দেখা যায়। সঙ্গীতে গায়কের ইচ্ছামত যে কোন একটি অক্ষরের পরিমাণ সিকি মাত্রা হইতে চার মাত্রা পর্য্যন্ত হইতে পারে। সাধারণ কথাবার্ত্তায় মাত্রার এত বেশী পরিবর্ত্তন অবশ্য চলে না, তবু অর্দ্ধমাত্রা হইতে দুই মাত্রা, এমন কি, তিন মাত্রা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন প্রায়ই লক্ষিত হয়। উচ্চারণের এই পরিবর্ত্তনশীলতার সহিত বাংলা ছন্দের বিশেষ সম্পর্ক আছে।

বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্রের কয়েকটি অঙ্গের—বিশেষতঃ জিহ্বার—নমনীয়তা ইহার কারণ।

ইচ্ছামত যে কোন অক্ষরকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা বাঙালীর পক্ষে সহজ। প্রত্যেক অক্ষরকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করার প্রবৃত্তিই প্রবল, তবে পদান্তে যদি হলন্ত অক্ষর থাকে, সাধারণতঃ তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ হয় (যথা—'পাখী-সব করে রব,' 'রাখাল গরুর পাল' ইত্যাদি উদাহরণে 'সব্', 'রব্', '-খাল্', '-রুর্', 'পাল্' ইত্যাদি একাক্ষর হইলেও দুই মাত্রা হিসাবে পঠিত হয়)। কিন্তু আবশ্যক-মত পদান্তস্থ হলন্ত অক্ষরও হ্রস্ব করা হয়। উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্রের নমনীয়তার জন্য বাংলা উচ্চারণের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। বাঙালীর জিহ্বা ও বাগ্‌যন্ত্র অবলীলাক্রমে অবস্থান ও আকার পরিবর্ত্তন করে। সুতরাং প্রত্যেকটি স্বরের উচ্চারণের প্রয়াস বাংলা উচ্চারণের দিক্ দিয়া তত উল্লেখযোগ্য নহে। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় স্বরই উচ্চারণের দিক্ দিয়া বাক্যের প্রধানতম অঙ্গ, এবং ছন্দোরচনায় প্রত্যেকটি স্বরের ওজন এবং হিসাব ঠিক রাখিতে হয়। Inhumanity, Eternity ইত্যাদি শব্দের প্রত্যেকটি স্বরের হিসাব ছন্দের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং সেই জন্য পদ্যে Inhumanity শব্দটিকে পাঁচটি একস্বর শব্দের সমানরূপে ধরা হইয়া থাকে।

বাংলায় কিন্তু স্বরের সেরূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। Inhumanity আর what books can tell thee, ইহারা যে সমান ওজনের, তাহা বাংলা উচ্চারণের রীতিতে প্রতীত হয় না। কারণ, বাংলায় স্বর অন্যান্য বর্ণকে

ছাপাইয়া রাখে না। স্বরের উচ্চারণের চেষ্টাই বাক্যের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা নহে। খুব অল্প আয়াসে বাংলায় স্বরের উচ্চারণ হয় এবং অবলীলাক্রমে তাহার মাত্রা-বৃদ্ধি, মাত্রা-হ্রাস কিংবা তাহার উপর উচ্চারণের জোর ফেলা যাইতে পারে। অনেক সময়ে এত লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া হয়। যথা—

(১) ঝিকিমিকি দেখে সাধুর বোন, পক্ষীয়ে ছাড়ে রা।
আঙিনায় ছড়া দেয় না কেন বৌ, কুঁজি আস্তে তুলে গা

= ঝিক্ মিক্ দ্যাখে | সাধুর বোন্ | পক্ষীএ ছাড়ে | রা

আঙ্ নায়্ ছড়া | দ্যায় না ক্যান্ বৌ | (কুঁজি) আস্তে তুলে | গা

(২) তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে

= তো মার্ খ্যালায় | রাং রূ পো হয়্ | গোব্ রে শা লুক্ | ফো টে

পূর্ব্বে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অনেক জায়গায় এই রীতির দৃষ্টান্ত আছে; যেমন 'লাফিয়ে'—'লাফ্ য়ে'—'লাফ্যে', 'খলিয়ায়' = 'খল্ য়ায়্ = 'খল্যায়্'। এই ভাবেই 'করিতে' 'চলিতে' প্রভৃতি রূপের জায়গায় এখন 'কর্‌তে' 'চল্‌তে' ইত্যাদি দাঁড়াইয়াছে।

আর এক দিক্ দিয়া ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কোন একটি স্বরের উচ্চারণ করিলে বা না করিলে ছন্দের কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ হয় না। যেমন, 'এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক-ময়ী'— এই পংক্তির প্রথম 'কৌতুক' শব্দটির শেষ বর্ণটিকে হলন্ত-ভাবে বা অকারান্ত পড়িলে একই ছন্দ থাকে; পূর্ব্বের স্বর 'উ'কে দীর্ঘ ও শেষের 'ক'-বর্ণকে হসন্ত ভাবে পড়িয়া পংক্তির ঐ অংশটির মাত্রা পূরণ করিবার পরও একটু লঘুভাবে অন্ত্য অকারের উচ্চারণ করা যাইতে পারে [এ কি কৌতুক্ (অ)] তাহাতে কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, অক্ষরসংখ্যা বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়। অর্থাৎ স্বরের সংখ্যা বা স্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট গুণের উপর বাংলা ছন্দের প্রকৃতি

নির্ভর করে না। যদি করিত তাহা হইলে, উপর্য্যুক্ত উদাহরণে 'কৌতুক' শব্দকে একবার দ্বিস্বর এবং একবার ত্রিস্বর ধরার জন্য ছন্দের ইতর-বিশেষ হইত।

বাংলা ভাষার আদিম কাল হইতেই উচ্চারণের এতাদৃশ পরিবর্ত্তনীয়তা লক্ষিত হয়। বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার প্রাচীন নমুনা ও তদ্ভব প্রাকৃত ভাষার পার্থক্য বুঝিবার একটি প্রধান চিহ্ন এই। সংস্কৃত, তথা পালি এবং অন্যান্য প্রাকৃত ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য বাঁধা ধরা নিয়মের উপর নির্ভর করে, গদ্যে ও পদ্যে সর্ব্বত্রই তাহা বজায় থাকে। কিরূপে প্রাকৃত ভাষা হইতে ক্রমে আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হইল, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না; কিন্তু বাংলার ন্যায় আধুনিক ভাষার প্রাচীনতম অবস্থা হইতেই দেখা যায় যে, অক্ষরের মাত্রার কোন স্থির নিয়ম নাই। "বৌদ্ধ গান ও দোহা" হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—

ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গ ঢ ই
পারগামি লোঅ | নি ভ র ত র ই॥
টালত মোর ঘ র | নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি | নিতি আবেশী

উপরের শ্লোক দুইটির মাত্রা বিচার করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, পুরাতন মাত্রা-বিধি অচল হইয়া গিয়াছে, এবং পাঠকের ইচ্ছানুসারে যে কোন অক্ষরের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ চলিতেছে। শূন্যপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতেও তাহা প্রমাণ হয়,—

প শ্চি ম দু য়া রে | দা ন প তি বা অ
সো না র জাঙ্গালে | প থ বা অ

কিন্তু ইহা হইতে যেন কেহ এ ধারণা না করেন যে, বাংলা ছন্দে অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। নিয়ম আছে; অন্যত্র সে নিয়মের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতিতে কোনও অক্ষরের মাত্রার দিক্ দিয়া একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই, সুতরাং ছন্দের আবশ্যকমত মাত্রার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

ইহার কারণ বুঝিতে গেলে, বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা দরকার। বর্ত্তমানে বাঙালীদের আদিপুরুষের খবর ভাল করিয়া জানা নাই।

খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে যাঁহারা বাংলায় বাস করিতেন, তাঁহাদের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই। তবে তাঁহারা যে আর্য্য ছিলেন না এবং তাঁহাদের ভাষাও যে আর্য্য-ভাষা ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ী ও কোলদিগের ভাষার সহিত তাঁহাদের ভাষার নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে যখন আর্য্য-ভাষা বাংলায় প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিল, তখন নূতন নূতন আর্য্য কথার চল হইলেও আর্য্যাবর্ত্তের উচ্চারণ বাংলায় ঠিক চলিল না। কতক পরিমাণে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ চলিল বটে, কিন্তু বাঁধা-ধরা নিয়ম করা গেল না, ছন্দে খাঁটি দেশী রীতি অর্থাৎ সমান ওজনের শ্বাস-বিভাগের পুনরাবৃত্তি করার রীতি রহিয়া গেল।

(২খ)

ছেদ, যতি ও পর্ব্ব

কথা বলার সময়ে আমরা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না, ফুস্‌ফুসে বাতাস কমিয়া গেলেই ফুস্‌ফুসের সঙ্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে সেই সঙ্কোচনের জন্য কম বা বেশী আয়াস বোধ হয়। সেই জন্য কিছু সময় পরেই পুনশ্চ নিঃশ্বাস-গ্রহণের জন্য বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে। নিঃশ্বাস-গ্রহণের সময়ে শব্দোচ্চারণ করা যায় না। যখন উত্তেজক ভাবের জন্য ফুস্‌ফুসের পার্শ্ববর্ত্তী পেশীসমূহের সাময়িক উত্তেজনা ঘটে, তখন সঙ্কোচন-জনিত আয়াস কম বোধ হয়, এবং সেইজন্য তত শীঘ্র বিরতির আবশ্যক হয় না। এই কারণেই উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা বা কবিতায় বিরতি তত শীঘ্র শীঘ্র দেখা যায় না।

সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে এ রকম বিরতির নাম যতি ("যতির্বিচ্ছেদঃ")। আমরা ইহাকে 'বিচ্ছেদযতি' বা শুধু 'ছেদ' বলিব। কারণ বাংলায় আর এক রকমের যতির ব্যবহার আছে, এবং বাংলা ছন্দে সেই যতিরই প্রয়োজনীয়তা অধিক। সে সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে।

খানিকটা উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রত্যেক অংশ একটি পূর্ণ breath-group বা শ্বাস-বিভাগ, এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া breath-pause বা ছেদ আছে। ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রত্যেক sentence বা বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাসবিভাগ বা কয়েকটি শ্বাসবিভাগের সমষ্টি। বাক্যের শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, এবং ইহাকে major breath-pause অর্থাৎ পূর্ণচ্ছেদ বলা

যাইতে পারে। বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন phrase বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টির মধ্যে সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে minor breath-pause বা উপচ্ছেদ বলা যায়। প্রত্যেক শ্বাসবিভাগে কয়েকটি শব্দ থাকিতে পারে, কিন্তু উচ্চারণের সময়ে একই শ্বাসবিভাগের মধ্যে ধ্বনির গতি অবিরাম চলিতে থাকে।

পূর্ণচ্ছেদের সময়ে স্বর একটু দীর্ঘ কালের জন্য বিরতি লাভ করে। তখন নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়। ইহাকে শ্বাস-যতিও বলা যাইতে পারে। অধিকন্তু, যেখানেই ছেদ আছে সেখানেই অর্থের পূর্ণতা ঘটে বলিয়া, ইহাকে sense-pause বা ভাব-যতিও বলা যাইতে পারে। উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানে অর্থবাচক শব্দসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে; উপচ্ছেদ থাকার দরুণ বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, তাহা বুঝা যায়—একটি বাক্য অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্ :—

"রামগিরি হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত* প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া* মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে* জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে**, সেখান হইতে* কেবল বর্ষাকাল নহে*, চিরকালের মতো* আমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছি**।" ("মেঘদূত", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

উপরের বাক্যটিতে যেখানে একটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার সময়ে সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে; এইটুকু না থামিলে কোন্ শব্দের সহিত কোন্ শব্দের অন্বয়, ঠিক বুঝা যায় না। এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্যটি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। যেখানে দুইটি তারকা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ বুঝিতে হইবে; সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা হইয়াছে, বাক্যের শেষ হইয়াছে। এরূপ স্থলে উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়। কথার মধ্যে ছন্দোবন্ধের জন্য যে ঐক্যসূত্র আবশ্যক, ছেদের অবস্থানই অনেক সময়ে তাহা নির্দ্দেশ করে। সমপরিমিত কালানন্তরে অথবা কোন নক্সার আদর্শ অনুযায়ী কালানন্তরে ছেদের অবস্থান হইতেই অনেক সময়ে ছন্দোবোধ জন্মে। বাংলা পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি সাধারণ ছন্দে ছেদের অবস্থানই অনেক সময়ে ছন্দের বিভাগ নির্দ্দেশ করে। যেমন—

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল* | ঈশ্বরী পাটনী** ||
একা দেখি কুলবধূ* | কে বট আপনি** || ("অন্নদামঙ্গল", ভারতচন্দ্র)

গগন-ললাটে* | চূর্ণকায় মেঘ* |
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে** ||
কিরণ মাখিয়া* | পবনে উড়িয়া* |
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে** || ("আশাকানন", হেমচন্দ্র)

উপর্য্যুক্ত দুইটি দৃষ্টান্তে যে ভাবে অর্থবিভাগ, সেই ভাবেই ছন্দোবিভাগ হইয়াছে, উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান দিয়াই ছন্দোবোধ জন্মিতেছে।

কিন্তু অনেক সময়েই পদ্যে ছেদের অবস্থান দিয়া ছন্দের ঐক্যসূত্র নির্দ্দিষ্ট হয় না। যে পদ্যে ছেদের আবির্ভাবের কাল অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট, তাহা অত্যন্ত একঘেয়ে ও স্পন্দনহীন বোধ হয়, সুতরাং তাহাতে ভালরূপে মানসিক আবেগের দ্যোতনা হয় না। ইংরেজীতে Pope-এর Heroic Couplet এবং বাংলায় ভারতচন্দ্রের পয়ারে এই জন্য একটা বিরক্তিকর একটানা সুর অনুভূত হয়। যে পদ্যের ছন্দ সহজেই মনে কোনও বিশেষ ভাবের উদ্দীপনা করে, তাহাতে ছেদের অবস্থান অত নিয়মিত থাকে না। মাইকেল মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছেদের অবস্থানের যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে বলিয়া তাহাতে নানা বিচিত্র সুর অনুভূত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ছন্দের প্রাণ বৈচিত্র্যে, বৈচিত্র্য-হেতু আন্দোলনে, আবেগের সঞ্চারে। ঐক্যসূত্র ছন্দের কাঠাম, বৈচিত্র্য তাহার রূপ। যদি ছেদের অবস্থানের দ্বারা ছন্দের ঐক্যসূত্র সূচিত হয়, তবে বাক্যের অন্য কোন লক্ষণের দ্বারা বৈচিত্র্যের নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্বনির বিচ্ছেদই শ্রবণ ও মনকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অভিভূত করে, সুতরাং ছেদ যদি ঐক্যের বন্ধন আনিয়া দেয়, তবে বাক্যের অন্য কোনও লক্ষণের দ্বারা যেটুকু বৈচিত্র্য সূচিত হয়, তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই জন্য ভাবের তীব্রতা যে ছন্দে প্রবল, ছেদ সেখানে বৈচিত্র্যের উপাদান হইয়া থাকে।

কিন্তু ছেদ ছাড়াও বাক্যের অন্যান্য লক্ষণের দ্বারা ঐক্য সূচিত হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্চারণ-প্রণালীর পার্থক্য অনুসারে বাক্যের কোন একটি লক্ষণ ঐক্যের উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়। কোনও জাতির ভাষায় বাক্যের যে লক্ষণ বাগ্‌যন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রয়াসের উপর নির্ভর করে এবং সেই জাতির সমস্ত ব্যক্তির উচ্চারণেই লক্ষণটি পূর্ণভাবে বজায় থাকে, তাহাই ঐক্যের উপাদানীভূত হইতে পারে।

ইংরাজীতে কোনও কোনও অক্ষরের উচ্চারণের সময়ে স্বরের গাম্ভীর্য্য

বাড়িয়া যায়, তাহাকে accent-ওয়ালা অক্ষর বলা হয়। এই accent-এ অবস্থানই ইংরেজী ছন্দের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু বাংলায় কোনও অক্ষর-বিশেষের উচ্চারণে স্বর-গাম্ভীর্য্য-বৃদ্ধির স্বাভাবিক ও নিত্য রীতি নাই, অর্থাৎ বাংলা অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাতের এমন কোন স্থির রীতি নাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ছন্দের ঐক্যসূত্র রচনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জে. ডি. এণ্ডার্‌সন্, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বাংলা শব্দের প্রথমে একটু শ্বাসাঘাত পড়ে। এই জন্যই বাংলা শব্দের শেষের দিকের অক্ষরগুলিতে স্বর অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং বোধ হয় সেই কারণেই বাংলায় তৎসম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য 'অ'-কার প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। আর্য্যভাষা বাংলায় আসিবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে সমস্ত ভাষার প্রচলন ছিল, তাহাদের উচ্চারণ-প্রথা হইতে বোধ হয় এই রীতি আসিয়াছে। এখনকার সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষাতেও বোধ হয় অনুরূপ রীতি আছে।

কিন্তু বাংলা শব্দের প্রারম্ভে যেটুকু স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত পড়ে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়,—তাহা শ্রবণ ও মনকে আকৃষ্ট করে না। বাঙালীর জিহ্বা নমনীয় ও ক্ষিপ্র বলিয়া এক ঝোঁকে অনেকগুলি শব্দ আমরা উচ্চারণ করিয়া যাই, এবং সেই জন্য প্রত্যেক শব্দের অক্ষর-বিশেষের উপর বেশী করিয়া শ্বাসাঘাত দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছু দুরূহ। সমান ভাবে সব কয়টি অক্ষর পড়িয়া যাইবার প্রবৃত্তি আমাদের বেশী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, "গত কয় বৎসর বাঙালা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সবগুলিই পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণিভুক্ত" (প্রফুল্লচন্দ্র রায়)—এই রকম একটি বাক্য পাঠের সময়ে প্রত্যেক শব্দে উল্লেখযোগ্য শ্বাসাঘাত অনুভূত হয় না। কথিত ভাষায় যখন কোন একটি শব্দকে পৃথক্ ভাবে পড়া বা উচ্চারণ করা যায়, তখন শব্দের প্রারম্ভে একটু শ্বাসাঘাত পড়ে বটে, কিন্তু ইংরেজী শব্দে accent-ওয়ালা অক্ষরের যে রকম প্রাধান্য, বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষরের ধ্বনির দিক্ দিয়া সে রকম প্রাধান্য নয়। 'দেখ্‌বি', 'ভেতর' প্রভৃতি শব্দের প্রারম্ভে যে শ্বাসাঘাত হয়, dist´inctly, rem´ember প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের accent-ওয়ালা অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত তাহার চেয়ে ঢের বেশী।

বাংলা কথায় যে শ্বাসাঘাত স্পষ্ট অনুভূত হয়, তাহা শব্দ-গত নয়, শব্দসমষ্টি-গত। কয়েকটি শব্দে মিলিয়া যে অর্থবাচক বাক্যাংশ গড়িয়া উঠে, তাহারই

প্রথম দিকের কোন শব্দে স্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে। পূর্ব্বে "শ্রীকান্ত" হইতে যে অংশটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার বিভাগগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি বিভাগে বা প্রতি বাক্যাংশে মাত্র একটি শব্দের কোনও একটি অক্ষরের উপর সুস্পষ্ট জোর পড়িতেছে। যেমন—'এই ত চাই ; | কিন্তু আ ন্তে ভাই, | ব্যাটারা ভা রি পাজী | '। বাক্যাংশের মধ্যে অর্থের ও অবস্থানের দিক্ দিয়া প্রাধান্য পাইলে যে-কোনও শব্দে শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক ও নিত্য শ্বাসাঘাত প্রত্যেক শব্দে স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় না। প্রতি বাক্যাংশে যে শ্বাসাঘাত দেখা যায়, তদ্দ্বারা বাক্যের ছন্দোবিভাগ সহজে প্রতীত হয় এবং ছন্দতরঙ্গের শীর্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই শ্বাসাঘাত ছন্দোবিভাগের ও অর্থবিভাগের ফল, হেতু নহে ; সুতরাং শ্বাসাঘাত বাংলায় ছন্দোবিভাগের ঐক্যসূত্র নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

পরিমিত কালান্তরে বাগ্‌যন্ত্রে নূতন করিয়া শক্তির সঞ্চারই বাংলায় ছন্দোবিভাগের সূত্র।

বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্র খুব ক্ষিপ্র ও নমনীয় বটে, কিন্তু ইহার ক্লান্তিও শীঘ্র ঘটে। নিঃশ্বাস-গ্রহণের পর হইতে পরবর্ত্তী পূর্ণচ্ছেদ না আসা পর্য্যন্ত বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া এক রকম অনর্গল চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে অনেক অক্ষর উচ্চারিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বেই কিছু বিশ্রাম বা বিরামের আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে সমস্ত ভাষায় দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহার আছে, তাহাতে দীর্ঘ স্বর উচ্চারণের সময়ে জিহ্বা কিছু বিরাম পায় ; সুতরাং ভিন্ন করিয়া "জিহ্বেষ্টবিরামস্থান" নির্দ্দেশ করার দরকার হয় না। কিন্তু বাংলায় দীর্ঘস্বরের ব্যবহার খুবই কম, সুতরাং ছেদ ছাড়াও 'জিহ্বেষ্টবিরামস্থান' রাখিতে হয়। এক এক বারের ঝোঁকে জিহ্বা কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য এই বিরামের আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামের পর আবার এক ঝোঁকে পুনশ্চ কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ হয়। এই বিরামস্থলকে বিরামযতি বা শুধু 'যতি' নাম দেওয়া যাইতে পারে। যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি impulse বা ঝোঁকের শেষ এবং তাহার পরে আর একটি ঝোঁকের আরম্ভ।

আমরা ছেদ ও যতি, অর্থাৎ breath-pause বা বিচ্ছেদযতি ও metrical pause বা বিরামযতি এই দুইয়ের পার্থক্য দেখাইতেছি। সংস্কৃতে ছন্দঃশাস্ত্রে এ রকম পার্থক্য স্বীকৃত হয় না। সংস্কৃতে "যতির্জিহ্বেষ্টবিরামস্থানম্" এবং "যতির্বিচ্ছেদঃ" এই দুই রকম সংজ্ঞাই আছে। সংস্কৃত ছন্দোবিদ্‌দের ধারণা

ছিল যে, যখন ধ্বনির বিচ্ছেদ ঘটিবে, সেই সময়েই জিহ্বা বিরামলাভ করিবে এবং অন্য সময়ে জিহ্বার ক্রিয়া অবিরাম চলিবে। কিন্তু তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে, যখনই দীর্ঘস্বর উচ্চারিত হয়, তখনই জিহ্বা সামান্য কিছু বিরাম পায় এবং পায় বলিয়াই ২৮ মাত্রা বা ৩২ মাত্রার পর ছেদ বসাইলে চলিতে পারে।

যাহা হউক বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতি—এই দুই রকম বিভাগস্থল স্বীকার করিতে হইবে। ছেদ যেমন দুই রকম—উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ, যতিও সেইরূপ মাত্রাভেদে দুই রকম—অর্দ্ধযতি (বা হ্রস্বযতি) ও পূর্ণযতি। ক্ষুদ্রতম ছন্দোবিভাগগুলির পরে অর্দ্ধযতি এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগগুলির পরে পূর্ণযতি থাকে।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় ছেদ ও যতি এক সঙ্গেই পড়ে। উপচ্ছেদ ও অর্দ্ধযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি অবিকল মিলিয়া যায়। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এবং হেমচন্দ্রের 'আশাকানন' হইতে পূর্ব্বে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেখানে এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ ও যতির পরস্পর বিয়োগের জন্যই তাহার শক্তি ও বৈচিত্র্য এত অধিক। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছাড়াও অন্যত্র অনেক সময়ে ছেদ ও যতি ঠিক ঠিক মিলিয়া যায় না; অথবা পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি মিলিলেও উপচ্ছেদ ও অর্দ্ধযতি মেলে না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

(*, ** এই সঙ্কেত দ্বারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং |, || এই সঙ্কেত দ্বারা অর্দ্ধযতি ও পূর্ণযতি নির্দ্দেশ করিতেছি।)

(১) কৈলাস শিখর* | অতি মনোহর* | কোটি শশী পর | কাশ ** ||
গন্ধর্ব্ব কিন্নর * | যক্ষ বিদ্যাধর* | অপ্সরাগণের | বাস ** ||

(২) আর—ভাষাটাও তা | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না * রয় | খাড়া ** ||
আর—ভাবের মাথায় | লাঠি মারলেও * | দেয় না কো সে | সাড়া, ** ||
সে - হাজারি পা | দুলাই, * গোঁফে | হাজারি দিই | চাড়া ; ** |

—('হাসির গান', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

(৩) একাকিনী শোকাকুলা | অশোক কাননে ||
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা * | আঁধার কুটীরে ||
নীরবে। ** দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়া ||
ফেরে দূরে, * মত্ত সবে | উৎসব-কৌতুকে || **

—('মেঘনাদবধ কাব্য', ৪র্থ সর্গ, মধুসূদন

(৪) এই | প্রেমগীতিহার * ||
গাঁথা হয় নরনারী | মিলন মেলায় ** ||
কেহ দেয় তাঁরে, * কেহ | বঁধুর গলায় ** ||

—('বৈষ্ণব কবিতা', রবীন্দ্রনাথ)

যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের ঐক্যবোধ জন্মে। পরিমিত কালানন্তরে কোন নক্সার আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই। কিন্তু ছেদ সময়ে সময়ে বিচিত্রভাবে ছন্দোবিভাগের মাঝে মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা স্রোতের স্থানে বিচিত্র আন্দোলন সৃষ্টি করে। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ না হয়, তখন যতিপতনের সময়ে ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে; শুধু জিহ্বার ক্রিয়া থাকে না, এবং স্বর একটা drawl বা দীর্ঘ টানে পর্য্যবসিত হয়। আবার জিহ্বা যখন impulse বা ঝোঁকের বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়া থাকে; তখন মুহূর্ত্তের জন্য ধ্বনি স্তব্ধ হয়, কিন্তু জিহ্বা বিশ্রাম গ্রহণ করে না, ঝোঁকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবার নূতন ঝোঁকের আরম্ভ হয় না। ছেদ sense বা অর্থ অনুসারে পড়ে; সুতরাং ইহা দ্বারা পদ্য অর্থানুযায়ী অংশে বিভক্ত হয়। বাগ্‌যন্ত্রের সামর্থ্যানুসারে যতি পড়ে। ইহার দ্বারা পদ্য পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক ছন্দোবিভাগ বাগ্‌যন্ত্রের এক এক বারের ঝোঁকের মাত্রানুসারে হইয়া থাকে। এক এক ঝোঁকে পরিমিত মাত্রার শ্বাস ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হয়। এই ঝোঁকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের ঐক্যের লক্ষণ।

কেহ কেহ বলেন যে, পরিমিত কালানন্তরে শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর থাকাতেই ছন্দোবিভাগের বোধ জন্মে। কিন্তু এ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অবশ্য যে শব্দ কয়টি লইয়া এক একটি ছন্দোবিভাগ গঠিত হয়, মিলিত ভাবে তাহাদের অনেক সময়ে একটি sense-group বা অর্থবাচক বাক্যাংশ বলা যাইতে পারে, সুতরাং সেই শব্দসমষ্টির প্রথমে একটি শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে। সুতরাং সময়ে সময়ে মনে হইতে পারে যে, শ্বাসাঘাতের অবস্থান হইতেই ছন্দোবিভাগ সূচিত হইতেছে। যথা,—

(১) র্‌াত পোহাল | ফ'র্সা হল | ফু'ট্‌ল কত | ফু'ল—(দীনবন্ধু)

(২) ব'উমা! বউমা! | ঘু'মাও না আর ॥
উ'ঠ অভাগিনি! | দে'খ একবার ॥—("চৈতন্য সন্ন্যাস", শিবনাথ শাস্ত্রী)

কিন্তু সব সময়েই এ রকম হয় না। অনেক সময়েই ছন্দোবিভাগের শব্দ কয়টি লইয়া কোন অর্থবাচক বাক্যাংশই হয় না; অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের ঠিক ঠিক মিল হয় না। পূর্ব্বে 'হাসির গান' হইতে যে কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের কোন মিল নাই। অধিকন্তু বাক্যাংশের ঠিক প্রথম অক্ষরেও সব সময়ে শ্বাসাঘাত পড়ে না। সর্ব্বনাম,

অব্যয়, ক্রিয়াবিভক্তি ইত্যাদি দিয়া কোন বাক্যাংশ আরম্ভ হইলে, তাহাদের বাদ দিয়া পরবর্ত্তী কোন শব্দে শ্বাসাঘাত পড়ে। অর্থগৌরব অনুসারে বাক্যাংশের শব্দবিশেষে শ্বাসাঘাত পড়াই রীতি। পরন্তু পদ্যের চরণে একেবারে শ্বাসাঘাত-হীন একটি ছন্দোবিভাগ অনেক সময়ে থাকে, যেমন সঙ্গীতের তালবিভাগে শ্বাসাঘাত-হীন একটি অঙ্গ (খালি বা ফাঁক) সময়ে সময়ে থাকে। শ্বাসাঘাত-যুক্ত শব্দে যুক্তবর্ণ থাকিলে শব্দের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত না পড়িয়া যুক্তবর্ণের পূর্ব্ব অক্ষরে পড়িয়া থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

(১) এ যে স´ঙ্গীত | কো´থা হ'তে উঠে
এ যে লাব´ণ্য | কো´থা হ'তে ফুটে
এ যে ক্র´ন্দন | কো´থা হ'তে টুটে
অ´ন্তর বিদা | র°ণ

(২) শু´ধু বিঘে দুই | ছি´ল মোর ভুঁ´ই, | আ°র সবি গেছে | ঋ´ণে
বা´বু কহিলেন, | "বু´ঝেছ উপেন, | এ° জমি লইব | কি´নে"
"ক°হিলাম আমি | "তুমি ভূ´স্বামী | ভূমির অ´ন্ত | না´ ই

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, শ্বাসাঘাতের অবস্থান দিয়া ছন্দোবিভাগের সূত্র নির্দ্দিষ্ট হয় না।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। বাংলার এক একটি ছন্দোবিভাগ সংস্কৃতের 'পাদ' বা ইংরেজীর foot নয়। সংস্কৃত ছন্দের পাদ মানে একটি শ্লোকের চতুর্থাংশ। তাহার মধ্যে কয়েকটি গণ, একাধিক ছেদ, এবং প্রতি গণে দীর্ঘস্বরের সমাবেশ অনুসারে বিরামস্থল থাকিতে পারে। ইংরেজীতে foot মানে accent অনুসারে অক্ষর-বিন্যাসের একটি আদর্শ মাত্র। ইংরেজীতে foot-এর শেষে কোনরূপ যতি বা বিরাম থাকার আবশ্যকতা নাই, শব্দের মধ্যে যেখানে কোনরূপ বিরামের অবকাশ নাই সেখানেও foot-এর শেষ হইতে পারে। বাংলা ছন্দের এক একটি বিভাগ এইরূপ একটি আদর্শ মাত্র নহে। ইংরেজী foot ও বাংলা ছন্দোবিভাগ এক মনে করার দরুণ অনেক সময়ে দারুণ ভ্রমে পতিত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা 'বাংলায় ইংরাজি ছন্দ' শীর্ষক অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে তালের হিসাবে যাহাকে 'বিভাগ' বলা হয়, তাহার

সহিত ছন্দোবিভাগের মিল আছে। সংস্কৃতে যাহাকে 'পর্ব্বন্' বলা যায়, তাহাই বাংলা ছন্দোবিভাগের অনুরূপ। এই গ্রন্থে **পর্ব্ব** শব্দের দ্বারা ছন্দোবিভাগ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পরিমিত মাত্রার পর্ব্ব দিয়া বাংলা ছন্দ গঠিত হয়। এক এক বারের ঝোঁকে ক্লান্তি-বোধ বা বিরামের আবশ্যকতার বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহার নাম পর্ব্ব। পর্ব্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ।

(২গ)

পর্ব্বাঙ্গ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অক্ষর-সংখ্যা বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়। সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষরের যেরূপ মর্য্যাদা, বাংলায় তদ্রূপ নহে। সাধারণতঃ পাশ্চাত্ত্য ছন্দঃশাস্ত্রের লেখকগণের মতে অক্ষর-ই ছন্দের অণু। কিন্তু অন্ততঃ একজন পাশ্চাত্ত্য ছন্দঃশাস্ত্রকারের (Aristotle-এর শিষ্য Aristoxemus-এর) মত যে, পরিমিত কালবিভাগ অনুসারেই ছন্দোবন্ধ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমস্ত ভাষার ছন্দঃ সম্বন্ধে অবশ্য এ মত সত্য না হইতে পারে, কিন্তু Aristoxemus সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীক্ ও তৎসাময়িক প্রাচ্য ভাষায় প্রচলিত ছন্দের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, বাংলায় গদ্য বা পদ্য পাঠের সময়ে প্রত্যেকটি অক্ষর বা তাহাদের কোন বিশেষ ধর্ম্মের তারতম্য ততটা মনোযোগ আকৃষ্ট করে না বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্রের বা বাঙালীর উচ্চারণের লঘুতা বা তদ্রূপ অন্য কোন গুণের জন্য হয় তো এরূপ হইতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, শব্দ ও তাহার মাত্রাই আমাদের কানে স্পষ্ট ধরা দেয়, অক্ষরবিশেষ বা তাহার অন্য কোন ধর্ম্ম গদ্যে বা পদ্যে কোথাও তেমন স্পষ্টরূপে ধরা দেয় না। অক্ষর নয়,— পূরা শব্দই আমাদের ছন্দের মূল উপাদান এবং উচ্চারণের ভিত্তিস্থানীয়।

বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম হইতেও বাংলা ভাষার এই লক্ষণটি বোঝা যায়। বাংলায় শব্দ হইতে inflexion বা পদ-সাধনের সময়ে প্রায়শঃ শব্দের সঙ্গে আর একটি শব্দ জুড়িয়া দেওয়া হয়। একবচন হইতে বহুবচন সাধনের জন্য, নানা কারক, নানা ল-কার, কৃৎ, তদ্ধিত ইত্যাদির জন্য শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয়সূচক অন্য শব্দ যোগ করাই বিধি; সংস্কৃতের ন্যায় মাত্র আক্ষরিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা বাংলায় এ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এ দিক্ দিয়া suffix-

agglutinating বা 'প্রত্যয়-বাচক শব্দ-সংযোগময়' ভাষাবর্গের সহিত বাংলার ঐক্য আছে।

বাংলার আর একটি রীতি—প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা। বাংলায় দুই সন্নিকটবর্ত্তী অক্ষরের সন্ধি করিয়া একটি অক্ষর-সাধনের প্রথা চলিত নাই। কেবলমাত্র তৎসম শব্দের মধ্যেই এরূপ সন্ধি চলিতে পারে। সমাসবদ্ধ হইলেও বাংলা শব্দের মধ্যে এ ধরণের সন্ধি চলে না ; 'কচু', 'আলু', 'আদা' এই তিনটি শব্দ সমাসবদ্ধ করিলেও 'কচ্বাদা' হইবে না। সেই রকম 'ভেসে-আসা', 'আলো-আঁধার' ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ হইলেও সেখানেও দুই অক্ষরের সন্ধি করিয়া এক অক্ষর করা হয় নাই, পদের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি শব্দ অযুক্ত আছে। এমন কি তৎসম শব্দকেও খাঁটি বাংলা রীতিতে ব্যবহার করিলে তাহাদেরও সমাসের মধ্যে অযুক্ত রাখা চলে। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'য় 'স্নেহ-অশ্রু', 'বিচার-আগার' ইত্যাদি সমাস ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে গেলে বাংলা ভাষার এই রীতিগুলি মনে রাখা একান্ত দরকার। বাংলা ছন্দের এক একটি পর্ব্বকে কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মনে না করিয়া কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মনে করিতে হইবে। নতুবা বাংলা ছন্দের মূল সূত্রগুলি ঠিক বুঝা যাইবে না। 'এ কথা জানিতে তুমি' এই পর্ব্বটির মধ্যে ৮টি অক্ষর আছে শুধু তাহাই লক্ষ্য করিলে চলিবে না ; ইহা যে 'এ কথা', 'জানিতে', 'তুমি' এই তিনটি পদের সমষ্টি,—তাহাও হিসাব না করিলে বাংলা ছন্দের অনেক তথ্য ধরা যাইবে না।

সাধারণতঃ বাংলা শব্দ দুই বা তিন মাত্রার, কখন কখন এক বা চার মাত্রারও হয়। সমাসবদ্ধ বা বিভক্তিযুক্ত হইলে অবশ্য শব্দ ইহার চেয়ে বড় হইতে পারে, কিন্তু মূল বাংলা শব্দ ইহার চেয়ে বড় হয় না। চার মাত্রার চেয়ে বড় কোনও শব্দ ব্যবহৃত হইলে উচ্চারণের সময়ে স্বতঃই তাহাকে ভাঙিয়া ছোট করিয়া লওয়া হয়। বাংলা উচ্চারণের এই আর একটি উল্লেখযোগ্য রীতি, এবং ইহার সহিত বাংলা ছন্দের রীতির বিশেষ সম্পর্ক আছে। 'পারাবার' শব্দটি চার মাত্রার, কিন্তু 'পারাবারের' শব্দটি পাঁচ মাত্রার, এ জন্য উচ্চারণের সময়ে ইহাকে স্বতঃই 'পারা—বারের' এই ভাবে ভাঙিয়া পড়া হয়। 'চাহিয়াছিল' শব্দটিকে 'চাহিয়া—ছিল' এই ভাবে উচ্চারণ করা হয়।

পর্ব্বের মধ্যে যে কয়টি মূল শব্দ (বা সমুচ্চার্য্য শব্দাংশ) থাকে, তাহারা প্রত্যেকে স্বয়ং বা অপর দু'একটি শব্দের সহযোগে Beat বা পর্ব্বের উপবিভাগ

বা অঙ্গ গঠিত করে। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টি, বাংলা ছন্দে তেমনি প্রত্যেকটি পর্ব্ব কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টি। 'বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায়' এই পংক্তিটির মধ্যে দুইটি পর্ব্ব আছে—'বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে' ও 'ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায়।' প্রথম পর্ব্বটি 'বিদ্যুৎ', 'বিদীর্ণ', 'শূন্য' এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি ; দ্বিতীয় পর্ব্বটি 'ঝাঁকে ঝাঁকে', 'উড়ে চ'লে', 'যায়' এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি। প্রত্যেকটি অঙ্গের প্রারম্ভে স্বরের intensity বা গাম্ভীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অঙ্গের শেষে গাম্ভীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা কম। কখন কখন প্রারম্ভে স্বরের গাম্ভীর্য্য কম হইয়া শেষের দিকে বেশী হয়, এই ভাবে স্বর-গাম্ভীর্য্যের উত্থান-পতন অনুসারে অঙ্গবিভাগ বোঝা যায়। এই অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে এক একটি অর্থবিভাগের কোন একটি বিশেষ অক্ষরের উপর যে শ্বাসাঘাতের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই স্বর-গাম্ভীর্য্যের ঐক্য নাই। এই স্বরগাম্ভীর্য্যের সে রকম কোন বিশেষ জোর নাই, ভালরূপে লক্ষ্য না করিলে ইহা ধরা যায় না। কিন্তু এই ভাবে অঙ্গবিভাগ হইতেই কবিতার পর্ব্বে ছন্দোলক্ষণ প্রকাশ পায়, পর্ব্বের মধ্যে স্পন্দন বা দোলন অনুভূত হয়। বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট নিয়মানুসারে পর্ব্বাঙ্গগুলি না সাজাইলে ছন্দঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পর্ব্বাঙ্গগুলিকে বাংলা ছন্দের উপকরণ বলা যায় না—কারণ ইহাদের সমত্ব হইতে ছন্দের ঐক্যবোধ জন্মে না। পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গের মাত্রা ইত্যাদি লক্ষণ পৃথক্ হইতে পারে, এবং তজ্জন্য পর্ব্বের মধ্যেই কতকটা বৈচিত্র্যের বোধ হয়।

বাংলা ছন্দের রীতি—যতদূর সম্ভব এক একটি শব্দ সম্পূর্ণভাবে কোন একটি অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অঙ্গ চার মাত্রার চেয়ে বড় হয় না সুতরাং চার-মাত্রার চেয়ে বড় শব্দ ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দিতে হয় ; কিন্তু যদি সম্ভব হয়, শব্দের মূলধাতু না ভাঙ্গিয়া একই অঙ্গের মধ্যে রাখিতে হইবে। আর সময়ে সময়ে যেখানে ছন্দোবন্ধের সূত্র অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট—বিশেষতঃ যে রকম ছন্দে শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য খুব বেশী—সেখানে ছন্দের খাতিরে এই রীতির ব্যত্যয় করা যাইতে পারে।

(৩)

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি

অক্ষরের কোন না কোন এক বিশেষ ধর্ম্মের উপর কোন এক বিশেষ ছন্দঃ-পদ্ধতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজী ছন্দ মূলতঃ accentএর সহিত সংশ্লিষ্ট

উৎকৃষ্ট ইংরেজী কবিতায় অবশ্য অক্ষরের দৈর্ঘ্য ও 'রঙ' (tone-colour) ইত্যাদিও ছন্দঃ-সৌন্দর্য্যের সহায়তা করে কিন্তু accent-এর অবস্থানই ইংরেজী ছন্দে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি বহু ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য অথবা মাত্রা অনুসারেই ছন্দোরচনা হইয়া থাকে। স্বরাঘাত ইত্যাদি যে বাংলা ছন্দে নাই এমন নহে, কিন্তু ছন্দের ভিত্তি—মাত্রা, স্বরাঘাত বা অন্য কিছু নহে।

মাত্রানুসারী ছন্দের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি হইতে পারে। সংস্কৃতের বৃত্তচ্ছন্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সাজাইবার বৈচিত্র্যের উপর ছন্দের উপলব্ধি নির্ভর করে। 'ছা য়া প থে নে ব শ রৎ প্র স ন্নম্' 'যা সৃ ষ্টিঃ স্র ষ্টু রা দ্যা ব হ তি বি ধি হু তং যা হ বি র্যা চ হো ত্রী' ইত্যাদি চরণে হ্রস্বের পর হ্রস্ব বা দীর্ঘ এবং দীর্ঘের পর দীর্ঘ বা হ্রস্ব অক্ষর থাকার জন্য প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের বিচিত্র সমাবেশ হেতু নানাভাবে ভাবের বিচিত্র বিলাস অনুভূত হয়। ছন্দের হিসাবে সেখানে প্রতি অক্ষরটির মাত্রা ভাব উৎপাদনের সহায়তা করে, এবং স্পন্দন-বৈচিত্র্য আনাই সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। সেখানে ঐক্যবোধ জন্মে প্রতি পাদে অক্ষরের সংখ্যা হইতে। ঐক্যসূত্র সেখানে প্রধান নহে, বৈচিত্র্যই সেখানে প্রধান।

বাংলা ছন্দ কিন্তু মাত্রাসমক-জাতীয়; অর্থাৎ ইহার প্রত্যেকটি বিভাগে মোটমাট একটা পরিমিত মাত্রা থাকা দরকার। চরণের, পর্ব্বের, ও পর্ব্বাঙ্গের মাত্রাসমষ্টি লইয়াই বাংলায় ছন্দোবিচার। বাংলা ছন্দে সাধারণতঃ বৈচিত্র্য অপেক্ষা ঐক্যের প্রাধান্যই অধিক। পরিমিত মাত্রার ছন্দোবিভাগগুলিকে উপকরণরূপে ব্যবহার করার উপরই ছন্দোবোধ নির্ভর করে। প্রত্যেকটি বিশেষ অক্ষরের মাত্রা বা কোন একটি ছন্দোবিভাগের মধ্যে তাহাদের সমাবেশের পদ্ধতি বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নহে। বাংলা ছন্দে যে সমস্ত জায়গায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, সেখানেও দেখা যাইবে যে, হ্রস্ব ও দীর্ঘের পারম্পর্য্য হইতে ছন্দোবোধ আসিতেছে না। যেমন—

হোথায় কি : আছে | আলয় : তোমার =(৪+২)+(৩+৩)
ঊর্ম্মি : মুখর | সাগরের : পার =(৩+৩)+(৪+২)
মেঘ : চুম্বিত | অস্ত : গিরির =(২+৪)+(৩+৩)
চরণ : তলে ? =(৩+২)

এই কয় পংক্তিতে হ্রস্ব অক্ষরের সহিত দীর্ঘ অক্ষরের সুন্দর সমাবেশ হইলেও প্রতি পর্ব্বে ছয়টি করিয়া মাত্রা থাকার জন্যই ছন্দের উপলব্ধি হইতেছে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ-জনিত বৈচিত্র্যের জন্য নহে।

অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং উত্তর ভারতীয় সমস্ত তদ্ভব ভাষায় ছন্দের এই প্রধান লক্ষণ। ছন্দের এক একটি বিভাগের শব্দ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তদনুসারেই ছন্দোরচনা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উচ্চারণের এক এক ঝোঁকে যে পরিমাণ শ্বাস ত্যাগ হয়, তাহাই উচ্চারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। ইহাতে ফুস্‌ফুসের দুর্ব্বলতা ও বাগ্‌যন্ত্রের শীঘ্র ক্লান্তি প্রভৃতি কয়েকটি জাতীয় লক্ষণ সূচিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে ভারতীয় জাতিতত্ত্বের কোন দুরূহ সূত্র লুক্কায়িত আছে। আর্য্যেরা ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের উচ্চারণ-পদ্ধতি ও ছন্দের প্রকৃতি একরূপ ছিল; কিন্তু তাঁহারা ভারতে আসার পর তাঁহাদের ভাষা অনার্য্যভাবিত হইতে লাগিল। অনার্য্যের বাগ্‌যন্ত্রের লক্ষণ ও উচ্চারণ-রীতি অনুসারে আর্য্য ভাষা ও তদ্ভব ভাষাতে উচ্চারণ ও ছন্দের পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ছন্দের রাজ্যে 'পরের সোনা কানে দেওয়া' চলে না, এক-এক জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর ইহার রীতি নির্ভর করে। যাহা হউক, বাঙ্গালীর পক্ষে ঝোঁকে ঝোঁকে প্রশ্বাসত্যাগই উচ্চারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনবলীল ব্যাপার, সুতরাং ইহাকেই ভিত্তি করিয়া বাংলায় ছন্দোরচনা হইয়া থাকে। জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর পেশীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ ইত্যাদির দ্বারা অক্ষরের উচ্চারণ বাঙালীর পক্ষে অত্যন্ত অবলীলায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং অক্ষরের ক্রম বা নানা রকমের অক্ষরের বিচিত্র সমাবেশ ছন্দের পক্ষে তেমন প্রধান নহে। প্রশ্বাসের ঝোঁকের মাত্রাই বাঙালীর কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

Symmetry বা প্রতিসমতা বাংলা ছন্দের আর একটি প্রধান গুণ। বাংলায় ছন্দের আদর্শ—জোড়ায় জোড়ায় ছন্দোবিভাগগুলিকে সাজান। এই জন্য দুই বা দুইয়ের গুণিতক চার—এই সংখ্যাগুলিরই ছন্দ-গঠনে অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের কালবিভাগেও এই রীতি দেখা যায়; প্রতি আবর্ত্তে বিভাগের সংখ্যা এবং প্রতি বিভাগে অঙ্গের সংখ্যা সাধারণতঃ দুই কিংবা চার হইয়া থাকে। বাংলা কবিতার প্রতি চরণেও দুই বা চার পর্ব্ব থাকে। প্রাচীন সমস্ত ছন্দেরই এই লক্ষণ। আপাততঃ ত্রিপদী ছন্দকে অন্যবিধ মনে হইতে পারে, কিন্তু আসলে ত্রিপদী চৌপদীরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ত্রিপদীর শেষ

পর্ব্বটি অপর দুইটি পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে ; লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই তৃতীয় পর্ব্বটি প্রথম দুই পর্ব্বের সমান একটি বিভাগ এবং অতিরিক্ত একটি ক্ষুদ্রতর বিভাগের সমষ্টি। এই ক্ষুদ্রতর বিভাগটি চতুর্থ একটি পর্ব্বের প্রচ্ছন্ন প্রতিনিধি। যাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, লঘু ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে অতি সহজেই একতালায় এবং দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে সহজেই কাওয়ালী-জাতীয় তালে গাওয়া যাইতে পারে। একতালা ও কাওয়ালী, উভয় তালেই প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া অঙ্গ থাকে। সুতরাং ইহা হইতেও ত্রিপদী ছন্দের গূঢ় তত্ত্বটি বোঝা যায়। প্রায় সমস্ত বাংলা কবিতা, ছড়া, পদাবলী, গীত ইত্যাদিতে ছন্দের প্রতিসমতা লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক বাংলা কাব্যে অবশ্য প্রতিসমতার আধিপত্য তত বেশী দেখা যায় না। নানা ভাবে লেখকগণ প্রতিসমতার স্থলে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের লক্ষ্য—বিভিন্ন প্রকারের আবেগের দ্যোতনা, এবং সেই জন্য তাঁহারা আবেগসূচক বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের রচিত ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রতিসমতা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় হইয়া আছে। যেমন নূতন ধরণের ত্রিপদীতে অনেক সময়ে তৃতীয় পর্ব্বটি প্রথম দুইটি পর্ব্ব অপেক্ষা ছোট হইয়া থাকে, সুতরাং এ ধরণের ত্রিপদীকে প্রচ্ছন্ন চৌপদী বলা যায় না এবং তজ্জন্য এখানে প্রতিসমতা নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, এই সব স্থলে ত্রিপদী দ্বিপদীরই রূপান্তর মাত্র, তৃতীয় পর্ব্বটি অতিরিক্ত (hypermetric) পদ মাত্র। উদাহরণ-স্বরূপে দেখান যাইতে পারে যে,

> নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন এক মনে
> জপিছেন নাম।
> হেন কালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
> করিল প্রণাম॥

এই সব স্থলে চরণের তৃতীয় পর্ব্বটি যেন প্রথম দুই পর্ব্ব হইতে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন এবং প্রথম দুই পর্ব্বের ছন্দঃপ্রবাহের পর সম্পূর্ণ বিরাম আসিবার পূর্ব্বে বাগ্‌যন্ত্রের প্রতিক্রিয়াজনিত একরূপ প্রতিধ্বনি। ইংরেজীতে

> Whe're the qu'iet co'loured end' of ‖ even'ing smiles',
> Miles' and m'iles

On' the so'lita'ry pas'tures || wh'ere our she'ep

Ha'lf-asle'ep

প্রভৃতি কবিতায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি যেরূপ প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষ পর্ব্বের প্রতিধ্বনি, এখানেও প্রায় তদ্রূপ।

এতদ্ভিন্ন বাংলা blank verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 'বলাকা' প্রভৃতি কবিতার তথাকথিত free verse বা মুক্তবন্ধ ছন্দে প্রতিসমতা ত্যাগ করিয়া ভাবানুরূপ আদর্শে ছন্দ গঠন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদের অবস্থান-বৈচিত্র্য এবং অতিরিক্ত পদের সমাবেশ ইত্যাদি কারণে বৈচিত্র্যের ভাব অধিক অনুভূত হইলেও, ছন্দের আসল কাঠামটিতে প্রতিসমতা আছে, অর্থাৎ যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া প্রতিসমতা আছে। যথা,—

নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা ||
রে দূত !** অমরবৃন্দ | যার ভুজবলে ||
কাতর, * সে ধনুর্দ্ধরে | রাঘব ভিখারী ||
বধিল সম্মুখ রণে ? **

এই কয় পংক্তিতে ছেদের অবস্থানে বৈচিত্র্য থাকিলেও যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া প্রতিসমতা আছে।

প্রায় সকল প্রকারের সুকুমার কলায় প্রতিসমতার প্রভাব দেখা যায়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য হইতে নৃত্যকলায় পর্য্যন্ত ইহা লক্ষিত হয়; মানবদেহের সমযুগ্মভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থানের দরুনই বোধ হয়, ছন্দঃসৃষ্টিতে প্রতিসমতার এত প্রভাব। যাহা হউক, সব ভাষার কবিতাতেই ইহা দেখা যায়। প্রাচীন ইংরেজী কবিতার প্রত্যেক চরণ দুই ভাগে বিভক্ত হইত, আধুনিক ইংরেজীতেও সাধারণতঃ প্রতি চরণের মাঝে একটি করিয়া caesura থাকে। সংস্কৃতে 'পদ্যং চতুষ্পদী' এই সংজ্ঞা হইতেই প্রতিসমতার প্রভাব বুঝা যায়। কিন্তু বাংলার ছন্দ ও অন্যান্য ভাষার ছন্দে প্রকৃতিগত পার্থক্য এই যে, বাংলায় প্রতিসমতাবোধ ছন্দোবোধের মূল উপাদান। যতক্ষণ না দুইটি বিভাগের প্রতিসমতার উপলব্ধি হয়, ততক্ষণ বাংলায় ছন্দের ছন্দোগুণ প্রতীত হয় না। শুধু 'রাত পোহাল' বলিলে কোনরূপ ছন্দোবোধ হয় না, 'রাত পোহাল ফর্সা হ'ল' যতক্ষণ না বলা হয়, ততক্ষণ কোনভাবে ছন্দের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু ইংরেজীতে accent-যুক্ত এবং accent-হীন syllable-এর

সমাবেশ হইতেই ছন্দোবোধ আসে ; অর্থাৎ বিশেষ স্পন্দন-ধর্ম্মবিশিষ্ট এক একটি foot-এর অস্তিত্ব বা accent-এর অবস্থান হইতেই ছন্দোবোধ আসে। When the hounds | of spring || are on win | ter's tra | ces—এই চরণটির মাঝখানে একটি caesura থাকিয়া ইহাকে দুইটি প্রতিসম অংশে ভাগ করিতেছে, কিন্তু ছন্দোবোধের জন্য সমস্ত চরণটি পড়া দরকার হয় না। When the hounds of spring বলিলেই accent-এর অবস্থান-হেতু ধ্বনিপ্রবাহে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ছন্দের বোধ জন্মে। সংস্কৃতেও স্রগ্ধরা, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দের এক একটি পাদ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই নানাবিধ গণের সমাবেশ-রীতিতে দীর্ঘ ও হ্রস্ব অক্ষরের বিচিত্র পারম্পর্য্য হইতেই ছন্দোবোধ জন্মায়, বিশেষ এক ধরণের ভাব জমিয়া উঠে। এই সমস্ত ছন্দ ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর আলাপের অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

এই ধরণের rhythmic variety বা স্পন্দন-বৈচিত্র্য যে বাংলায় একেবারে হয় না, তাহা নয়। তবে তাহা অক্ষরগত নহে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ-বৈচিত্র্যের জন্য তাহা সমুদ্ভূত নহে। কারণ, বাংলায় উচ্চারণ-পদ্ধতি যেরূপ, তাহাতে সমস্ত অক্ষরই প্রায় এক রকমের, এক ওজনের বলিয়া বোধ হয়। ইংরেজীতে accented ও unaccented এবং সংস্কৃতে দীর্ঘ ও হ্রস্ব যেরূপ দুই বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না।

এইখানে এ সম্বন্ধে একটি মত আলোচনা করা আবশ্যক। আধুনিক বাংলার মাত্রিক ছন্দের মধ্যে সংস্কৃতানুরূপ স্পন্দন-বৈচিত্র্য আনা যাইতে পারে এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন ; কারণ, বাংলা মাত্রিক ছন্দেও দুই মাত্রার অক্ষরের বহুল ব্যবহার আছে। এ রীতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ লওয়া যাক্—

হঠাৎ কখন্ | সন্ধ্যে-বেলায়
নাম-হারা ফুল | গন্ধ এলায়,
প্রভাত বেলায় | হেলাভরে করে
অরুণ কিরণে | তুচ্ছ
উ দ্ধ ত য ত | শাখার শিখরে
রডোডেনড্রন্ | গুচ্ছ।

আপাততঃ মনে হইবে যে, এখানে যখন এতগুলি দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে, তখন বাংলায় হ্রস্ব ও দীর্ঘের সমাবেশ-বৈচিত্র্য এবং সংস্কৃতের অনুরূপ ছন্দ আনা যাইবে না কেন? কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে কোন পর্ব্বাঙ্গেই উপর্য্যুপরি দুইটি দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার নাই, সুতরাং সংস্কৃতে পর পর অনেকগুলি দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহারের জন্য যে মন্থর গম্ভীর উদাত্ত ভাব জমিয়া উঠে এবং মধ্যে মধ্যে হ্রস্ব অক্ষরের ব্যবহারের জন্য ধ্বনি-প্রবাহ দ্রুতবেগে চলিয়া, আবার দীর্ঘ অক্ষরের গায়ে প্রতিহত হইয়া যেরূপ উচ্ছলিত হইতে থাকে, বাংলায় তাহার অনুকরণ করা এক রকম অসম্ভব; কারণ, বাংলায় দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার কম, এবং একই শব্দের মধ্যে বা একই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে উপর্য্যুপরি দুইটি দ্বিমাত্রিক অক্ষর পাওয়াই কঠিন। দ্বিমাত্রিক অক্ষর-পরম্পরা যদি একই পর্ব্বাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া বিভিন্ন পর্ব্বাঙ্গ বা পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তো যতি ইত্যাদির ব্যবধানের জন্য সেই পারম্পর্য্যের কোন ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং বাংলায় স্পন্দন-বৈচিত্র্যের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ।

কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেও চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে যেটুকু ধ্বনিতরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঠিক ইংরেজী ও সংস্কৃতের অনুরূপ ছন্দঃস্পন্দন বলা যায় কিনা, খুব সন্দেহের বিষয়। এ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধ্বনির প্রকৃতি একটু সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করা আবশ্যক। বাংলায় সংস্কৃতের ন্যায় মৌলিক দীর্ঘস্বরের ব্যবহার একরূপ নাই। ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণনা করা হয়, তাহাদের উচ্চারণের কাল-পরিমাণ অন্যান্য অক্ষরের চেয়ে অধিক হয়। কিন্তু যথার্থ ছন্দঃস্পন্দন সৃষ্টি করিতে হইলে, দুই প্রকারের অক্ষর দরকার; এই দুই প্রকারের মধ্যে গুণগত পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। কিন্তু বাংলা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের দ্বিমাত্রিক অক্ষরের মধ্যে এমন কি কোন গুণ আছে, যাহার জন্য ইহাদের একমাত্রিক অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় বলিয়া মনে হইবে—অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণের জন্য কি বাগ্‌যন্ত্রের স্পষ্ট অন্যবিধ প্রয়াস করিতে হয়?

পূর্ব্বেই (২ক পরিচ্ছেদে) বলিয়াছি যে, বাংলা উচ্চারণে স্বরের সেরূপ প্রাধান্য নাই, বাংলায় স্বর অন্যান্য বর্ণকে ছাপাইয়া রাখে না। অনেক সময়ে এত লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া যায়। উপরের পদ্যাংশে 'অরুণ' শব্দটিকে দুই অক্ষরের বলিয়া দেখান হইয়াছে, কিন্তু যদি তাহাকে তিন অক্ষরের বলিয়া কেহ দেখান অর্থাৎ অ রু ণ এই ভাবে

পড়েন, তাহা হইলে ছন্দের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না এবং পরিবর্ত্তন কানেও বিশেষ ধরা পড়িবে না। কিন্তু সংস্কৃত বা ইংরাজীতে এরূপ করিতে গেলে ছন্দঃপতন হইত। বাংলা উচ্চারণে—বিশেষ করিয়া ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের আবৃত্তির সময়ে—স্বরের খুব লঘুভাবে উচ্চারণ হয়, সুতরাং যথার্থ দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বরের পার্থক্য ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে নাই; কারণ, প্রতি স্বরই অতি লঘু। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে যৌগিক-স্বরান্ত এবং হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া যখন ধরা হয়, তখন সেই অক্ষরগুলি কি দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট নহে? যদিও অনেকেই বলেন যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে বাংলায় হলন্ত ও যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট, তত্রাচ আমার মনে হয় যে, এ বিষয়ে সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণে পার্থক্য আছে। ২গ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, বাংলার রীতি—প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্ত্তী শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা। 'অরুণ্ কিরণে' বা 'শাখার্ শিখরে' প্রভৃতিকে আমরা 'অরুণ্‌কিরণে' বা 'শাখার্শিখরে' এই ভাবে পড়ি না। সংস্কৃতে এই ভাবে পড়িতে হইত। ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত যত দূর সম্ভব আমরা এড়াইয়া চলিতে চাই। ইহার কারণ হয়ত বাঙালীর ধাতুগত আরামপ্রিয়তা। যাহা হউক, প্রত্যেক শব্দকে পরবর্ত্তী শব্দ হইতে অযুক্ত রাখার জন্য, হলন্ত শব্দের পরে আমরা একটুখানি বিরাম লইয়া পরবর্ত্তী শব্দ আরম্ভ করি। সেই বিরামের কাল লঘু-উচ্চারিত একটি স্বরের সমান ধরা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন বাংলায় প্রত্যেক শব্দের প্রথমে যে ঈষৎ একটা স্বরাঘাত পড়ে, তাহার জন্য বাগ্‌যন্ত্রকে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত, বোধ হয়, একটু সময় দিতে হয়, নহিলে আমরা পারিয়া উঠি না। এই জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই পদান্তের হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক হইয়া থাকে। যাহা হউক, বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতিতে 'অরুণ কিরণে' এই শব্দগুচ্ছকে 'অরুণ্‌কিরণে—অ+রু+উন্+কি+র+ণে' এই ভাবে পড়া হয় না, পড়া হয় 'অ+রুন্+( )+কি+র+ণে'। এই জন্য বন্ধনী-নির্দ্দিষ্ট ফাঁকের স্থানে 'অ' স্বরটি বসাইয়া দিলে ছন্দের বা ধ্বনিপ্রবাহের কোন পরিবর্ত্তন হয় না।—এই তো গেল পদান্তের হলন্ত অক্ষরের কথা। কিন্তু আধুনিক মাত্রিক ছন্দে পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরও দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরা হয় কেন? বলা বাহুল্য, বাংলার চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না; এবং আমাদের সাধারণ কথোপকথনের উচ্চারণ-পদ্ধতি বা গদ্যের উচ্চারণ-রীতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না। (দ্বিতীয়

পরিচ্ছেদে ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে)। চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে একটু উচ্চারণের কৃত্রিমতা আছে, ইহার ধ্বনিপ্রবাহ বা ধ্বনিতরঙ্গ সাধারণ কথোপকথন বা গদ্যের অনুযায়ী নহে। ইহাতে বর্ণসংঘাত-বিমুখতা একেবারে চরমে আসিয়া উঠিয়াছে, বাগ্‌যন্ত্রের আরামপ্রিয়তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখানে যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্‌যন্ত্রকে একটু বিরাম দেওয়া হয়। পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরের উচ্চারণের পরও একটুখানি সময় পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনের ঝঙ্কার বা রেশ থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে আর একটি মাত্রা পূরণ হয়। 'সন্ধ্যে বেলায়' 'উদ্ধত যত' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছকে 'সন্+(ন্)+ধ্যে+বে+লায়+( )' এবং 'উদ্+(দ্)+ধ+ত+য+ত' এই ভাবে পড়া হয়। যৌগিক স্বরের বেলায়ও তাহা করা হয়, যেমন 'অতি ভৈরব'কে উচ্চারণ করা হয় 'অ+তি+ভৈ+(ই)+র+ব' এই ভাবে।

সুতরাং বাংলা মাত্রিক ছন্দেও সংস্কৃতানুরূপ যথার্থ হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার নাই, যদিও একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার আছে। সুতরাং সংস্কৃতে যেরূপ ছন্দঃস্পন্দন হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না। কবি সত্যেন্দ্র দত্তও সেই কথা বুঝিয়া বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত বা হিন্দী বা মারাঠি বা গুজরাটিতে 'দীর্ঘস্বরের দরাজ আওয়াজ বায়ুমণ্ডলে জোয়ার ভাটার যে কুহক সৃষ্টি করে তা হয়তো বাংলায় সম্ভব হবে না'। মধ্যে মধ্যে একটু বিরাম বা ধ্বনির ঝঙ্কারের জন্য যেটুকু সৌন্দর্য্য হইতে পারে, তাহাই মাত্রিক ছন্দে সম্ভব। কিন্তু সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দঃস্পন্দন বাংলায় ঠিক অনুকরণ করা যায় না।

বাংলা স্বরমাত্রিক ছন্দে অবশ্য স্বরের প্রাধান্য অধিক, এবং সেখানে অক্ষর-বিশেষের উপর সুস্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে; সুতরাং সেখানে গুণগত সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুসারে দুই জাতীয় অক্ষরের অস্তিত্ব বেশ বুঝা যায়। কিন্তু বাংলায় স্বরমাত্রিক ছন্দে বৈচিত্র্য একেবারে কম। মাত্র এক ধরণের স্বরমাত্রিক ছন্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। প্রতি পর্ব্বে চার মাত্রা, দুইটি পর্ব্বাঙ্গ, এবং প্রথম পর্ব্বাঙ্গে শ্বাসাঘাত—স্বরমাত্রিক ছন্দের পর্ব্ব-মাত্রেরই মোটামুটি এই লক্ষণ। সুতরাং স্পন্দন-বৈচিত্র্য এ ধরণের ছন্দে দেখান যায় না।

বাংলায় চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে যেখানে যুক্তাক্ষরের সুকৌশলে প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানে বরং কতকটা সংস্কৃতের বৃত্তচ্ছন্দের অনুরূপ একটা মন্থর, গভীর, উদাত্ত ভাব আসে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তই বাংলায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় কৃতী। 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে', 'কিম্বা বিম্বাধরা রমা

অম্বুরাশি-তলে' প্রভৃতি পংক্তিতে এইরূপ একটা ভাব আসে। এ ছন্দে পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না, এবং তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না; সুতরাং এখানে ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত আছে। সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার-কৌশলে একটা ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এখানেও তরঙ্গের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ; মাঝে মাঝে একটু বিরাম দিতে হয়, তাহাতে ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত আর থাকে না। তা' ছাড়া বর্ণমাত্রিক ছন্দে এক প্রকারের দীর্ঘ টান আছে বলিয়া এই ছন্দে স্বরের উচ্চারণ তত লঘু না রাখিলেও চলে এবং ইচ্ছা করিলে স্বরের উপরই জোর দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইখানেই হলন্ত অক্ষরের অন্তর্গত স্বরবর্ণ যথার্থ গুরু হইতে পারে, যদিও তজ্জন্য হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণ্য হয় না। এই কারণে এই রকমের ছন্দে বরং কতকটা সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দের প্রতিধ্বনি আনা যাইতে পারে; কারণ, এখানে দুই প্রকারের অক্ষরের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের দুই প্রকারের প্রয়াস আবশ্যক হয়।

কিন্তু সাধারণতঃ বাংলায় যে স্পন্দন-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে, তাহা অক্ষর-গত নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অক্ষরের সমাবেশ হইতে এই বৈচিত্র্য হয় না, ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার শব্দ ও শব্দসমষ্টির সমাবেশ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। বাংলা ছন্দে যতির অবস্থান এবং তজ্জনিত ছন্দোবিভাগের দরুন ঐক্যসূত্র পাওয়া যায়; কিন্তু বৈচিত্র্য আনা যায়—ছেদের অবস্থান এবং তজ্জনিত শ্বাসবিভাগ বা অর্থবিভাগের পারম্পর্য্য হইতে। অমিতাক্ষর ছন্দে এই ভাবেই বৈচিত্র্য আনা হইয়া থাকে। তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে বৈচিত্র্য আনা হয় আর এক ভাবে। সেখানে যতি ও ছেদ প্রায় এক সঙ্গেই পড়িয়া থাকে, কিন্তু পর্ব্বের মাত্রা এবং প্রতি চরণে পর্ব্ব-সংখ্যা খুব বাঁধা-ধরা নয়. আবেগের তীব্রতা অনুসারে বাড়ে বা কমে। অবশ্য এইভাবে বাড়ার বা কমারও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা আছে। তা' ছাড়া, মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পদের ব্যবহারের দ্বারাও কিছু বৈচিত্র্য আসে। রবীন্দ্রনাথ ইহার উপরে আবার চরণের মধ্যেই মাঝে মাঝে ছেদ বসাইয়া এবং অন্ত্যানু-প্রাসের বৈচিত্র্য ঘটাইয়া আরও একটু বৈচিত্র্য বাড়াইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গগুলি সাজাইবার কায়দা হইতেও একটু বৈচিত্র্য আসিতে পারে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত ক্ষীণ; কারণ, ছন্দঃপতন না হইলে অত ছোট ছোট ছন্দো-বিভাগের মাত্রা আমাদের শ্রবণকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারে না।

বাংলায় প্রতিসম ছন্দোবিভাগগুলি সাধারণতঃ অবিকল এক ছাঁচের হয় না,

কেবলমাত্র তাহাদের মোট মাত্রা সমান থাকে। বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ খোঁচ-খাঁচ অত্যন্ত কম, সুতরাং কোন একটা বিশেষ ছাঁচে পর্ব্বাঙ্গ বা পর্ব্ব গঠন করিলে তাহা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না; এবং বরাবর সেই ছাঁচে লেখার মত শব্দও পাওয়া যায় না। এই জন্য বাংলা ছন্দে ছাঁচের কারিগরি দেখাইবার সুযোগ কম, এবং এ জন্য কবিরা বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাঝে মাঝে একটা বিশেষ ছাঁচের পর্ব্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা লেখার চেষ্টা করিতেন। এ দিক্ দিয়া তাঁহার 'ছন্দহিন্দোল' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু তিনিও এই কবিতার দুই এক জায়গায় ছাঁচ বজায় রাখিতে পারেন নাই, এবং মাত্রাসমকত্ব হিসাব করিয়াই তাঁহাকে ছন্দো-বিভাগগুলি মিলাইতে হইয়াছিল। চল্‌তি ভাষায় অবশ্য ঘন ঘন শ্বাসাঘাত স্পষ্ট পড়ে এবং হলন্ত অক্ষরের বহুল ব্যবহারের জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত প্রায়ই ঘটে, এবং সে জন্য অবশ্য স্বরাঘাতযুক্ত ও স্বরাঘাতহীন এবং স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরের বিন্যাসের দ্বারা বিশেষ রকমের ছাঁচ গড়িয়া ওঠে ও অনেক দূর পর্য্যন্ত সেই ছাঁচ বজায় রাখাও সম্ভব। কিন্তু আবার শ্বাসাঘাতযুক্ত ছন্দে মাত্র এক ছাঁচের পর্ব্বই বাংলায় চলে। এক ছাঁচে ঢালা কবিতাতেও কিন্তু ছন্দোবিভাগগুলির মাত্রা-সমষ্টিই আমাদের ছন্দোবোধের পক্ষে প্রধান। ছাঁচ বদ্‌লাইয়া দিলেও মাত্রা সমান থাকিলে বাংলা ছন্দের পক্ষে কিছুমাত্র হানিকর হয় না; এমন কি, পরিবর্ত্তনটাই অনেক সময়ে কানে ধরা পড়ে না।

মস্‌গুল্ : বুল্‌বুল্ | বন্‌ফুল্ : গন্ধে
বিল্‌কুল্ : অলিকুল্ | গুঞ্জরে : ছন্দে ॥

এই দুইটি পংক্তিতে পর্ব্বের ছাঁচ বরাবর একরকম নাই, দ্বিতীয় পংক্তিতে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তত্রাচ পড়িবার সময়ে ছাঁচের পরিবর্ত্তনটা বিশেষ লক্ষ্যীভূত হয় না, পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের সংখ্যা এবং মাত্রা সমান আছে বলিয়া বরাবর ছন্দের ঐক্যই বোধ হয়, বৈচিত্র্যের আভাস আসে না।

মানুষের অবয়বে প্রতিসম অঙ্গগুলি যেমন ঠিক এক মাপের হয় না, তেমনি ছন্দের প্রতিসম অংশগুলি মাত্রায় সর্ব্বদা ঠিক সমান হয় না। সময়ে সময়ে পূর্ণচ্ছেদের (major breath pause-এর) ঠিক পূর্ব্বের বিভাগটি একটু মাত্রায় ছোট হয়, এবং তদ্দারাই পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান পূর্ব্ব হইতেই বুঝা যায়।

এইখানে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্যের কথা একটু বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দের উপকরণ—পর্ব্ব, এবং এক এক বারের ঝোঁকে

বাক্যের যতটা উচ্চারণ করা হয়, তাহাকেই বলা হয় পর্ব্ব। কিন্তু পর্ব্ববিভাগ বাঙালীর কথন-নীতির একটি লক্ষণ, এবং গদ্যেও এইরূপ পর্ব্ববিভাগ আছে। প্রায়শঃ গদ্যের পর্ব্বগুলিও সমান হইয়া থাকে, কিন্তু গদ্যের পর্ব্বগুলির পারম্পর্য্যের মধ্যে কোন নক্সা বা ছাঁচ দেখা যায় না। নিম্নের উদাহরণ হইতে সাধারণ গদ্যের লক্ষণ বুঝা যাইবে (বন্ধনীভুক্ত সংখ্যার দ্বারা পর্ব্বের মাত্রানির্দ্দেশ করা হইয়াছে)।

ছুকড়ি। কি চাই? (৩) ॥

কাঙালী। আজ্ঞে, (৩) ॥ মশায় হচ্চেন (৬) | দেশহিতৈষী (৬) ॥

ছুকড়ি। তা' ত (৩) ॥ সকলেই জানে (৬) ॥ কিন্তু (২) | আসল ব্যাপারটা (৬) |

কি? (২) ॥

কাঙালী। আপনি সাধারণের (৮) | হিতের জন্য (৬) | প্রাণপণ—

ছুকড়ি। —ক'রে (৬) |

ওকালতি ব্যবসা (৬)। চালাচ্চি ॥ তাও (৬) | কারো অবিদিত নেই (৮) ॥

(হাস্যকৌতুক, রবীন্দ্রনাথ)

দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বাংলা কথোপকথনের ভাষাতেও বিশেষ এক প্রকারের অর্থাৎ ছয় মাত্রার পর্ব্ব বহুল ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ এইটি বুঝিয়াই তাঁহার কবিতায় ছয়মাত্রার পর্ব্ব খুব বেশী ব্যবহার করিয়াছেন।

ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্যে অনেক সময়ে সমমাত্রার বা কোন বিশেষ আদর্শানুযায়ী পরিমিত মাত্রার পর্ব্বের সমাবেশ দেখা যায়। নিম্নের উদাহরণে আট মাত্রার পর্ব্বের পারম্পর্য্য পাওয়া যায়।—

তখন | রমণীর চিত্রকূটে (৮) | অর্ক ও কেতকী পুষ্প (৮) | ফুটিয়া উঠিয়াছিল (৮), | আম্র ও লোধ্র ফল (৮) | পক্ক হইয়া (৬) | শাখাগ্রে দুলিতেছিল (৮) |

(রামায়ণী কথা, দীনেশচন্দ্র সেন)

তবে পদ্যে ও ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্যে তফাৎ কি? গদ্যে পর্ব্ববিভাগ থাকিলেও, সেখানে বিভাগের সূত্র ঝোঁকের বা ধ্বনির দিক্ দিয়া নহে—অর্থের দিক্ দিয়া; প্রত্যেক পর্ব্ব একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগ (Sense Group)। ছন্দঃ সেখানে সম্পূর্ণরূপে অর্থবাচক বিভাগের অধীন। পদ্যে কিন্তু প্রত্যেকটি বিভাগের অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিরই প্রাধান্য অধিক, যদিও অনেক সময়েই পদ্যের এক একটি বিভাগ এক একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগের সহিত অভিন্ন। তত্রাচ পদ্যের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস, স্বরাঘাত ইত্যাদির অবস্থান হইতে পদ্যে যে ধ্বনি অনুসারেই এক একটি বিভাগ হইয়া থাকে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

কিন্তু গদ্য ও পদ্যের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট প্রতীত হয় যতির অবস্থান হইতে। পদ্যে প্রতি চরণের শেষে যতি থাকিবে, পূর্ণযতি কিংবা ছেদ না থাকিলেও অন্ততঃ অর্দ্ধযতি থাকিবে। যতির অবস্থান পদ্যে বিশেষ কোন নক্সা বা আদর্শ অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে। গদ্যে কিন্তু যতির অবস্থান কোন নিয়ম বা নক্সা অনুযায়ী হয় না; বাক্য বা বাক্যাংশের শেষে অর্থবোধের পূর্ণতা অনুযায়ী ছেদ পড়ে। পদ্যে চার পাঁচটি পর্ব্বের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়া দরকার। গদ্যে আট, দশ বা আরও বেশী সংখ্যক পর্ব্বের পরে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে। *

মাত্রা

এইবার মাত্রার কথা কিছু বলা আবশ্যক। গানে কবিতায় উভয়ত্রই মাত্রা অর্থে কাল-পরিমাণ বুঝায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাংলা কাব্যে যদিও অক্ষরের মধ্যে মাত্রাভেদ দেখা যায়, তথাপি সে ভেদের দরুণ অক্ষরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিভেদ কল্পনা করা যায় না। সেই জন্য গ্রীক্ iamb, trochee, spondee প্রভৃতি foot, এবং সংস্কৃতে 'য' 'ম' 'ত' 'র' প্রভৃতি গণ, বিভিন্ন গুণের অক্ষরের বিশেষ সমাবেশ বলিয়া বিশিষ্ট স্পন্দন-ধর্ম্ম-যুক্ত ; বাংলায় পর্ব্ব বা পর্ব্বাঙ্গ সে রকম কিছু নয়।

ছন্দঃশাস্ত্রে মাত্রা বা কাল-পরিমাণের আসল তাৎপর্য্য কি, বুঝা দরকার। ছন্দঃ-শাস্ত্রের কাল পদার্থবিদ্যার কাল নহে, অর্থাৎ বিষয়ি-নিরপেক্ষ (objective) নহে, কালমানযন্ত্রে ইহা ঠিক ধরা পড়ে না। পর্ব্বের মাত্রা বা কাল-পরিমাণ বলিতে পর্ব্বের প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হইতে শেষ অক্ষরের উচ্চারণ পর্য্যন্ত যে নিরপেক্ষ কাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে নির্দ্দেশ করা হয় না। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, পর্ব্বের মধ্যে বিরামস্থান, এমন কি পূর্ণচ্ছেদের, ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু মাত্রার হিসাবের সময়ে বিরাম বা ছেদের কাল যে কোন অক্ষরের উচ্চারণের কাল হইতে দীর্ঘ হইলেও উপেক্ষিত হয়। যেমন—

মৃগেন্দ্রকেশরী, ||
(ক) কবে, * হে বীর কেশরী | সম্ভাষে শৃগালে ||
(খ) মিত্র ভাবে ? * * অজ্ঞ দাস | বিজ্ঞতম তুমি, ||
(গ) অবিদিত নহে কিছু | তোমার চরণে। ||

---

* মৎপ্রণীত Studies in the Rhythm of Bengali prose and prose-verse (Journal of the Department of Letters, Cal. Univ., Vol. XXXII) দ্রষ্টব্য।

এই কয়টি পংক্তিতে ছন্দের নিয়মে ক=খ=গ, অথচ পর্ব্ব কয়টির মধ্যে একটিতে কোনরূপ ছেদ নাই, একটিতে উপচ্ছেদ, অপরটিতে পূর্ণচ্ছেদ রহিয়াছে। যদি মাত্র নিরপেক্ষ কাল-পরিমাণের উপর মাত্রা-বিচার নির্ভর করিত, তবে এরূপ হইত না।

ছন্দের কাল বাহ্যজগতের নিরপেক্ষ কাল নহে। অক্ষরের উচ্চারণের নিমিত্ত বাগ্‌যন্ত্রের প্রয়াসের উপর ইহা নির্ভর করে। এই প্রয়াসের পরিমাণ অনুসারে অক্ষরের মাত্রাবোধ জন্মে। পর্ব্বের অন্তর্গত অক্ষরের মাত্রা-সমষ্টির উপরই পর্ব্বের মাত্রা-পরিমাণ নির্ভর করে। সুতরাং ছেদ বা বিরাম পর্ব্বের মধ্যে থাকিলে তাহাতে মাত্রাসংখ্যার ইতর-বিশেষ হয় না। মাত্রার ভিত্তি হইতেছে—বাগ্‌যন্ত্রের প্রয়াস, মাত্রার আদর্শ চিত্তের অনুভূতিতে। বিশেষ বিশেষ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য প্রয়াসের কাল অনুসারে চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার উপলব্ধি হয়,—কোনটি হ্রস্ব, কোনটি দীর্ঘ, কোনটি প্লুত বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্তু এইরূপ মাত্রার কাল, মোটামুটি উচ্চারণ-প্রয়াসের জন্য আবশ্যক নিরপেক্ষ কালের অনুযায়ী হইলেও, ঠিক তাহার অনুপাতের উপর নির্ভর করে না। যদি উচ্চারণের নিরপেক্ষ কাল হিসাব করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর সমান নহে, এবং হ্রস্ব বা একমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর সমান নহে; কিংবা যে কোন দীর্ঘ অক্ষর যে কোন হ্রস্ব অক্ষরের দ্বিগুণ নহে। মাত্রাবোধের জন্য ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি, ছন্দের রীতি ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার। কোন বিশেষ স্থলে একটি অক্ষরের অবস্থান, শব্দের অর্থগৌরব ইত্যাদিতেও ছন্দো-রসিকের মাত্রাজ্ঞান জন্মে।

শুধু বাংলা নহে, সমস্ত ভাষাতেই ছন্দে অক্ষরের মাত্রার এই তাৎপর্য্য। এই উপলক্ষে ইংরেজী ছন্দের long ও short সম্বন্ধে Professor Saintsbury-র মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে: "They (long and short) represent two values which, though no doubt by no means always identical in themselves, are invariably, unmistakably, and at once, distinguished by the ear,—it is partly, and in English rather largely, created by the poet, but that this creation is conditioned by certain conventions of the language, of which accent is one, but only one."

যাহা হউক, বাংলাতেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অক্ষরের মাত্রা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হয় না। ইংরেজীতে যেমন বেশীর ভাগ অক্ষর Common Syllable অর্থাৎ

অবস্থা অনুসারে accented বা unaccented হইতে পারে, বাংলাতেও তদ্রূপ। বাংলাতেও অনেক অক্ষরকেই ইচ্ছামত হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা যাইতে পারে। বাংলা উচ্চারণে যে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি। স্বেচ্ছায় অক্ষরের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণের রীতি বাংলা ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দের তুলনায় বাংলা ছন্দের এই একটি প্রধান সুবিধা কিংবা এই একটি প্রধান দুর্ব্বলতা—উভয়ই বলা যাইতে পারে।

অধিকন্তু বাংলায় মাত্রা আপেক্ষিক; অর্থাৎ সন্নিহিত অন্যান্য অক্ষরের তুলনাতেই কোন অক্ষরকে দীর্ঘ বলা হয়, নিরপেক্ষ মিনিট সেকেণ্ড হিসাবে নহে। উচ্চারণে সেই সময় লাগিলেও অন্যত্র সেই অক্ষরকেই সন্নিহিত অক্ষরের তুলনায় হ্রস্ব বলা যাইতে পারে। যেমন,

'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব | বিবিধ রতন'

এই পংক্তিতে 'বঙ্' একটি হ্রস্ব অক্ষর, আবার

'জননি বঙ্গ | ভাষা এ জীবনে | চাহিনা অর্থ | চাহিনা মান'

এই পংক্তিতে 'বঙ্' একটি দীর্ঘ অক্ষর। এই দুই জায়গাতে ঠিক 'বঙ্' অক্ষরটির উচ্চারণে যে কালের বেশী তারতম্য হয়, তাহা নহে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে সমস্ত চরণটি একটু সুর করিয়া বা টানিয়া পড়া হয় এবং সুতরাং প্রত্যেকটি অক্ষরকেই প্রায় সমান করিয়া তোলা হয়; সুতরাং পরস্পরের সহিত সমান বলিয়া প্রত্যেক অক্ষরটিকেই হ্রস্ব বলা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় বলিয়া হলন্ত 'বঙ্' অক্ষরটির উচ্চারণের কাল অপেক্ষা নিকটের অন্য অক্ষরের উচ্চারণের কাল কম বলিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়; সুতরাং এখানে 'বঙ্' অক্ষরটিকে দীর্ঘ বলা হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ উচ্চারণে বিভিন্ন অক্ষরের মাত্রার বহু বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। একই অক্ষরেরও উচ্চারণে একই মাত্রা সব সময়ে বজায় রাখা যায় না, কিছু কিছু ইতর-বিশেষ সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। ধ্বনি-বিজ্ঞানে সাধারণতঃ হ্রস্ব, নাতিদীর্ঘ, দীর্ঘ—অক্ষরের এই তিন শ্রেণী করা হইয়া থাকে। ছন্দঃশাস্ত্রে কিন্তু একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক—এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যদিও উচ্চারণের জন্য এক মাত্রা ও দুই মাত্রার মধ্যবর্ত্তী যে কোন ভগ্নাংশ-পরিমিত কালের আবশ্যক হইতে পারে। কারণ, আসলে ছন্দের মাত্রা নির্ণীত হয় চিত্তের অনুভূতিতে, বৈজ্ঞানিকের কালমান-যন্ত্রে নহে।

বাংলা ছন্দে কদাচ কোন অক্ষরকে ছন্দের খাতিরে ত্রিমাত্রিক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।

এই স্থলে কাব্যছন্দের মাত্রা ও সঙ্গীতের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা উচিত। সঙ্গীতের মাত্রার একটি নির্দ্দিষ্ট নিরপেক্ষ কাল-পরিমাণ আছে; ঘড়ির দোলকের একদিক্ হইতে আর এক দিকে গতির কাল অথবা এইরূপ অন্য কোন নিরপেক্ষ কালাঙ্ক ইহার আদর্শ। সঙ্গীতের তাল-বিভাগের কাল-পরিমাণ ঠিক ঠিক বজায় রাখার জন্য উচ্চারণের ইতর-বিশেষ করা হইয়া থাকে। কাব্যচ্ছন্দে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় মাত্রার কালাঙ্ক বিভিন্ন হইয়া থাকে; এমন কি, এক কবিতারই ভিন্ন ভিন্ন চরণে গতিবেগের পরিবর্ত্তন ও মাত্রার কালাঙ্কের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এইরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারাই কবিতাতে অনেক সময়ে আবেগের হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন বুঝা যায়। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতার যথাযথ আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, কি সুকৌশলে গতিবেগের পরিবর্ত্তনের দ্বারা আসন্ন ঝটিকার ভয়ালতা, বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ঝঞ্ঝার মত্ততা, বায়ুবেগের হ্রাসবৃদ্ধি, এবং ঝটিকার অন্তে স্নিগ্ধ শান্তি—এই সব রকমের ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কাব্যচ্ছন্দে, যত দূর সম্ভব, সাধারণ উচ্চারণের মাত্রা বজায় রাখিতে হয়; সঙ্গীতে যেমন যে কোন অক্ষরকে সিকি মাত্রা পর্য্যন্ত হ্রস্ব এবং চার মাত্রা পর্য্যন্ত দীর্ঘ করা যায়, কবিতায় ততটা করা চলে না।

অবশ্য ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত ভারতীয়, তথা বাংলা কাব্য-ছন্দের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ভারতীয় কাব্য ও সঙ্গীতের পদ্ধতি মূলতঃ একই, প্রাচীন সঙ্গীত ও প্রাচীন কবিতার মধ্যে সৌসাদৃশ্য এত বেশী যে, তাহাদের ভিন্ন করিয়া চেনাই কঠিন। বাংলা কবিতায় প্রচলিত ছন্দগুলি যে সঙ্গীতের তালবিভাগ হইতে উৎপন্ন, তাহাও বেশ বুঝা যায়। পরে কিন্তু সঙ্গীত ও কাব্য-ছন্দ ক্রমেই পৃথক্ পৃথক্ পথ অবলম্বন করিয়াছে। সঙ্গীতে সুরের সন্নিবেশের দিক্ দিয়া নানা বৈচিত্র্য আসিয়াছে, কিন্তু তাল-বিভাগের পদ্ধতি বরাবর প্রায় একরূপ আছে। বাংলায় কিন্তু পর্ব্ববিভাগের মধ্যে ক্রমেই বৈচিত্র্য আসিতেছে; বিশেষতঃ blank verse ও অন্যান্য অমিতাক্ষর ছন্দে ও তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে নানাভাবে বৈচিত্র্যকেই মূল ভিত্তি করিয়া ছন্দোরচনার চেষ্টা করা হইয়াছে।

মাত্রাপদ্ধতি

এক হিসাবে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি সংস্কৃত, আরবী, ইংরেজী ছন্দের প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলার ছন্দ একটা বাঁধা

উচ্চারণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় না। বরং এক একটি বিশেষ ছন্দোবন্ধ অনুসারেই বাংলা কাব্যে অনেক সময়ে উচ্চারণ স্থির হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনশীলতার জন্যই এরূপ হওয়া সম্ভব। অবশ্য বাংলা কবিতার যে কোন চরণে যে কোন ছন্দ চাপাইয়া দেওয়া যায় না ; কারণ, যতদুর সম্ভব, সাধারণ কথোপকথনের উচ্চারণ কবিতায় বজায় রাখা দরকার। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছন্দোবন্ধ অনুসারেই কবিতায় শব্দের ও অক্ষরের মাত্রা ইত্যাদি স্থির হইয়া থাকে।

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে শব্দের যেটুকু উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম syllable বা অক্ষর। অক্ষরই উচ্চারণের মূল উপাদান। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরবর্ণ থাকে। অক্ষরের অন্তর্গত স্বরের পূর্ব্বে ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিতে পারে বা না-ও থাকিতে পারে। সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে, এক একটি অক্ষর syllabic ও non-syllabic-এর সমষ্টি মাত্র। সাধারণতঃ স্বরবর্ণই syllabic এবং ব্যঞ্জনবর্ণ non-syllabic হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ধ্বনিবিজ্ঞানের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, সময়ে সময়ে ব্যঞ্জনবর্ণও syllabic এবং স্বরবর্ণও non-syllabic হইয়া থাকে।

ছন্দের দিক্ হইতে নিম্নলিখিত ভাবে বাংলা অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে,—

বলা বাহুল্য যে, ছন্দোবিচারের সময়ে, syllable বা অক্ষর, vowel বা স্বর, consonant বা ব্যঞ্জন, diphthong বা যৌগিক স্বর ইত্যাদি শব্দ ভাষাতত্ত্বের ব্যবহৃত অর্থে বুঝিতে হইবে। লিখনপদ্ধতির বা লৌকিক ব্যবহারের চলতি অর্থে বুঝিলে প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও বাংলা বর্ণমালায় মাত্র 'ঐ' এবং 'ঔ' এই দুইটি যৌগিক স্বর দেখান হয়, তত্রাচ বাংলার

বাস্তবিক পক্ষে বহু যৌগিক স্বরের ব্যবহার আছে। 'খাই', 'দাও' প্রভৃতি শব্দ বাস্তবিক একাক্ষর ও যৌগিক-স্বরান্ত। তেমনি মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলায় মৌলিক স্বর মাত্রেই সাধারণতঃ হ্রস্ব; 'ঈ', 'ঊ', 'আ', 'ও' প্রভৃতির হ্রস্ব উচ্চারণই হইয়া থাকে।

গঠনের দিক্ দিয়া অক্ষরের মধ্যে স্বরই প্রধান। স্বরের পূর্ব্বে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে তদ্দ্বারা স্বরের একটি বিশিষ্ট আকার দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু অক্ষরের মধ্যে যদি স্বরের পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, তবে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কিছু বাড়িয়া যায়। প্রায় সকল ভাষাতেই সাধারণতঃ স্বরের দৈর্ঘ্য অনুসারে মাত্রা-নিরূপণ হইয়া থাকে।

নিত্য-দীর্ঘ মৌলিক স্বরবর্ণ বাংলায় নাই। সুতরাং মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর-মাত্রই সাধারণতঃ হ্রস্ব বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু হলন্ত অক্ষর ও যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একই লয়ে একটি যৌগিক-স্বরান্ত ও একটি হলন্ত অক্ষর পড়িলে দেখা যাইবে যে, হলন্ত অক্ষরের উচ্চারণে কিছু সময় বেশী লাগে। কিন্তু কিছু দ্রুত লয়ে হলন্ত অক্ষর পড়িলে মধ্য লয়ের স্বরান্ত অক্ষরের সমান হইতে পারে। ইহাকেই বলে হ্রস্বীকরণ; বাংলা ছন্দের ইহা একটি বিশেষ গুণ। যেমন হ্রস্বীকরণ, তেমন হলন্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণও বাংলায় চলে। বিলম্বিত লয়ে হলন্ত অক্ষর পড়িলে বা হলন্ত অক্ষরের অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণের পরে একটু বিরাম লইলে, হলন্ত অক্ষর মধ্য লয়ের স্বরান্ত অক্ষরের দ্বিগুণ হইতে পারে। কিন্তু যথেচ্ছ হ্রস্বীকরণ বাংলায় চলে না।

যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর-সম্বন্ধেও হলন্ত অক্ষরের অনুরূপ বিধি। যৌগিক স্বরের মধ্যে দুইটি স্বরের উপাদান থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটি পূর্ণোচ্চারিত ও প্রধান, দ্বিতীয়টি অপ্রধান, non-syllabic, প্রায় ব্যঞ্জনের সমান (consonantal)। অবশ্য যৌগিক স্বরকে ভাঙিয়া দুইটি পৃথক্ স্পষ্টোচ্চারিত স্বরে পরিবর্ত্তন করা চলে, কিন্তু তখন তাহারা দুইটি পৃথক্ অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'যাও' শব্দটি একাক্ষর যৌগিক-স্বরান্ত; কিন্তু 'যেও' শব্দটি দ্ব্যক্ষর। 'ঘর থেকে বেরিয়ে যাও' এবং 'আমাদের বাড়ী যেও' এই দুইটি বাক্য তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। যাহা হউক, যথার্থ যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ। সুতরাং ইহাকে হয় হ্রস্বীকরণের দ্বারা একমাত্রিক, না-হয় দীর্ঘীকরণের দ্বারা দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাদেরও যথেচ্ছ হ্রস্বীকরণ বাংলায় চলে না। প্রতি পর্ব্বাঙ্গে অন্ততঃ একটি লঘু (স্বরান্ত হ্রস্ব বা হলন্ত দীর্ঘ) অক্ষর রাখিতে হইবে ইহাই মোটামুটি নিয়ম।

অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে এই কয়টি রীতি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে—

(১) বাংলায় মৌলিক-স্বরান্ত সমস্ত অক্ষরই হ্রস্ব বা একমাত্রিক।

[১ক] কিন্তু স্থানবিশেষে হ্রস্ব স্বরও আবশ্যক মত দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক হইতে পারে ; যথা—

(অ) Onomatopoeic বা একাক্ষর অনুকার শব্দ এবং interjectional বা আহ্বান আবেগ ইত্যাদিসূচক শব্দ। যথা—

হা হা শবদে | অটবী পুরিছে (ছায়াময়ী, হেমচন্দ্র)

না—না—না | মানবের তরে (সুখ, কামিনী রায়)

(আ) যে শব্দের অন্ত্য অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার শেষ অক্ষর। যথা—

নাচ্‌'ত : সীতারাম | কাঁকাল : বেঁকিয়ে (গ্রাম্য ছড়া)

(ই) তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ। যথা—

ভীত বদনা | পৃথিবী হেরিছে (ছায়াময়ী, হেমচন্দ্র)

(২) হলন্ত অক্ষর অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে হ্রস্বও ধরা যাইতে পারে।

[২ক] শব্দের অন্তে হলন্ত অক্ষর থাকিলে তাহাকে দীর্ঘ ধরাই সাধারণ রীতি।

উপরি-লিখিত নিয়মগুলিতে মাত্র একটা সাধারণ প্রথা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ছন্দের আবশ্যক মতই শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির হয়। বিস্তারিত নিয়ম "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র" নামক অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ*

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র ছন্দ 'যৌগিক মুক্তক,' 'পলাতকা'র ছন্দ 'স্বরবৃত্ত মুক্তক' এবং 'সাগরিকা'র ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তক'। অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চান যে কেবলমাত্র পর্ব্বের মাত্রা বিচারের দিক্ দিয়াই ঐ তিন ধরণের ছন্দে পার্থক্য আছে, নহিলে ছন্দের আদর্শ হিসাবে তাহারা সকলেই একরূপ, সকলেই free verse বা মুক্তক। 'বলাকা'র ছন্দ free verse আখ্যা পাইতে পারে কি না তাহা পরে আলোচনা করিতেছি। কিন্তু 'বলাকা'র ছন্দের আদর্শ যে 'পলাতকা' বা 'সাগরিকা'র ছন্দের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 'বলাকা,' 'পলাতকা' বা 'সাগরিকা'—সর্ব্বত্রই অবশ্য পংক্তির দৈর্ঘ্য অনিয়মিত। কিন্তু পংক্তির দৈর্ঘ্য মাপিয়া ত ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় না। পংক্তি (printed line) অনেক সময়ে কেবলমাত্র অন্ত্যানুপ্রাস (rime) নির্দ্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। 'বলাকা'র পংক্তি এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পংক্তি-কে আশ্রয় করিয়া ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে যাওয়া চলে না। অনেক স্থলে অবশ্য পংক্তি চরণের (prosodic line or verse) সহিত এক। কিন্তু সে সব স্থলেও পংক্তির বা চরণের দৈর্ঘ্য মাপিয়া ছন্দের প্রকৃতি বুঝা যায় না; বাংলা ছন্দের উপকরণ —পর্ব্ব (measure বা bar), এবং পর্ব্ব এক একটি impulse-group অর্থাৎ এক এক ঝোঁকে উচ্চারিত শব্দসমষ্টি। পর্ব্বের মাত্রা, গঠনপ্রকৃতি ও পরস্পর সমাবেশের রীতির উপর-ই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। দুইটি চরণের দৈর্ঘ্য এক হইয়া যদি পর্ব্বের মাত্রা ও পর্ব্ব-সমাবেশের রীতি বিভিন্ন হয়, তবে ছন্দও পৃথক্ হইয়া যাইবে।

"মনে পড়ে গৃহকোণে মিটি মিটি আলো"
"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেলো খুলি"—

এই দুইটি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু পর্ব্ব বিভিন্ন বলিয়া ছন্দ-ও পৃথক্।

---

* কবি সত্যেন্দ্রনাথ vers libre বা free verseর প্রতিশব্দ হিসাবে "মুক্তবন্ধ" শব্দটি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

এই সাধারণ কথাগুলি স্মরণ রাখিলে কেহ 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র ছন্দের আদর্শ এক—এইরূপ ভ্রম করিবেন না।

'পলাতকা' হইতে কয়েকটি পংক্তি লইয়া তাহার ছন্দোলিপি করা যাক্।—

পর্ব্বসংখ্যা

মা কেঁদে কয় | "মঞ্জুলী মোর | ঐ তো কচি | মেয়ে, =৪
ওরি সঙ্গে | বিয়ে দেবে ? | বয়সে ওর | চেয়ে =৪
পাঁচ গুণো সে | বড়ো ;— =২
তাকে দেখে | বাছা আমার | ভয়েই জড় | সড়। =৪
এমন বিয়ে | ঘটুতে দেবো | না কো।" =৩
বাপ ব'ল্লে, | "কান্না তোমার | রাখো ; =৩
পঞ্চাননকে | পাওয়া গেছে | অনেক দিনের | খোঁজে, =৪
জানো না কি | মস্ত কুলীন | ও-যে ! =৩
সমাজে তো | উঠ্‌তে হবে | সেটা কি কেউ | ভাবো ? =৪
ওকে ছাড়্‌লে | পাত্র কোথায় | পাবো ?" =৩

উপরের উদাহরণ হইতেই 'পলাতকা'র ছন্দের পরিচয় পাওয়া যাইবে। দেখা যাইতেছে যে এখানে মাত্র এক প্রকারের পর্ব্ব অর্থাৎ চার মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতি জোড়া পংক্তির শেষে মিল আছে। প্রতি পংক্তি-ই এক একটি চরণ, অর্থাৎ প্রত্যেক পংক্তির শেষে পূর্ণ যতি। চরণে পর্ব্বসংখ্যা খুব নিয়মিত নয়,—দুই, তিন, চার পর্ব্বের চরণ দেখা যাইতেছে। বাংলা ছন্দের বহুপ্রচলিত রীতি অনুসারে শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণ। বাংলায় চার মাত্রার ছন্দে সাধারণতঃ প্রতি চরণে তিনটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ—মোট চারিটি পর্ব্ব থাকে। উপরের পংক্তিগুলিতে সেই ছন্দেরই অনুসরণ করা হইয়াছে, তবে, মাঝে মাঝে এক একটি চরণে একটি বা দুইটি পর্ব্ব কম আছে। অধিকসংখ্যক পর্ব্বের চরণের সহিত অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পর্ব্বের চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবক রচনার দৃষ্টান্ত বাংলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ত এই প্রথা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যেমন—

শুধু অকারণ | পুলকে
নদী-জলে-পড়া | আলোর মতন | ছুটে যা ঝলকে | ঝলকে
ধরণীর পরে | শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ | করিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে | শিশির যেমন | শিরীষ ফুলের | অলকে।
মর্ম্মর তানে | ভরে ওঠ্‌ গানে | শুধু অকারণ | পুলকে।

(ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ)

এই চরণস্তবক-কে অবশ্য কেহই free verse বলিবেন না। কিন্তু এখানে পর্ব্ব-সমাবেশের যে আদর্শ, 'পলাতকা' হইতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতেও মূলতঃ তাই। অবশ্য 'ক্ষণিকা' হইতে উদ্ধৃত কবিতাটিতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চরণের সমাবেশে স্তবক (stanza) গড়িবার একটি সুদৃঢ় আদর্শ আছে। 'পলাতকা'য় সেরূপ কোন সুদৃঢ় আদর্শ নাই; দেখা যায় যে এক একটি চরণ কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ হইতেছে। (কিন্তু পাঁচ পর্ব্বের বেশী দীর্ঘ চরণ নাই, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক পর্ব্বের চরণ বাংলায় চলে না।) কিন্তু চরণে চরণে মিল রাখিয়া তাহাদের মধ্যে একরূপ সংশ্লেষ রাখা হইয়াছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি চরণ-পরম্পরা লইয়া পরিষ্কার স্তবক গঠনের আভাসও যেন আসে; যেমন উদ্ধৃত পংক্তিগুলির শেষ চারিটি চরণ একটি সুপরিচিত আদর্শে গঠিত স্তবক হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, স্তবক গঠনের সুদৃঢ় আদর্শ নাই বলিয়াই কোন কবিতাকে free verse বলা যায় না। কবি Wordsworthএর Ode on the Intimations of Immortalityতে ছন্দোগঠনের যে আদর্শ, এখানেও সেই আদর্শ।—

	Number of feet
There was | a time | when mead | ow, grove, | and stream,	= 5
The earth | and eve | ry comm | on sight	= 4
To me | did seem	= 2
Appa | relled in | celes | tial light,	= 4
The glo | ry and | the fresh | ness of | a dream.	= 5

এখানে বারবার iambic feet ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি lineএ footএর সংখ্যা কত তাহা সুনির্দ্দিষ্ট নহে। 'পলাতকা'য় ছন্দের আদর্শ এবং Immortality Odeএ ছন্দের আদর্শ এক। Immortality Odeকে কেহ free verseএর উদাহরণ বলেন না। বস্তুতঃ যেখানে বরাবর এক প্রকারের উপকরণ লইয়া ছন্দ রচিত হইয়াছে তাহাকে কেহই free verse বলিবেন না। 'পলাতকা'র ছন্দকে free verseএর উদাহরণ বলা free verse শব্দটির একান্ত অপ-প্রয়োগ।

'সাগরিকা'র ছন্দও অবিকল এইরূপ, তবে সে কবিতাটিতে পাঁচ মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে।—

	পর্ব্বসংখ্যা
সাগর জলে | সিনান করি' | সজল এলো | চুলে	=৪
বসিয়াছিলে | উপল-উপ | কূলে।	=৩

পর্ব্বসংখ্যা

শিথিল পীত | বাস =২
মাটির পরে | কুটিল-রেখা | লুটিল চারি | পাশ। =৪
নিরাবরণ | বক্ষে তব, | নিরাভরণ | দেহে =৪
চিকন সোনা- | লিখন উষা | আঁকিয়া দিলো | স্নেহে =৪

এই আদর্শে অন্যান্য কবিরাও কবিতা রচনা করিয়াছেন। নজরুল্ ইস্‌লামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটিতে ছন্দের এই আদর্শ, তবে সেখানে ছয় মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে।

(বল)—বীর =১
(বল)—উন্নত মম | শির =২
(শির)—নেহারি আমার | নতশির ওই | শিখর হিমা | দ্রির। =৪
(বল)—মহাবিশ্বের | মহাকাশ ফাড়ি =২
চন্দ্র সূর্য্য | গ্রহ তারা ছাড়ি =২
ভূলোক দ্যুলোক | গোলোক ছাড়িয়া =২
খোদার আসন | 'আরশ' ভেদিয়া =২
উঠিয়াছি চির- | বিস্ময় আমি | বিশ্ব-বিধা | তৃর =৪

বন্ধনীভুক্ত শব্দগুলি ছন্দোবন্ধের অতিরিক্ত (hypermetric)।

এইরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে এই প্রকারের ছন্দের আসল প্রকৃতি ধরা পড়ে ; নতুবা এই ছন্দ সাধারণ ছন্দ হইতে পৃথক্ এইরূপ অস্পষ্ট বোধ লইয়া ইহাকে free verse বলিলে প্রমাদ-গ্রস্ত হইতে হয়।

এইবার 'বলাকা'র ছন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ইহাকে 'মুক্তক' বলিলে কেবল মাত্র একটা নেতিবাচক (negative) বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, ইহার পরিচয় প্রদান করা হয় না।

'বলাকা' গ্রন্থটিতে 'নবীন,' 'শঙ্খ' প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা সাধারণ চারিমাত্রার ছন্দে এবং সুদৃঢ় আদর্শের স্তবকে রচিত হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে কোনও বিশেষ মন্তব্যের আবশ্যকতা নাই। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পংক্তির ছন্দোলিপি দিতেছি—

তোমার শঙ্খ | ধুলায় প'ড়ে, | কেমন ক'রে | সইবো ? =৪+৪+৪+২
বাতাস আলো | গেলো ম'রে | এ কী রে দু | র্দ্দৈব ! =৪+৪+৪+২
লড়্‌বি কে আয় | ধ্বজা বেয়ে =৪+৪
গান আছে যার | ওঠ্‌না গেয়ে =৪+৪.

পর্ব্বসংখ্যা

চল্‌বি যারা | চল্‌রে ধেয়ে, | আয় না রে নিঃ | শঙ্ক, =৪ + ৪ + ৪ + ২
ধুলায় পড়ে | রইলো চেয়ে | ঐ যে অভয় | শঙ্খ। =৪ + ৪ + ৪ + ২

এ রকমের কবিতার মধ্যে কোনরূপ free verseএর আভাস নাই।

'বলাকা' গ্রন্থটিতে আর কতকগুলি কবিতায় নূতন এক প্রকারের ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই ছন্দ-কেই সাধারণতঃ 'বলাকার ছন্দ' বলা হয়। পূর্ব্বপ্রচলিত কোন প্রকার ছন্দের সহিত এই ছন্দের সাদৃশ্য দেখা যায় না বলিয়া অনেকে ইহাকে free verse বা vers libre বলিয়াই ক্ষান্ত হন। কিন্তু এই ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া এবং এই রকমের কবিতার ছন্দোলিপি করিয়া ইহার যথার্থ প্রকৃতির ব্যাখ্যা কেহ করেন নাই।

'বলাকা'র ছন্দ বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা প্রথমে স্মরণ রাখা দরকার। 'বলাকা'য় পংক্তি মানেই ছন্দের এক চরণ নহে। চরণ (Prosodic line or verse), মানে, পর্ব্ব অপেক্ষা বৃহত্তর একটি ছন্দোবিভাগ। কয়েকটি পর্ব্বের সংযোগে এক একটা চরণ গঠিত হয়। প্রত্যেক চরণের শেষে পূর্ণযতি থাকে। প্রত্যেকটি চরণ পূর্ণ হওয়া মাত্র পর্ব্ব সমাবেশের একটি আদর্শের পূর্ণতা ঘটে। সুপ্রচলিত ত্রিপদী ছন্দের এক একটি চরণ ভাঙ্গিয়া সাধারণতঃ দুইটি পংক্তিতে লেখা হয়, তাহাতে পর্ব্ববিভাগ ও অন্ত্যানুপ্রাসের রীতি বুঝিবার সুবিধা হয়। বাংলায় অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার চরণের মধ্যেও দেখা যায় বলিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চরণ ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পংক্তিতে অনেক সময় লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'তে তাহাই করিয়াছেন। প্রত্যেক পংক্তির শেষে অনুপ্রাস আছে, কিন্তু এই অন্ত্যানুপ্রাস কেবল মাত্র চরণের শেষ ধ্বনিতে নিবদ্ধ নহে। বিচিত্র ভাবে চরণের মধ্যে ইহার প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং একই স্তবকের অন্তর্গত বিভিন্ন চরণ ইহা দ্বারা সুশৃঙ্খলিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন, ছন্দে যতি ও ছেদের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। এই পার্থক্য না বুঝিলে যে সমস্ত ছন্দ বৈচিত্র্যে গরীয়ান্ তাহাদের প্রকৃতি বুঝা যাইবে না, নানা রকমের অমিতাক্ষর ছন্দের আসল রহস্যটি অপরিজ্ঞাত রহিয়া যাইবে।

ছেদ ও যতির পার্থক্য আমি পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে; "ছেদ" মানে ধ্বনির বিরামস্থল; অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির (phrase) শেষে উপচ্ছেদ ও বাক্য বা খণ্ডবাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ থাকে। যে কোন রকম গদ্যে উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যতি (metrical

pause) অর্থের সম্পূর্ণতার অপেক্ষা করে না, বাগ্‌যন্ত্রের প্রয়াসের মাত্রার উপর নির্ভর করে। যতির অবস্থানের দ্বারাই ছন্দের আদর্শ বুঝা যায়। কাব্যছন্দে পরিমিত কালানন্তরে যতি থাকিবেই। অনেক সময়েই অবশ্য যতি কোন না কোন প্রকার ছেদের সহিত মিলিয়া যায়, সেখানে ধ্বনির বিরতির সহিত যতি এক হইয়া যায়। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। সে ক্ষেত্রে স্বরের তীব্রতার বা গাম্ভীর্য্যের হ্রাস অথবা শুধু একটা সুরের টান দিয়া যতির অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। যতি-পতনের সময়েই বাগ্‌যন্ত্রের একটি প্রয়াসের শেষ এবং আর একটি প্রয়াসের জন্য শক্তি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। **কাব্যছন্দে যতির অবস্থানের দ্বারা ছন্দোবন্ধের আদর্শ সূচিত হয়, ছেদের অবস্থানের দ্বারা তাহার অন্বয় বুঝা যায়।** সুতরাং যতি ও ছেদ দুটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কবিতায় স্থান পাইয়া থাকে। যে কোন রকম ছন্দের দ্যোতনা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে ঐক্যের সহিত বৈচিত্র্যের সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। অমিতাক্ষর ছন্দে যতির দ্বারা ঐক্য এবং ছেদের দ্বারা বৈচিত্র্য সূচিত হয়। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রত্যেক পংক্তিই এক একটি চরণ সুতরাং প্রত্যেক পংক্তির শেষে পূর্ণ-যতি থাকে। প্রতি পংক্তিতে বা চরণে ৮ মাত্রা ও ৬ মাত্রার দুইটি পর্ব্ব, সুতরাং প্রত্যেক পংক্তিতে ৮ মাত্রার পর একটি অর্দ্ধযতি থাকে। এইরূপে সুদৃঢ় ঐক্যসূত্রে ঐ ছন্দ গ্রথিত। কিন্তু মধুসূদনের ছন্দে ছেদ যতির অনুগামী নহে; নানা বিচিত্র অবস্থানে থাকিয়া ছেদ বৈচিত্র্য উৎপাদন করে। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ, সেখানে পূর্ণযতি প্রায়ই থাকে না; অনেক সময়, সে স্থলে কোন যতিই একেবারে থাকে না, পর্ব্বের মধ্যে ছেদের অবস্থান হয়। এইরূপে মধুসূদনের ছন্দ যতি অনুসারে ও ছেদ অনুসারে দুই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে বিভক্ত হয়। এই দুই প্রকার বিভাগের সূত্র ধূপছায়া রঙের বস্ত্রখণ্ডের টানা ও পোড়েনের মত পরস্পরের সহিত বিজড়িত অথচ প্রতিগামী হইয়া রসানুভূতির বিচিত্র বিলাস উৎপাদন করে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের অমিতাক্ষর ছন্দ এক রকম মধুসূদনের ছন্দের অনুযায়ী, অর্থাৎ প্রতি পংক্তি-চরণে ১৪ মাত্রা, এবং প্রত্যেক চরণে ৮ মাত্রা ও ৬ মাত্রার পর যতি। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মধুসূদনের অনুসরণ তিনি তখন করেন নাই, ছেদ ও যতির পরস্পর বিয়োগের যে চরম সীমা মধুসূদনের ছন্দে দেখা যায়, ততদূর রবীন্দ্রনাথ কখনও অগ্রসর হন নাই। বরং নবীন সেন প্রভৃতি কবিগণের ছন্দে অমিতাক্ষরের যে মৃদুতর রূপ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ

তাহারই অনুসরণ করিতেন। এক একটি অর্থসূচক বাক্য-সমষ্টির মধ্যে যতি স্থাপন অথবা পর্ব্বের মধ্যে ছেদ স্থাপনের রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনই প্রসন্ন নহেন। তদ্ভিন্ন মিত্রাক্ষরের রীতি তিনি অমিতাক্ষরের মধ্যেও চালাইবার পক্ষপাতী। সুতরাং তাঁহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রথম বৈচিত্র্যের মনোহারিত্ব তত লক্ষিত হইত না। ক্রমশঃ তিনি প্রত্যেক চরণে ঠিক ৮ মাত্রার পরে যতি স্থাপনের রীতি তুলিয়া দিলেন, আবশ্যকমত ৪, ৬, ১০ মাত্রার পরেও যতি দিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৪ মাত্রার পর পূর্ণযতি রাখিয়া তিনি ছন্দের ঐক্যসূত্র বজায় রাখিলেন। চরণের মধ্যে যতি স্থাপনের নিয়মানুবর্ত্তিতা তুলিয়া দেওয়ার জন্য ছন্দের ঐক্যসূত্র কতকটা শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু চরণের অন্তে মিত্রাক্ষর থাকায় পূর্ণযতিটি ও ঐক্যসূত্রটি সুস্পষ্ট হইতে লাগিল। মিত্রাক্ষরের প্রভাব বলবৎ করিবার জন্য তিনি চরণের অন্তে উপচ্ছেদ প্রায়ই রাখিয়াছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষরে চরণে পর্ব্বের মাত্রার দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু ছেদ ও যতির সম্পর্কের দিক্ দিয়া তত বেশী বৈচিত্র্য নাই। যেখানেই যতি সেখানেই কোন না কোন ছেদ আছে; তবে পূর্ণযতি পূর্ণচ্ছেদের অনুগামী নহে।* রবীন্দ্রনাথের ১৮ মাত্রার অমিতাক্ষরেও এই লক্ষণ বর্ত্তমান। সাধারণতঃ ১৮ মাত্রার ছন্দে প্রতি চরণে ৮ ও ১০ মাত্রার করিয়া দুইটি পর্ব্ব দিয়াছেন, কিন্তু এখানেও অনেক সময়ে পর্ব্বের মাত্রার দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন।

'বলাকা'র কতকগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অমিতাক্ষর ছন্দের একটু পরিবর্ত্তিত রূপ দেখা যায়। 'বলাকা'র ১৭ সংখ্যক কবিতাটির প্রথম স্তবকটি লওয়া যাক্। মুদ্রিত গ্রন্থে এইভাবে পংক্তিগুলি সজ্জিত হইয়াছে—

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

---

* এরূপ ছন্দকে শুধু প্রবহমান পয়ার (অ-মিল বা স-মিল) বলা-ই যথেষ্ট নহে।

এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ নহে, প্রত্যেক পংক্তির মধ্যে ছন্দোবন্ধের আদর্শের পূর্ণতা ঘটে নাই। কিন্তু প্রত্যেক পংক্তির শেষে অন্ত্যানুপ্রাস আছে, এবং এই অন্ত্যানুপ্রাসের রীতি-বৈচিত্র্য হিসাবেই বিচিত্র-ভাবে পংক্তিগুলির দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক পংক্তির শেষে কোন না কোন প্রকারের ছেদ আছে, সুতরাং ধ্বনির বিরতি ঘটিতেছে। ছেদের সহিত অন্ত্যানুপ্রাসের একত্র অবস্থান হওয়াতে অন্ত্যানুপ্রাসের প্রভাব বলবৎ হইয়াছে, এবং তাহার দ্বারা স্তবকের মধ্যে ছন্দোবিভাগগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ কত মাত্রার পরে থাকিবে সে সম্বন্ধে এখানে কোন নিয়ম নাই। সুতরাং এ ছন্দ অমিতাক্ষর জাতীয়। কিন্তু অমিতাক্ষর ছন্দেও যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া কোন প্রকার আদর্শের বন্ধন থাকিতে পারে। যতির অবস্থান বিবেচনা করিলে এই ছন্দ যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ১৪ মাত্রার অমিতাক্ষরেরই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

(ক) (ক)
হে ভুবন * আমি যতক্ষণ * তোমারে না

(খ) (ক) (খ)
বেসেছিনু ভালো * * ততক্ষণ * তব আলো *

(ক)
খুঁজে খুঁজে পায় নাই * তার সব ধন। * *

(ক) (ক)
ততক্ষণ * নিখিল গগন * হাতে নিয়ে

(গ)
দীপ তার * শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে। * *

এইভাবে লিখিলে ইহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। ছেদের উপরে সূচী-অক্ষর দিয়া মিত্রাক্ষরের রীতি দর্শিত হইয়াছে। এখানে প্রতি পংক্তিকে এক একটি চরণের অর্থাৎ ছন্দের আদর্শানুযায়ী এক একটি বৃহত্তর বিভাগের সমান করিয়া লেখা হইয়াছে। প্রত্যেক চরণের শেষে যতির স্থান আছে, যদিও সর্ব্বদা ছেদ নাই। যেখানে চরণের শেষে ছেদ নাই, সেখানে ধ্বনিপ্রবাহের বিরতি ঘটিবে না, কিন্তু জিহ্বার ক্রিয়ার বিরাম ঘটিবে, ধ্বনির তীব্রতার হ্রাস হইবে, শুধু একটা সুরের টান থাকিবে ; সেই সময়ে বাগ্‌যন্ত্র নূতন করিয়া শক্তির আহরণ করিবে। অন্যান্য সাধারণ অমিতাক্ষর ছন্দের ন্যায় এখানেও চরণের দৈর্ঘ্যের একটা স্থির পরিমাণ আছে। দেখা যাইতেছে যে এস্থলে প্রতি চরণ-ই সাধারণ

অমিতাক্ষরের ন্যায় ১৪ মাত্রার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে অমিতাক্ষর ছন্দে চরণের শেষে মিত্রাক্ষর রাখিতেন। এখানে চরণের শেষে পূর্ণযতির সঙ্গে সঙ্গে মিত্রাক্ষর না দিয়া এক একটি অর্থসূচক বাক্যাংশের শেষে অর্থাৎ ছেদের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রাক্ষর রাখিয়াছেন,—এই টুকু এ ছন্দের নূতনত্ব। ফলে অবশ্য যতির বন্ধনটি এ ছন্দে তত সুস্পষ্ট নহে। সুতরাং এ ছন্দে ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্যের প্রভাবই অধিক। যাহা হউক, যখন এখানে যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া একটা নিয়মের বন্ধন আছে তখন ইহাকে free verse বলা ঠিক সঙ্গত হইবে না। ইহাকে free verse বলিলে 'রাজা ও রাণী'র blank verseকেও free verse বলা উচিত। সেখানেও ছেদের অবস্থানের দিক্ দিয়া কোন ঐক্যসূত্র পাওয়া যায় না, মাত্র একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার (১৪ মাত্রার) পরে একটা যতি দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে নমুনা দিতেছি—

> "আমি এ রাজ্যের রাণী *—তুমি মন্ত্রী বুঝি ?" * *
> "প্রণাম, জননি। * * দাস আমি, * * কেন মাতঃ, *
> অন্তঃপুর ছেড়ে আজ * মন্ত্রগৃহে কেন ? * *"
> "প্রজার ক্রন্দন শুনে * পারি নে তিষ্টিতে
> অন্তঃপুরে। * * এসেছি করিতে প্রতীকার। * *"

এখানেও ছেদ বা উপচ্ছেদের অবস্থানের কোন নিয়ম নাই। চরণের শেষে কেবল একটা যতি আছে,—সঙ্গে সঙ্গে কখন উপচ্ছেদ, কখন পূর্ণচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কখন আবার কোন রকমের ছেদ-ই দেখা যায় না। অধিকন্তু এখানে মিত্রাক্ষর মোটেই নাই। তথাপি পংক্তির শেষে যতি থাকার জন্য ইহাকে সাধারণ blank verse বলিয়া অভিহিত করা হয়, free verse বলা হয় না। সে হিসাবে 'বলাকা' হইতে উদ্ধৃত পংক্তি কয়টিকে blank verse বা অমিতাক্ষর বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, free verse আখ্যা দিবার আবশ্যকতা নাই।

'বলাকা'র ছন্দ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে হইলে আর একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। বাংলা পদ্যে মাঝে মাঝে ছন্দের অতিরিক্ত দুই একটি শব্দ ব্যবহারের রীতি আছে। পূর্ব্বে নজরুল্ ইস্‌লামের 'বিদ্রোহী' কবিতা হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে এইরূপ ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ আছে। নদীর মধ্যে মধ্যে শিলাখণ্ড থাকিলে যেমন স্রোতের প্রবাহ উচ্ছল ও আবর্ত্তময় হইয়া উঠে,

ছন্দঃপ্রবাহের মধ্যে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ মাঝে মাঝে থাকিলে তদ্রূপ একটা উচ্ছল ভাব ও বৈচিত্র্য আসে। এই জন্যই বাংলা কীর্ত্তনে 'আখর' যোগ দেওয়ার পদ্ধতি আছে। বলা বাহুল্য এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ-যোজনা খুব নিয়মিতভাবে করা উচিত নহে, তাহা হইলে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। পর্ব্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে (কখন কখন, পরে) এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ যোজনা করা হয়। ছন্দের বিশ্লেষণ করার সময়ে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে।

'বলাকা'র ছন্দে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ প্রায়ই সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ছন্দোবন্ধের অন্তর্ভুক্ত পদের সহিত অতিরিক্ত শব্দসমষ্টির অন্ত্যানুপ্রাস রাখিয়া তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা হইয়াছে; অন্বয়ের দিক্ দিয়াও ছন্দোবন্ধের অন্তর্ভুক্ত পদের সহিত এতাদৃশ অতিরিক্ত পদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের চেনা একটু শক্ত হইতে পারে। কিন্তু যথোচিত আবৃত্তিতে তাহাদের প্রকৃতি স্পষ্ট ধরা যায়। এই অতিরিক্ত পদগুলিকে চিনিয়া ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে পারিলে 'বলাকা'র অনেক কবিতার ছন্দে গঠন সরল বলিয়া প্রতীত হইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মুদ্রিত গ্রন্থের পংক্তির অনুসরণ না করিয়া ছন্দের খাঁটি চরণ ধরিয়া পংক্তিগুলি নূতন করিয়া সাজাইতেছি।

১১ সংখ্যক কবিতাটি হইতে নিম্নের অংশটি লইয়া ছন্দোলিপি করিতেছি :—

নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে	= ১০
তাদের কলুষরক্ত | নয়নের পরে ;	= ৮ + ৬ = ১৪
শুভ্র নব মল্লিকার বাস	= ১০
স্পর্শ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নিশ্বাস ;	= ৮ + ৬ = ১৪
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা	= ১০
সপ্তর্ষির পূজা-দীপ-মালা	= ১০
তাদের মত্ততা পানে | সারারাত্রি চায়—	= ৮ + ৬ = ১৪
(হে সুন্দর,) তব গায় * ধুলা দিয়ে | যারা চলে যায় !	= ৮ + ৬ = ১৪
(হে সুন্দর,) তোমার বিচার ঘর | পুষ্পবনে, পুণ্য সমীরণে,	= ৮ + ১০ = ১৮
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গগুঞ্জনে,	= ১০
বসন্তের বিহঙ্গ-কূজনে,	= ১০
তরঙ্গ-চুম্বিত তীরে | মর্ম্মরিত-পল্লব-বীজনে।	৮ + ১০ = ১৮

অতিরিক্ত পদগুলিকে বাদ দিলে এস্থলে সাধারণ মিতাক্ষর স্তবকের লক্ষণ

দৃষ্ট হইতেছে। ৮, ৬ ও ১০ মাত্রার একটি কি দুইটি পর্ব্ব লইয়া এক একটি চরণ, এবং প্রত্যেক চার চরণে এক একটি স্তবক গঠিত হইয়াছে। সর্ব্বদাই যে চার চরণের স্তবক পাওয়া যাইবে তাহা নয়, কখন কখন দুই, তিন, পাঁচ ইত্যাদি সংখ্যার চরণ লইয়া স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যাইবে।

এ কথা জানিতে তুমি, | ভারত-ঈশ্বর শাজাহান	=৮+১০=১৮
কালস্রোতে ভেসে যায় | জীবন যৌবন ধনমান।	=৮+১০=১৮
শুধু তব অন্তরবেদনা	=০+১০=১০
চিরন্তন হয়ে থাক | সম্রাটের ছিল এ সাধনা।	=৮+১০=১৮
রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন	=০+১০=১০
সন্ধ্যারক্তরাগ সম | তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,	=৮+১০=১৮
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস	=০+১০=১০
নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে | সকরুণ করুক আকাশ	=৮+১০=১৮
এই তব মনে ছিল আশ।	=০+১০=১০
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা	=০+১০=১০
যেন শূন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা	=৮+১০=১৮
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্	=০+১০=১০
(শুধু থাক্) একবিন্দু নয়নের জল	=০+১০=১০
কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্জ্বল	=৮+৬ =১৪
এ তাজমহল।	=০+৬ =৬

এই সব স্থলেও দেখা যাইতেছে যে চরণের মধ্যে পর্ব্বসমাবেশ এবং চরণের সমাবেশে স্তবক গঠনের বেশ একটা আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে। পূর্ণ চরণ মাত্রেই দ্বিপর্ব্বিক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে। পূর্ণ-পর্ব্বিক ও অপূর্ণ-পর্ব্বিক চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করা রবীন্দ্রনাথের একটি সুপরিচিত কৌশল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'পূরবী' পর্য্যন্ত প্রায় সব কাব্যেই তিনি ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। উপরের উদাহরণে ছন্দের যে আদর্শ, তাহা 'পূরবী'র 'অন্ধকার' প্রভৃতি কবিতাতেও পাওয়া যায়; কেবল মাত্র কখন কখন অতিরিক্ত পদ যোজনা এবং মিত্রাক্ষরের ব্যবহারের দিক্ দিয়া এখানে একটু বিশেষত্ব আছে। কিন্তু নিম্নলিখিত পংক্তিপর্য্যায়কে কি কেহ free verse বলিবেন?

উদয়াস্ত দুই তটে | অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।

প্রভাত-আলোকচ্ছটা । শুভ্র তব আজি শঙ্খধ্বনি
চিত্তের কন্দরে মোর । বেজেছিলো * একদা যেমনি
নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি' ;
সে তব সঙ্কেত মন্ত্র । ধ্বনিয়াছে হে মৌনী মহান,
কর্ম্মের তরঙ্গে মোর ; । * * স্বপ্ন-উৎস হ'তে মোর গান
উঠেছে ব্যাকুলি' ।

(পূরবী—অন্ধকার)

এখানে ছন্দের যে প্রকৃতি, 'বলাকা'র 'শাজাহান' হইতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতেও মূলতঃ তাহাই।

Free verse কাহাকে বলে? যেখানে verse বা পদ্য নিয়মের নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাবিহারী ও কেবলমাত্র ভাব-তরঙ্গের অনুসারী, সেখানে free verse আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাকে কি আদৌ verse বা পদ্য বলা যায়? দু'একটি বিষয়ে অন্ততঃ সমস্ত পদ্যকেই নিয়মের অধীন হইতে হইবে। পদ্যের উপকরণ পর্ব্ব ; সুতরাং বিশিষ্ট ধ্বনিলক্ষণযুক্ত, যথোচিত রীতি অনুসারে পর্ব্বাঙ্গ সমাবেশে গঠিত পর্ব্ব সমস্ত পদ্যেই থাকিবে। গদ্যে সেরূপ থাকার প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু পদ্যে পর্ব্ব-যোজনার দিক্ দিয়া কোন না কোন আদর্শের অনুসরণ করা হয়, এবং তজ্জন্য পর্ব্বপরম্পরার মধ্যে এক প্রকার ঐক্যের বন্ধন লক্ষিত হয়। পর্ব্বের মাত্রার দিক্ দিয়া, অথবা চরণের মাত্রা কিম্বা গঠনের সূত্রের দিক্ দিয়া, অথবা স্তবকের গঠনের সূত্র দিয়া এই ঐক্যবন্ধন লক্ষিত হয়। সুপ্রচলিত অনেক ছন্দেই এই তিন দিক্ দিয়াই ঐক্য থাকে। কিন্তু সব দিক্ দিয়া ঐক্য থাকার আবশ্যিকতা নাই, এক দিকে ঐক্য থাকিলেই পদ্যের পক্ষে যথেষ্ট। পদ্যের ব্যঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে ঐক্যের সহিত বৈচিত্র্যের যোগ হওয়া দরকার। এজন্য অনেক সময়ই কবিরা উপর্য্যুক্ত কয়েকটি দিকের এক বা ততোধিক দিক্ দিয়া ঐক্য বজায় রাখেন এবং বাকি দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন। এতদ্ভিন্ন অর্দ্ধ-যতি ও পূর্ণযতির সহিত উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের সংযোগ বা বিয়োগ অনুসারে-ও নানারূপে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে কবিরা ঐক্যের দিকেই নজর দিতেন, সুতরাং ছন্দের দ্বারা বিচিত্র ভাববিলাসের ব্যঞ্জনা করা সম্ভব হইত না। মধুসূদন ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য আনিবার জন্য যতি ও ছেদের বিয়োগ ঘটাইয়া অমিতাক্ষর সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু ছন্দের কাঠামের কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না, পর্ব্বের ও চরণের মাত্রার দিক্ দিয়া সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মের

অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কবিরা মধুসূদনের ন্যায় ছেদ ও যতির বিয়োগ ঘটাইতে ততটা সাহসী হইলেন না; সাধারণ রীতি অনুসারে যতি ও ছেদের মৈত্রী বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই চেষ্টা তাঁহার কাব্যজীবনের প্রথম হইতেই দেখা যায়। ছেদ ও যতির একান্ত বিয়োগ তাঁহার কাছে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রীতির বিরোধী বলিয়া মনে হইল। সুতরাং তিনি ছন্দে অন্য উপায়ে অর্থাৎ ছন্দোবন্ধের ঐক্যসূত্রের নিগড় শ্লথ করিয়া বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কিরূপে নানাসময়ে নানাভাবে তিনি ছন্দের মধ্যে কোন কোন দিক্ দিয়া ঐক্য রাখিয়া অপরাপর দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। অমিতাক্ষর ছন্দেও তিনি কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বৈচিত্র্যের জন্য সেখানে ছন্দ ও যতির বিয়োগের উপর নির্ভর না করিয়া পর্ব্বের মাত্রার দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যপন্থী হইলেও বিপ্লবপন্থী নহেন। এ কথা তাঁহার ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যেমন খাটে, তাঁহার ছন্দ সম্বন্ধেও তেমন খাটে। সম্পূর্ণরূপে free verse অর্থাৎ পর্ব্ব, চরণ বা স্তবকের মাত্রা বা গঠন-রীতির দিক্ দিয়া কোন আদর্শের প্রভাব হইতে একান্তভাবে মুক্ত ছন্দ তিনি খুব কমই রচনা করিয়াছেন। 'বলাকা' হইতে যে কয় রকমের নমুনা দেওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন আদর্শের প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে 'শাজাহান' প্রভৃতি কবিতায় আদর্শ স্থির নহে, পরিবর্ত্তনশীল। কয়েকটি পংক্তির মধ্যে কোন এক রকমের আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে, পরবর্ত্তী পংক্তিপর্য্যায়ে আবার অন্য এক রকম আদর্শ ফুটিতেছে। কিন্তু এ জন্য ঐ জাতীয় কবিতায় কোন আদর্শের স্থান নাই এ কথা বলা চলে কি?

'বলাকা'র নিম্নলিখিত চরণপরম্পরায় যে ধরণের ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ free verseএর কাছাকাছি আসিয়াছেন—

	মাত্রাসংখ্যা	পর্ব্বসংখ্যা
যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে | ক্লান্তিভরে॰ দাঁড়াও থমকি',	=১০+১০	—২
তখনি চমকি' | উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব | পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে ;	=৬+৮+১০	—৩
পঙ্গু মূক | কবন্ধ বধির আঁধা | স্থূল তনু ভয়ঙ্করী বাধা	=৪+৮+১০	—৩
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে | দাঁড়াইবে পথে ;	=৮+৬	—২

	মাত্রাসংখ্যা	পর্ব্বসংখ্যা
অণুতম পরমাণু | আপনার ভারে | সঞ্চয়ের অচল বিকারে	=৮+৬+১০	—৩
বিদ্ধ হবে | আকাশের মর্ম্মমূলে | কলুষের বেদনার শূলে	=৪+৮+১০	—৩
ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী | অলক্ষ্য সুন্দরী,	=১০+৬	—২
তব নৃত্য-মন্দাকিনী | নিত্য ঝরি' ঝরি'	=৮+৬	—২
তুলিতেছে শুচি করি' | মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।	=৮+১০	—২
নিঃশেষ নির্ম্মল নীলে | বিকাশিছে নিখিল গগন।	=৮+১০	—২

তত্রাচ এখানেও চরণে পর্ব্বসংখ্যা বিবেচনা করিলে একপ্রকার আদর্শ অনুযায়ী স্তবক গঠনের আভাস রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকেও free verse বলা ঠিক উচিত নয়। Christabel প্রভৃতি কবিতাতে foot বা lineএর দৈর্ঘ্যের দিক দিয়া নিয়মের নিগড় নাই, কিন্তু তাহাকে free verse বলা হয় না, কারণ সেখানেও আদর্শের বন্ধন আছে। তবে free verse কথাটি তত সূক্ষ্ম অর্থে না ধরিলে এ রকম ছন্দকে free verse বলা চলিতে পারে, কারণ পর্ব্বের মাত্রা বা চরণের মাত্রার দিক্ দিয়া এখানে কোন আদর্শের অনুসরণ করা হয় নাই। *

তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যজীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছিয়া যথার্থ free verse বা মুক্ত ছন্দের কবিতা লিখিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা তাঁহার শেষ রচনা—'তোমার সৃষ্টির পথ' কবিতাটি উল্লেখ করিতে পারি।

	মাত্রাসংখ্যা
তোমার সৃষ্টির পথ | রেখেছ আকীর্ণ করি	=৮+৮
বিচিত্র ছলনা জালে, | হে ছলনাময়ী |	=৮+৬
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ | পেতেছ নিপুণ হাতে | সরল জীবনে	=৮+৮+৬
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে— | মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;	=৮+১০
তার তরে | রাখনি গোপন রাত্রি।	=৪+৮
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে | যে পথ দেখায়	=৮+৬
সে যে তার | অন্তরের পথ,	=৪+৬
সে যে চিরস্বচ্ছ,	=০+৬

* মৎপ্রণীত Studies in Rabindranath's Prosody দ্রষ্টব্য।

	মাত্রাসংখ্যা
সহজ বিশ্বাসে সে যে ‖ করে তারে চিরসমুজ্জ্বল,	=৮+১০
বাহিরে কুটিল হোক ‖ অন্তরে সে ঋজু,	=৮+৬
এই নিয়ে ‖ তাহার গৌরব,	=৪+৬
লোকে তারে ‖ বলে বিড়ম্বিত,	=৪+৬
সত্যেরে সে পায়	=০+৬
আপন আলোক ধৌত ‖ অন্তরে অন্তরে,	=৮+৬
কিছুতে পারে না ‖ তারে প্রবঞ্চিতে,	=৬+৬
শেষ পুরস্কার নিয়ে ‖ যায় সে যে ‖ আপন ভাণ্ডারে।	=৮+৪+৬
অনায়াসে যে পেয়েছে ‖ ছলনা সহিতে	=৮+৬
সে পায় তোমার হাতে	=৮+০
শান্তির অক্ষয় অধিকার।	=০+১০

গিরিশ ঘোষের নাটকে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকেও free verse নাম দেওয়া যাইতে পারে। *

এই সব ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষরের প্রভাব নাই, এক একটি চরণ যেন অপর চরণগুলি হইতে বিযুক্ত হইয়া আছে। পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা স্থির নাই; চার, ছয়, আট, দশ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার দেখা যায়; ভাব গম্ভীর হইলে আট ও দশ মাত্রার, এবং লঘু হইলে ছয় ও চার মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়। অবশ্য প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ মাত্র দুইটি করিয়া পর্ব্ব আছে, কিন্তু কেবল সে জন্যই একটা আদর্শের বন্ধন আছে বলা যায় না; কারণ পর পর চরণ সহযোগে কোনরূপ স্তবক গঠনের আভাস নাই।

এই রকম ছন্দ, যাহাকে prose-verse বলা হয় তাহা হইতে বিভিন্ন। Free verseএ পদ্যছন্দের উপকরণ আছে, কিন্তু উপকরণের সমাবেশের দিক্ দিয়া পদ্যের আদর্শের বন্ধন নাই। Prose verseএ পদ্যছন্দের উপকরণ অর্থাৎ পর্ব্ব নাই। এক একটি phrase বা অর্থসূচক শব্দসমষ্টি prose-verseএর উপাদান। সুতরাং prose-verseএ যতি ও ছেদের বিয়োগের কথা উঠিতে পারে না। Prose-verseএর এক একটি উপকরণের পরিচয় মাত্রা বা অন্য কোনরূপ ধ্বনিগত লক্ষণের দিক্ দিয়া নহে। Prose-verseএ পদ্যছন্দের উপকরণ নাই,

* 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' অধ্যায়ে পৃঃ ৪৫ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু পদ্যছন্দের আদর্শ আছে। উদাহরণস্বরূপ Walt Whitman হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

All the past | we leave behind,
We debouch | upon a newer | mightier world, | varied world,
Fresh and strong | the world we seize, | world of labour | and the march,
Pioneers ! | O Pioneers !

We detachments | steady throwing, |
Down the edges, | through the passes, | up the mountains | steep
Conquering, holding, | daring, venturing | as we go |
the unknown ways,
Pioneers ! | O Pioneers !

এখানে প্রথম চারিটি পংক্তি লইয়া একটি এবং শেষ চারিটি পংক্তি লইয়া আর একটি পদ্যছন্দের আদর্শানুযায়ী স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে। প্রথম পংক্তিতে দুইটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে চারিটি করিয়া এবং চতুর্থে দুইটি phrase ব্যবহৃত হইয়াছে। এক একটি phraseএ কম বেশী চার syllable থাকিলেও, কোন ধ্বনিগত ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া এক একটি বিভাগ করা হয় নাই। এইরূপ prose-verse রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'য় ব্যবহার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েক ছত্রের ছন্দোলিপি দিতেছি—

এখানে নাম্‌লো সন্ধ্যা।
সূর্য্যদেব, | কোন দেশে | কোন সমুদ্র পারে | তোমার প্রভাত হলো ?

অন্ধকারে (এখানে) | কেঁপে উঠ্‌ছে | রজনীগন্ধা
বাসর ঘরের | দ্বারের কাছে | অবগুণ্ঠিতা | নব বধূর মতো ;
কোনখানে (ফুট্‌লো) | ভোর বেলাকার | কনক-চাঁপা ?

জাগ্‌লো কে ?
নিবিয়ে দিলো | সন্ধ্যায় জ্বালান দীপ
ফেলে দিলো | রাত্রে গাঁথা | সেঁউতি ফুলের মালা।

'লিপিকা'য় prose-verse বা গদ্য কবিতার ছাঁচ অনেকটা অস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ পদ্যের সুস্পষ্ট আদর্শে গদ্যপর্ব্ব অর্থাৎ phrase সমাবেশ করিয়া গদ্যকবিতা রচনা করিয়াছেন পরে 'পুনশ্চ' 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি পংক্তি 'শেষ সপ্তক' হইতে পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

১ ২ | ১ ২
ভালো বেসে | মন বললে

১ ২ | ১ ২
"(আমার) সব রাজত্ব | দিলেম তোমাকে।"

১ ২ | ১ ২
অবুঝ ইচ্ছাটা | করলে অত্যুক্তি

১ | ১ ২
দিতে | পারবে কেন ?

১ ২ ৩ | ১ ২
সবটার নাগাল পাব | কেমন ক'রে ?

১ | ১ ২
ওযে | একটা মহাদেশ

১ ২ | ১
সাত সমুদ্রে | বিচ্ছিন্ন

১ ২ ৩ | ১ ২ ৩
(ওখানে) বহু দূর নিয়ে | একা বিরাজ করছে

১ ২ | ১ ২
নির্ব্বাক্ | অনতিক্রমণীয়

এখানে প্রত্যেক চরণেই দুইটি করিয়া গদ্যপর্ব্ব আছে, এবং কয়েকটি চরণ লইয়া যেন একটি স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে। গদ্যের এক একটি পর্ব্বের যে লক্ষণের কথা 'গদ্যের ছন্দ' শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, তাহা এই উদ্ধৃতির এক একটি বাক্যাংশে আছে। অন্যান্য নানাবিধ আদর্শেও গদ্যকবিতা গঠিত হইতে পারে।

১ ২ | ১ ২ ৩ | ১ ২ | ১ ২ ১ | ১ ২
এক দিন | নিম ফুলের গন্ধ | অন্ধকার ঘরে | অনির্ব্বচনীয়ের আমন্ত্রণ | নিয়ে এসেছে

১ | ১ ২ | ১ ২ | ১
মহিষী | বিছানা ছেড়ে | বাতায়নের কাছে এসে | দাঁড়ালো

১ | ১ ২ | ১
মহিষীর | সমস্ত দেহ | কম্পিত

১ ২ | ১
ঝিল্লী-ঝঙ্কৃত | রাত

১ ২ ৩ | ১
কৃষ্ণ-পক্ষের চাঁদ | দিগন্তে

(শাপমোচন—পুনশ্চ)

এখানে পর্ব্বসংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে—পর্ব্বসংখ্যা যথাক্রমে ৫, ৪, ৩, ২, ২। এখানেও একটা বিশিষ্ট পরিপাটী আছে।

এতদ্ভিন্ন স্তবকের আভাসবর্জ্জিত মুক্তবন্ধ ছন্দে গদ্যকবিতাও রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছেন। এই ধরণের গদ্যকবিতায় চরণের দৈর্ঘ্য, পর্ব্বসংখ্যা, পর্ব্বের গুরুত্ব ইত্যাদি মাত্র ভাব-তরঙ্গের উত্থান-পতন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, কোন

একটা বিশেষ প্রকার সৌন্দর্য্যের প্রতীকৃস্থানীয় পরিপাটীর প্রভাব নাই। 'শেষলেখা'র 'তোমার সৃষ্টির পথ' প্রভৃতি কবিতার ছন্দের সহিত এই ধরণের গদ্যকবিতার ছন্দ তুলনীয়। 'শেষ সপ্তকে'র 'পঁচিশে বৈশাখ' প্রভৃতি এই মুক্তবন্ধ গদ্যকবিতার উদাহরণ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে 'পঁচিশে বৈশাখে' ছন্দের উপকরণগুলি গদ্যপর্ব্ব, কিন্তু 'তোমার সৃষ্টির পথ' প্রভৃতিতে উপকরণগুলি পদ্যের পর্ব্ব। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

১ | ১ ২ | ১ ২ | ১ ২ ৩
তখন | কানে কানে | মৃদু গলায় | তাদের কথা শুনেছি,

১ ২ | ১ ২
কিছু বুঝেছি, | কিছু বুঝি নি।

১ | ১ ২ | ১ ২
দেখেছি | কালো চোখের | পক্ষ্ম রেখায়

১ ২
জলের আভাস;

১ | ১ ২ | ১ ২
দেখেছি | কম্পিত অধরে | নিমীলিত বাণীর

১
বেদনা;

১ | ১ ২
শুনেছি | কণিত কঙ্কণে

১ ২ | ১ ২
চঞ্চল আগ্রহের | চকিত ঝংকার।

এরূপ রচনা মুক্তবন্ধ গদ্যকবিতা হইলেও ইহা ঠিক গদ্য নহে। প্রায় প্রত্যেকটি পর্ব্বে পদ্যপর্ব্বের বিশিষ্ট স্পন্দন ও গঠনপদ্ধতির আভাস আছে; চরণে পর্ব্বসংখ্যা ও পর্ব্বের পারম্পর্য্যের মধ্যেও পদ্যছন্দের রীতির প্রভাব আছে।

কিন্তু গদ্য কবিতার ছন্দ হইতে বিভিন্ন অন্য এক প্রকারের ছন্দ গদ্যে ব্যবহৃত হয়। Prose-verseএ গদ্য পদ্যের আদর্শের অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু এমন অনেক গদ্য আছে যাহাতে পদ্যের উপকরণ বা পদ্যের আদর্শ কিছুই নাই, অথচ নূতন এক প্রকারের ছন্দঃ-স্পন্দন অনুভূত হয়, নূতন এক প্রকৃতির রস মনে সঞ্চারিত হয়। ইংরাজীতে Gibbon, De Quincey, Ruskin, Carlyle প্রভৃতির রচনায় এই যথার্থ গদ্যছন্দের ঔৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। বাংলাতেও বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদি অনেক সুলেখকের রচনায়

গন্থছন্দ দেখা যায়। নমুনা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজন-ব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।"

গন্থছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটি কথা ও ইঙ্গিত 'গন্থের ছন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক মৎপ্রণীত The Rhythm of Bengali Prose and Prose-Verse (Cal. Univ. Journ. of Letters, XXXII) পাঠ করিতে পারেন। যাহা হউক, ঐক্যপ্রধান পন্থছন্দের ও বিশিষ্ট গন্থছন্দের মধ্যে নানা আদর্শের ছন্দ আছে তাহা লক্ষ্য করা দরকার। তাহারা সাধারণ ঐক্যপ্রধান পন্থছন্দের অনুরূপ নহে বলিয়াই তাহাদের শুধু 'মুক্তক' বলিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না।

বাংলায় ইংরাজী ছন্দ

কাহারও কাহারও মতে বাংলায় ইংরাজী ছন্দ বেশ চালান যাইতে পারে, এমন কি কোন কোন কবি নাকি ইংরাজী ছন্দে কোন কোন কবিতা রচনাও করিয়াছেন। ইংরাজী ছন্দের মূলতত্ত্বগুলি একটু অনুধাবন পূর্ব্বক আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে এ মত আদৌ বিচারসহ নহে।

প্রত্যেক ভাষার ছন্দের পদ্ধতি অক্ষরের কোন একটি লক্ষণকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠে। অক্ষরের দৈর্ঘ্য বা মাত্রা-ই যে বাংলা ছন্দের ভিত্তি-স্থানীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য বাংলা ছন্দ-কে quantitative বা মাত্রাগত বলা হয়। বাংলা ছন্দের উপকরণ এক একটি পর্ব্ব, এবং পর্ব্বের পরিচয় ইহার মাত্রা-সমষ্টিতে। বাংলা ছন্দের বিচার বা বিশ্লেষণের সময়ে আমরা দেখি এক একটি অক্ষরের কয় মাত্রা—তাহা হ্রস্ব না দীর্ঘ, এক মাত্রার না দুই মাত্রার; এবং তাহাদের সমাবেশে যে পর্ব্বাঙ্গ ও পর্ব্বগুলি গঠিত হইয়াছে তাহাদের মোট মাত্রাসংখ্যা কত। সমান সমান বা নিয়মিত মাত্রার পর্ব্ব লইয়াই বাংলা পদ্যের এক একটি চরণ রচিত হয়।

ইংরাজী ছন্দের মূল তথ্যই বিভিন্ন। ইংরাজী ছন্দ qualitative বা অক্ষরের গুণগত। Accent অর্থাৎ উচ্চারণের সময়ে অক্ষরের আপেক্ষিক গাম্ভীর্য্যের উপরই ইহার ভিত্তি। ইংরাজী ছন্দের উপকরণ এক একটি foot বা গণ, এবং foot-এর পরিচয় accented ও unaccented অক্ষরের সমাবেশ-রীতিতে। কোন একটি বিশেষ ছাঁচ অনুসারে ইংরাজী ছন্দের এক একটি foot গঠিত হয় এবং তদনুসারে প্রতি foot-এ accented ও unaccented অক্ষর সাজান হয়। সেই ছাঁচেই ইংরাজী foot-এর পরিচয়। ইংরাজী ছন্দের বিশ্লেষণের সময় আমরা দেখি কোন্ কোন অক্ষরে accent পড়িয়াছে এবং কোন্ কোন্ অক্ষরে পড়ে নাই, এবং কি রীতিতে তাহাদের পর পর সাজান হইয়াছে। সুতরাং ইংরাজী ছন্দ যে বাংলায় অচল তাহা সহজেই প্রতীত হয়।

তত্রাচ কোন কোন লেখক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধ ইংরাজী ছন্দের প্রতিনিধি-স্থানীয়, এবং সেই ছন্দোবন্ধে ইংরাজী ছন্দের যথেচ্ছ অনুকরণ করা যাইতে পারে। তাঁহাদের

ধারণা যে বাংলা ছন্দের শ্বাসাঘাত এবং ইংরাজী ছন্দের accent একই জিনিষ, সুতরাং ছন্দে যথেষ্ট সংখ্যক শ্বাসাঘাত দিয়া বাংলায় ইংরাজী ছন্দের অনুসরণ করার কোন বাধা নাই।

কিন্তু বাস্তবিক ইংরাজীর accent ও বাংলার শ্বাসাঘাত এক নহে। ইংরাজী accent-এর স্বরগাম্ভীর্য্য শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণের অনুসরণ করে, কিন্তু বাংলা ছন্দে শ্বাসাঘাতের স্বরগাম্ভীর্য্য স্বাভাবিক উচ্চারণের অতিরিক্ত একটা ঝোঁক। রবীন্দ্রনাথের

"চিন্তা দিতেম | জলাঞ্জলি | থাক্‌তো নাকো | ত্বরা"

এই চরণটিতে "তেম্‌" এই অক্ষরটির স্বরগাম্ভীর্য্য সাধারণ উচ্চারণের অনুসারী নহে। "চিন্‌" অক্ষরটির স্বরগাম্ভীর্য্য অবশ্য পরের অক্ষরটির অপেক্ষা স্বভাবতঃই বেশী, কিন্তু এই চরণটিতে ইহার স্বরগাম্ভীর্য্য শ্বাসাঘাতের জন্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। "লাঞ্‌" অক্ষরটির স্বরগাম্ভীর্য্য স্বভাবতঃ পূর্ব্বতন "জ" অক্ষরটির চেয়ে বেশী কি না খুব সন্দেহ, কিন্তু এখানে যে শ্বাসাঘাতের জন্য তাহা অনেক গুণ বাড়িয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্বাসাঘাতের জন্য কখন কখন অক্ষরের স্বাভাবিক উচ্চারণের পর্য্যন্ত ব্যতিক্রম হয়, যেখানে স্বভাবতঃ স্বরগাম্ভীর্য্য একেবারেই থাকিতে পারে না সেখানেও তীব্র গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের

রঙ্‌ যে ফুটে | ওঠে কতো
প্রাণের ব্যাকু | লতার মতো

এই চরণ দুইটির মধ্যে "ঠে" অক্ষরটির স্বরগাম্ভীর্য্য "ও" অক্ষরটির চেয়ে স্বভাবতঃ কম, কিন্তু শ্বাসাঘাতের জন্য তাহা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

বাংলা ছন্দের শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সঙ্কোচন ও দ্রুতলয়ে উচ্চারণ হয়। সুতরাং শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর মাত্রেই হ্রস্ব (২০শ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ইংরাজী accent-এর দরুণ কিন্তু অক্ষরের দৈর্ঘ্যের হ্রাস হয় না; বরং দীর্ঘ অক্ষরের উপরই accent প্রায়শঃ পড়ে, এবং ইহার প্রভাবে হ্রস্ব অক্ষর-ও দীর্ঘ অক্ষরের তুল্য হয়।

শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে প্রতি পর্ব্বে ৪ মাত্রা এবং সাধারণতঃ ৪টি করিয়া অক্ষর থাকে। কিন্তু ইংরাজী foot-এর এক একটিতে সাধারণতঃ ২টি বা ৩টি অক্ষর থাকে, তিনের অধিক সংখ্যক অক্ষর লইয়া ইংরাজী ছন্দের foot হয় না।

বাংলার পর্ব্বে শ্বাসাঘাত পড়িলে দুইটী স্বরাঘাত প্রায় থাকে, কিন্তু ইংরাজীর একটি foot-এ সাধারণতঃ মাত্র একটি accent থাকিতে পারে ; সুতরাং বাংলার পর্ব্ব-কে ইংরাজী foot-এর অনুরূপ বলা যায় না। প্রতি পর্ব্বের মধ্যে কয়েকটি গোটা শব্দ রাখাই বাংলা ছন্দের সাধারণ নীতি, কিন্তু ইংরাজী foot-এ তদ্রূপ কিছু করার কোন আবশ্যকতা নাই। যদি বাংলা ছন্দের পর্ব্বাঙ্গই ইংরাজী foot-এর অনুরূপ মনে করা হয়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে বাস্তবিক ইংরাজীর foot ও বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধের পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে বাস্তবিক কোন সাদৃশ্য নাই। এইরূপ পর্ব্বাঙ্গের প্রত্যেকটিতে শ্বাসাঘাত না থাকিতে পারে, এবং পর পর পর্ব্বাঙ্গগুলিতে শ্বাসাঘাতের অবস্থান এক না হইতেও পারে। পূর্ব্বে যে দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ইংরাজী মতে তাহাদের ছন্দোলিপি হইত—

/‿ | ‿ / | ‿/ | ‿‿ | /‿ | ‿‿ | ‿‿
চিন্তা | দিতেম | জলা | ঞ্জলি | থাকতো | নাকো | ত্বরা

/ ‿ | ‿‿ | ‿/ | ‿‿
রঙ যে | ফুটে | ওঠে | কতো

ছন্দের এরূপ বিভাগ ও গতি ইংরাজীতে অচল। ইংরাজীতে anapaest প্রভৃতি তিন অক্ষরের foot দিয়াই পদ্যের চরণ গঠিত হইতে পারে, কিন্তু বাংলায় শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে বরাবর তদ্রূপ পর্ব্বাঙ্গ ব্যবহার করা অসম্ভব। বাংলায় শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধের প্রতি পর্ব্বের পর একটি বিরামস্থান থাকে, ইংরাজীতে সেরূপ থাকার কোন প্রয়োজন নাই, প্রতি foot বা যুগ্ম দুইটি foot-এর পরে যে বিরামস্থান থাকিবে এমন কোন কথা নাই। ইংরাজীতে একটি foot-এর মধ্যেই একটি পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে, কিন্তু বাংলায় পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না। বাংলায় স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের কাঠাম বাঁধা, কিন্তু ইংরাজী ছন্দের ছাঁচ যে কতদূর পর্য্যন্ত চাপ ও টান সহ্য করিতে পারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় Coleridgeএর Christabel এবং ঐরূপ অন্যান্য কবিতায়। বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে যথার্থ অমিতাক্ষর বা blank verse লেখা যায় না, কিন্তু ইংরাজী ছন্দে নানা বিচিত্রভাবে ছেদের সহিত যতির সম্পর্ক স্থাপিত করা যায় বলিয়া ইংরাজীতে অমিতাক্ষর ছন্দ বেশ লেখা যায়। Paradise Lost, King Lear অথবা Shelley, Swinburne প্রভৃতির বিখ্যাত কবিতা হইতে কতকগুলি পংক্তি লইয়া বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে ফেলিবার চেষ্টা করিলেই এইরূপ প্রয়াসের ব্যর্থতা ও মূঢ়তা প্রতিপন্ন হইবে।

আধুনিক বাংলায় প্রত্যেক হলন্ত অক্ষরকেই দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া যে এক প্রকার মাত্রাচ্ছন্দ চলিতেছে, কেহ কেহ মনে করেন যে সেই ছন্দোবন্ধে সব রকম বিদেশী, মায় ইংরাজী ছন্দের অনুকরণ করা যায়। হলন্ত অক্ষরকে ইংরাজী accented এবং স্বরান্ত অক্ষরকে ইংরাজী unaccented অক্ষরের প্রতিনিধি-স্থানীয় মনে করিয়া বাহ্যতঃ অনেক সময়ে ইংরাজী ছন্দের অনুসরণ করা হইয়াছে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। যে রকম, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে

• — • | • — • | • — • | —
বসন্তে | ফুটন্ত | কুসুমটি | প্রায়

এই চরণটি ইংরাজী amphibrachic tetrameter-এর উদাহরণ। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে ইংরাজী amphibrach-এর সহিত ইহার সাদৃশ্য আপাত, যথার্থ নয়। প্রতি পর্ব্বে মোট চার মাত্রা আছে বলিয়াই এখানে ছন্দ বজায় আছে, ইংরাজী কোন foot-এর ছাঁচ অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া নয়। প্রথমতঃ, ইংরাজী accented অক্ষর ও বাংলা হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর ধ্বনির দিক্ দিয়া এক জিনিষ নয় ; সন্নিহিত অক্ষরের তুলনায় accented অক্ষরের যে ধ্বনিগৌরব আছে, বাংলা হলন্ত দীর্ঘ অক্ষরের তাহা নাই। হলন্ত অক্ষর স্বভাবতঃই স্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে দুই মাত্রা ধরার জন্য তাহাতে গুণগত কোন বিশেষত্বের উপলব্ধি হয় না। কেহ কেহ

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃ-শ্যামল

এই চরণ দুইটিকে ইংরাজী Iambic ছন্দোবন্ধের উদাহরণ মনে করেন। 'ম,' 'ভ' ইত্যাদিকে তাঁহারা unaccented অক্ষরের এবং 'হৎ,' 'য়ের' ইত্যাদিকে accented অক্ষরের প্রতিরূপ মনে করেন। কিন্তু বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে "হৎ," "য়ের," শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষর বলিয়া স্বভাবতঃ দীর্ঘ, তাহাদের যে সন্নিহিত অক্ষরের সহিত গুণগত কোন পার্থক্য বা বিশেষ কোন ধ্বনিগৌরব আছে তাহা কেহই বোধ করেন না। বরং বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ পদ্ধতিতে শব্দের শেষে স্বরগাম্ভীর্য্যের পতন হয় বলিয়া "ভয়ের," "সাগর" প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষরগুলিকে unstressed syllable-এর অনুরূপ বলাই উচিত। তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি লক্ষণ হইতে প্রমাণ করা যায় যে আসলে ইহাদের প্রকৃতি ইংরাজী ছন্দ হইতে বিভিন্ন। 'মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর'-কে বদলাইয়া যদি 'মহৎ ভয়েরি মুরতি সাগর' লেখা যায়, তবে ইংরাজী ছন্দের ছাঁচ

ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু বাংলার ছন্দ ঠিক বজায় থাকে। কারণ আসলে ঐ চরণের ভিত্তি ৬ মাত্রার পর্ব্ব, এবং ইহার ছন্দোলিপি হইবে—

•— ⋮ • — | •— ⋮ • —
মহৎ ⋮ ভয়ের | মুরৎ ⋮ সাগর

তাহা ছাড়া 'মহৎ' ও 'ভয়ের' মধ্যে যে ব্যবধান তাহা যতি নহে, কিন্তু 'ভয়ের' শব্দটির পরে একটি যতি পড়িয়াছে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই অনুভব করেন। কারণ "মহৎ ভয়ের" এই দুইটি শব্দ লইয়া একটি পর্ব্ব, এবং "মহৎ" একটি পর্ব্বাঙ্গ মাত্র। ইংরাজী ছন্দে ঠিক এইরূপ হওয়ার কোন আবশ্যিকতা নাই। সেইরূপ "বসন্তে | ফুটন্ত | কুসুমটি | প্রায়" এই চরণটিকে যদি বদলাইয়া "বসন্ত | প্রভাতের | কুসুমটি | প্রায়" লিখিলে ছন্দ ঠিক বজায় থাকে, কিন্তু ইংরাজী ছন্দের ছাঁচ ভাঙ্গিয়া যায়। আসল কথা এই যে, বাংলায় মাত্রাসমকত্ব-ই ছন্দের ভিত্তি, কোন একটা বিশেষ ছাঁচ নহে। কোন একটা ছাঁচ অনুসারে কবিতা লেখার প্রয়াস যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের লেখা হইতেও এ কথা প্রমাণ হয়।

মস্‌গুল্ | বুল্‌বুল্ | বন্‌ফুল্ | গন্ধে
বিল্‌কুল্ | অলিকুল্ | গুঞ্জরে | ছন্দে

এই দুইটি চরণে প্রতি পূর্ণ পর্ব্বে দুইটি হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর রাখিয়া ছন্দ রচনার প্রয়াস হইয়াছে; কিন্তু শেষের চরণটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি কোনরূপ ছন্দের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বোধ হয় না। সেইরূপ

"ভোম্‌রায় | গান্ গায়্ | চর্‌কার্ | শোন্ ভাই"

ইহার বদলে

"ভোম্‌রাতে | গান্ গায়্ | চর্‌কার্ | শোন্ ভাই"

কিম্বা

"ভোম্‌রাতে | গান্ করে | চর্‌কারি | শোন ভাই"

লিখিলে ছন্দের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইংরাজীতে ছন্দ মাত্রাগত না হইয়া গুণগত বলিয়া ছাঁচ-টাই আসল। এই জন্য সমজাতীয় foot বা গণের পরস্পরের বদলে ব্যবহার হইতে পারে, iambus-এর স্থলে anapaest এবং trochee-র স্থলে dactyl বেশ চলে। বাংলায় যাঁহারা ইংরাজী ছন্দের অনুকরণ করার প্রয়াস করিয়াছেন তাঁহারা সেই চেষ্টা করিলে অবিলম্বে ছন্দোভঙ্গ হইবে।

বিখ্যাত ইংরাজ কবি Shelleyর The Cloud কবিতাটি ছন্দোমাধুর্য্যের জন্য সুবিদিত। ইহার প্রথম চারিটি চরণে যে ভাবে accented ও unaccented অক্ষরের বিন্যাস ও ছন্দোবিভাগ হইয়াছে, কেহ বাংলায় তদনুরূপ করিতে গেলে ছন্দোভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

I bring | fresh showers | for the thirst | ing flowers
From the seas | and the streams;
I bear | light shade | for the leaves | when laid
In their noon- | day dreams.

আধুনিক বাংলার সুকবিদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষরূপে কৃতবিদ্য ও ইংরাজী কাব্যের রসগ্রাহী ছিলেন। ইংরাজী ছন্দেই বাংলা কবিতা লেখা যায় এরূপ মত তাঁহারা কখন প্রকাশ করেন নাই. বা সেরূপ চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রগাঢ় ইংরাজী পণ্ডিত ও ইংরাজী-ভাবাপন্ন ছিলেন, তিনি-ও অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত-ও এ চেষ্টা করেন নাই। এমন কি, বাংলা কবিতায় যেখানে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেখানেও ইংরাজী শব্দ জাতি হারাইয়া বাংলা ছন্দের রীতির অনুসরণ করিয়াছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার

সাত্ত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝেই ধর্‌ল মাংস রকমারি
ফাউল্ বীফ্ আর মটন্ হ্যাম্ ইন্ অ্যাডিশন্ টু বক্‌রি।

এই চরণদ্বয়ের দ্বিতীয়টি প্রায় ইংরাজী শব্দেই রচিত। "আর" বদলাইয়া যদি "and" লেখা যায়, তাহা হইলে সমস্তটাই একটা ইংরাজী ছন্দের লাইন মনে করা যায়। (বক্‌রি অবশ্য হিন্দুস্থানী শব্দ।) বাংলায় এই চরণটির ছন্দোলিপি হইবে—

ফাউল্ বীফ্ অ্যাণ্ড | মটন্ হ্যাম্ | ইন্ অ্যাডিশন্ | টু বক্‌রি
=ফাউল্ বীফ্যাণ্ড | মটন্ হ্যাম্ | ইন্যাডিশান্ | টু বক্‌রি
=(৪+৪+৪+৩)

ইংরাজীতে ইহার ছন্দোলিপি হইত অন্যরূপ—

Fowl beef | and mutt | on ham | in ad-di- | tion to Bok | ri

এই দুইটি ছন্দোলিপি পরস্পরের সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে ইংরাজী ও বাংলার ছন্দঃপদ্ধতি পরস্পর হইতে বিভিন্ন। Milton-এর

```
⌣ /        /  ⌣⌣/    ⌣       / ⌣   /
Of man's first dis-o-be-dience, and the fruit
-।   -।-।-।  -।-।  -ঃ -ঃ -।  -।-।  -।  -।  -ঃ  -।-।

⌣  /  ⌣/  ⌣   /    ⌣      /⌣   /
Of that forbidden tree. whose mortal taste
-।  -।-।   -। -। -।-।- -।-। -। -।     -।  -।-।  -।-। *
```

প্রভৃতি চরণে মাত্রা ও ধ্বনিগৌরবের বিচিত্র জটিলতায় যে ছন্দের জাল গড়িয়া উঠিয়াছে, বাংলায় তাহার অনুকরণ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

অক্ষরের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য ইংরাজী ছন্দের ভিত্তি-স্থানীয়, তাহা বাস্তবিক বাংলা ছন্দে পাওয়া যায় না। শ্বাসাঘাতের ব্যবহার হইলে অবশ্য শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর একটি বিশিষ্ট ধ্বনিগৌরব লাভ করে, কিন্তু শ্বাসাঘাতের ব্যবহার বাংলা ছন্দে যদৃচ্ছাক্রমে করা যায় না; এ সম্বন্ধে কি কি অসুবিধা তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একমাত্রিক লঘু অক্ষরের সন্নিকটে গুরু অক্ষর বসাইলেও অবশ্য একটা গুণগত পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, এবং এইজন্য গুরু অক্ষরের বহুল ব্যবহারের দ্বারাই বাংলায় কবিরা ছন্দের গাম্ভীর্য্য বাড়াইবার চেষ্টা বরাবর করিয়া আসিয়াছেন। "তরঙ্গিত মহাসিন্ধু | মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো" অথবা "কিম্বা বিম্বাধরা রমা | অম্বুরাশি তলে" প্রভৃতি চরণে ইহার উপলব্ধি হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই পার্থক্য ইংরাজী accented ও unaccented-এর পার্থক্যের অনুরূপ নহে, এবং ইহাকেই ছন্দের ভিত্তি করা যায় না। আসলে, পর্ব্বে পর্ব্বে মাত্রাসমকত্বই বাংলা ছন্দের ভিত্তি-স্থানীয়; অন্য যাহা কিছু গুণ তাহা ছন্দের কচিৎদৃষ্ট বা আকস্মিক অলঙ্কার বা গৌণ লক্ষণ মাত্র।

---

* এই দুইটি পংক্তির মাত্রালিপি Fox Strangways-এর নির্দ্দেশ অনুসারে প্রচলিত আকার-মাত্রিক স্বরলিপির চিহ্ন দ্বারা করা হইয়াছে।

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার পথে অনেকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, বাংলায় যথার্থ দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার কচিৎ দেখা যায়। আমাদের সাধারণ উচ্চারণের পদ্ধতিতে স্বভাবতঃ সমস্ত স্বরই হ্রস্ব। তবে অবশ্য বাংলায় হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া অনেক সময় ধরা হইয়া থাকে, এবং ইচ্ছামত যে কোন হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করা যায়। কিন্তু ধ্বনিগুণের দিক্ হইতে বাংলার হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর আর সংস্কৃতের দীর্ঘ অক্ষর এক নহে। বাংলায় শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ। কারণ, বাংলায় পর পর শব্দগুলিকে বিযুক্ত রাখাই রীতি, ছন্দেও সংস্কৃত পদ ছাড়া অন্যত্র সন্ধির ব্যবহার সাধারণতঃ হয় না। সুতরাং শব্দান্তের হল্‌বর্ণকে পরবর্ত্তী বর্ণ হইতে বিযুক্ত রাখার জন্য শব্দের শেষে একটু ফাঁক রাখা হয়, সেইজন্য মোটের উপর শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর দুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত হয়। যেখানে শব্দের মধ্যে কোন হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া ধরা হয়, সেখানেও এইরূপ ঘটে। শব্দের মধ্যস্থ যুক্তবর্ণকে বিশ্লেষণ করিয়া এবং তাহার ধ্বনিকে টানিয়া হলন্ত অক্ষরকে দুইমাত্রা ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সন্ধি আবশ্যিক, সেখানে এরূপ বিশ্লেষণ ও ফাঁক্ বসানো চলে না, সেখানে যথার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ করিয়াই দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় মাত্রাসমকত্বের নিয়মিত রীতিতে কতকগুলি পর্ব্বের সহযোগে এক একটি চরণ গঠন করিতে হইবে, এবং প্রতি পর্ব্বে সুনির্দ্দিষ্ট রীতিতে পর্ব্বাঙ্গের সমাবেশ করিতে হইবে। দুই একটি বিশেষ স্থল ছাড়া প্রতি পর্ব্বে ও প্রতি পর্ব্বাঙ্গে একটি বা ততোধিক গোটা শব্দ থাকা আবশ্যক। সংস্কৃতে এক একটি চরণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের কোন এক প্রকার বিশিষ্ট ও বিচিত্র সমাবেশ মাত্র; তাহার উপাদান হ্রস্ব বা দীর্ঘ হিসাবে বিশিষ্টলক্ষণান্বিত কতিপয় অক্ষর। এই দীর্ঘ বা হ্রস্ব অক্ষরের পারম্পর্য্য-জনিত এক প্রকার ধ্বনিহিল্লোল-ই সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ। যেখানে সংস্কৃত ছন্দের এক একটি চরণের উপকরণ কয়েকটি গণ, সেখানে প্রত্যেকটি গণ কয়েকটি হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের এক প্রকার সমাবেশ মাত্র, শব্দের গঠনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

সংস্কৃতে এমন কতকগুলি ছন্দ আছে যাহার চরণগুলিকে অনায়াসেই সমমাত্রিক কয়েকটি অংশে বিভাগ করা যায়। এইরূপ প্রত্যেক চরণাংশের মাত্রাপারম্পর্য্যের অনুযায়ী মাত্রা রাখিয়া এক একটি শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রয়োগ করিতে পারিলে, বাংলার পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ রীতিও বজায় থাকে এবং ঐ সংস্কৃত ছন্দের পারম্পর্য্যও থাকে। উদাহরণস্বরূপ তোটক ছন্দের কথা বলা যাইতে পারে। তোটকের সঙ্কেত

⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ —

ইহাকে সহজেই চার মাত্রার এক একটি অংশে ভাগ করা যায় :

⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ —

যেমন,

রণনি | র্জিতত্ন | র্জয়দৈ | ত্যপুরং

এখন ইহার অনুকরণে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ —
একি ভা | ওারে লুট | করে ধন | লোটানো
⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ —
একি চাষ | দিয়ে রাশ | করে ফুল | ফোটানো

এখানে তোটকের মাত্রা-পারম্পর্য্য একরূপ বজায় আছে, যদিও চরণের শেষের অক্ষরটির দীর্ঘ উচ্চারণ একটু কৃত্রিম। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে ছন্দের ভিত্তি চার মাত্রার এক একটি পর্ব্ব, এবং এই মাত্রাসমকত্বের জন্যই ছন্দ বজায় আছে। যেখানে হসন্ত অক্ষর দিয়া সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুকরণ করা হইয়াছে সেখানে দুইটি হ্রস্ব অক্ষর দিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না ; দ্বিতীয় চরণটিকে—

একি চাষ | দিয়ে রাশি | করে ফুল | ফোটানো

এইরূপ লিখিলে অবশ্য সংস্কৃত তোটকের রীতির লঙ্ঘন হইত, কিন্তু বাংলা ছন্দের দিক্ হইতে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে মনে হইত না। ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে আসলে বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি ও রীতি বিভিন্ন ; অক্ষর-সংখ্যা বা মাত্রার পারম্পর্য্য বাংলা ছন্দের মূল কথা নয়, মূল কথা—এক একটি

পর্ব্ব বা পর্ব্বাঙ্গে মোট মাত্রার সংখ্যা। কোন সংস্কৃত ছন্দের পারম্পর্য্যের সহিত বাংলা ছন্দের কোন একটি চরণের সাদৃশ্য একটা গৌণ ও আকস্মিক লক্ষণ মাত্র। সংস্কৃতজ্ঞ না হইলে কোন ছন্দোরসিকের নিকট এই সাদৃশ্য লক্ষ্যীভূত হয় না। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বরগুলি যে ভাবে কানে লাগে ও যেরূপ ছন্দোবোধ উৎপাদন করে, বাংলার হলন্ত দীর্ঘ অক্ষরগুলি সেরূপ করে না।

এইরূপ তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, পঞ্চচামর, স্রগ্বিণী, সারঙ্গ, মালতী, মদিরা প্রভৃতি যে সমস্ত ছন্দ কোন এক প্রকারের কয়েকটি গণের সংযোগে গঠিত, বাংলা ছন্দে তাহাদের এক প্রকারের অনুকরণ করা যাইতে পারে, যদিও ঠিক সংস্কৃতের অনুরূপ ধ্বনিগুণ ও ছন্দোহিল্লোল বাংলা ছন্দে আনা খুব দুরূহ। কারণ যথার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ বাংলা ছন্দে মাত্র ক্বচিৎ দেখা যায় (সূঃ ১৬ক দ্রষ্টব্য)। বাংলা হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর ঠিক সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুরূপ নহে।

সংস্কৃতে আরও কতকগুলি ছন্দ আছে, সেগুলি ঠিক এক প্রকারের কতকগুলি গণ লইয়া গঠিত না হইলেও সেগুলিকে বাংলার পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ পদ্ধতির সহিত একরূপ খাপ খাওয়ানো যাইতে পারে। যেমন, "মনোহংস" ছন্দের সঙ্কেত

⌣⌣—⌣—⌣⌣—⌣—⌣⌣—⌣—⌣—

এখানে চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা ২১। ইহাকে

⌣⌣— ⋮ ⌣—⌣ | ⌣—⌣ ⋮ —⌣⌣ | —⌣—

এইরূপে ভাগ করিলে ৮ মাত্রার দুইটি পূর্ণ পর্ব্ব এবং ৫ মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব্ব পাওয়া যায়। সুতরাং তূণক বা তোটকের ন্যায় এই ছন্দেরও বাংলায় এক রকম অনুকরণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু এমন অনেক ছন্দ সংস্কৃতে আছে যাহাদের বাংলা পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ পদ্ধতির কাঠামের মধ্যে কিছুতেই ফেলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ সুপরিচিত 'ইন্দ্রবজ্রা' ছন্দের নাম করা যাইতে পারে।

সংস্কৃত ছন্দ যাঁহারা বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জোর করিয়া বাংলায় সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন কি ভারতচন্দ্রও এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। তাঁহার

"ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে"

এই চরণটিতে তিনি তূণক ছন্দের অনুকরণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু

তূণকের রীতিতে এই চরণটি পাঠ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। আসলে এই চরণটি ও তাহার পরবর্ত্তী চরণগুলি ৮+৭ এই সঙ্কেতে বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক রীতিতে রচিত বলিয়াই সকলে পাঠ করিবে। ভারতচন্দ্রের

"ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণী ফঃ গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে।"

প্রভৃতি চরণে সংস্কৃত ভুজঙ্গপ্রয়াতের অনুকরণও ঐরূপ ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র হইয়াছে।

আধুনিক কালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেক কবি হলন্ত অক্ষরমাত্রকেই দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের আমদানী করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আবশ্যকমত হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করা বাংলায় সম্ভব হইলেও, এই দীর্ঘীকরণ পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের আবশ্যকতা অনুসারেই হইয়া থাকে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ নয়। সুতরাং সর্ব্বত্র এইরূপ যথেচ্ছ দীর্ঘীকরণ চলে না, চালাইতে গেলে যাহাতে বাংলা ছন্দের পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের মুখ্যতা ও অখণ্ডনীয়তা অব্যাহত থাকে সেদিকে অবহিত থাকিতে হইবে। নহিলে, বাংলা ছন্দের হিসাবে ছন্দঃপতন ঘটিবে! দ্বিতীয়তঃ, বাংলার হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর যে সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের প্রতিনিধি-স্থানীয় নয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, বাংলায় পর্ব্ব-ও-পর্ব্বাঙ্গ পদ্ধতির জন্য যে ভাবে ছেদ ও যতি রাখিতে হয় তাহাতে সংস্কৃত ছন্দের প্রবাহ অব্যাহত থাকিতে পারে না। যত সুকৌশলেই অক্ষরের মাত্রা নিরূপিত হউক না কেন, বাংলায় ছন্দোবদ্ধ হইলেই পর্ব্ব, পর্ব্বের মাত্রাসমকত্ব, পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গের বিন্যাস, পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের মাত্রা ও তাহার অনুপাত, ইহাই ছন্দোবোধের ভিত্তি ও মুখ্য বিচার্য্য হইয়া দাঁড়ায়, দীর্ঘ বা হ্রস্বের পারম্পর্য্য অত্যন্ত গৌণ, উপেক্ষণীয় ও যদৃচ্ছাক্রমে পরিবর্ত্তনীয় লক্ষণমাত্র হইয়া পড়ে।

উদাহরণস্বরূপ সুকবি সত্যেন্দ্রনাথের একটি প্রচেষ্টার বিচার করা যাক্। সংস্কৃত মালিনী ছন্দের অনুকরণে তিনি লিখিয়াছেন—

উড়ে চলে গেছে বুলবুল্, শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর,
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

যদি বাংলা ছন্দের হিসাবে ইহা ছন্দোদুষ্ট না হয়, তবে বলিতে হইবে যে এই

দুইটি চরণ ৬+৩ এই সঙ্কেতে ছয় মাত্রার পর্ব্ব লইয়া গঠিত হইয়াছে। বাংলা ছন্দে ইহার ছন্দোলিপি হইবে

উড়ে চলে গেছে | বুল্‌বুল্‌
শূন্যময় স্বর্ণ | পিঞ্জর
ফুরায়ে এসেছে | ফাল্‌গুন্‌
যৌবনের জীর্ণ | নির্ভর

যদি ইহাকে সংস্কৃত মালিনী ছন্দের রীতিতে

উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্‌ শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর
ফুরায়ে এসেছে ফাল্‌গুন যৌবনের জীর্ণ নির্ভর

এই ভাবে পাঠ করা যায় তবে বাংলা ছন্দের যাহা ভিত্তিস্থানীয়—পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ—তাহাদেরই মুখ্যতা ও রীতি বজায় থাকে না। চার মাত্রা, পাঁচ মাত্রা বা ছয় মাত্রা—কোন দৈর্ঘ্যের পর্ব্বকেই ইহার ভিত্তি করা যায় না, কোন নিয়মিত প্রথাতে এখানে যতি স্থাপনা করা যায় না, সুতরাং বাংলা ছন্দোবন্ধের পরিধির মধ্যে ইহার স্থান হয় না। পাঠ করিলেই সমস্তটা অস্বাভাবিক, কৃত্রিম, ছন্দোদুষ্ট বলিয়া মনে হয়। ইহার সহিত মালিনী ছন্দে রচিত কোন সংস্কৃত শ্লোক মিলাইয়া দেখিলেই সংস্কৃত মালিনী ছন্দ ও তাহার বাংলা অনুকরণের মধ্যে ধাতুগত পার্থক্যের উপলব্ধি হইবে। 'রঘুবংশে'র

শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং
জলনিধিমনুরূপং জহ্নুকন্যাবতীর্ণা

প্রভৃতি চরণের ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও ছন্দের প্রবাহ যে কোন বাংলা অনুকরণে থাকিতে পারে না তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়।

বাংলায় যথার্থ দীর্ঘস্বর স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সম্ভব তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (সূঃ ১৬ক দ্রষ্টব্য)। এই উপলক্ষে হেমচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-পদ্ধতির রীতি বজায় রাখিয়াই তদ্রূপ করা সম্ভব। এইরূপ

দীর্ঘস্বরের ব্যবহার করিতে পারিলে যথার্থ সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ ধ্বনিহিল্লোল পাওয়া যায়। গুরু অক্ষরের ব্যবহারের জন্তও এক প্রকার ধ্বনিবৈচিত্র্য পাওয়া যায়, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে কোন সংস্কৃত ছন্দের যদৃচ্ছা অনুকরণ বাংলায় সম্ভব নয়।

13—1667B.

পর্ব্বাঙ্গ-বিচারের গুরুত্ব

বাংলা ছন্দের বিচারে পর্ব্বের গুরুত্ব এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। পর্ব্বই যে বাংলা ছন্দে উপকরণ-স্থানীয়, পর্ব্বের পরিমাপের উপরই যে ছন্দের গতি ও প্রকৃতি নির্ভর করে এবং তাহাতেই ছন্দের পরিচয়, এ কথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। অবশ্য কখন কখন পর্ব্ব এই কথাটির বদলে অন্য কোন শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। পদ, কলা, বিভাগ ইত্যাদি শব্দ কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই আপত্তির কারণ আছে; এবং কেহই পর্ব্ব শব্দটির বদলে ঐ সমস্ত শব্দ বরাবর সঙ্গতি রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারেন নাই। যাহা হউক্, অন্য নাম দিলেও পর্ব্বের গুরুত্বের কোন লাঘব হয় না, "A rose called by any other name would smell as sweet."

কিন্তু বাংলা ছন্দের বিচারে পর্ব্বাঙ্গের উপযোগিতা এখনও অনেকে ঠিক্ ধরিতে পারেন নাই। সেই কারণেই বাংলা ছন্দের অনেক মূল তত্ত্ব, অনেক সমস্যার সমাধান তাঁহাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। সুতরাং বাংলা ছন্দের অনেক বিশিষ্ট লক্ষণ ও ধর্ম্ম, বাংলা ছন্দের অনেক বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা তাঁহারা দিতে পারেন না। "এ রকম-ও হয়, ও রকম-ও হয়," "মাঝে মাঝে এ রকম হয়,' 'সব সময় হয় না,' 'কবির কান-ই সব ঠিক করে নেবে,' ইত্যাদি অক্ষম যুক্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ন। তবে কদাচ দুই এক জন 'পর্ব্বাংশ,' 'কলা' প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করেন দেখা যায়। অর্থাৎ, পর্ব্বাঙ্গ বস্তুটি যে আছে এবং ছন্দে তাহার যে গুরুত্ব আছে—এই সত্যটি অস্পষ্ট ভাবে তাঁহাদের কাছে কখন কখন ধরা দেয়।

পর্ব্বাঙ্গ কি এবং পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক কি, তাহার আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। পর্ব্বাঙ্গ-বিচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা এ স্থলে বলা হইতেছে।

(১) পর্ব্বাঙ্গ-বিচার ব্যতিরেকে পর্ব্বের গঠন-রীতি, তাহার দোষগুণ ইত্যাদি ঠিক্ বোঝা যায় না। এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাব বশতঃ মধুসূদন 'মাৎসর্য্য-বিষ-দশন' এবং রবীন্দ্রনাথ 'উন্মত্ত-স্নেহ-ক্ষুধায়' ইত্যাদি দুষ্ট পর্ব্ব কখন কখন প্রয়োগ করিয়াছেন (সূঃ ২৫ দ্রষ্টব্য)।

(২) (ক) বাংলা পদ্যে শ্বাসাঘাতের স্থান আছে, এবং তাহার প্রভাবে ছন্দ একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে; ছন্দের লয়ের পরিবর্ত্তন হয়, অক্ষরের মাত্রার ইতরবিশেষ হয়। কিন্তু শ্বাসাঘাত সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র পড়িতে পারে না। পর্ব্বাঙ্গ-বিচার ব্যতিরেকে এ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে (সূঃ ২০ দ্রষ্টব্য)।

(খ) বাংলায় স্বাভাবিক দীর্ঘ স্বর নাই। সুতরাং সংস্কৃত ছন্দের যথেচ্ছ অনুকরণ বাংলায় সম্ভব নহে। তত্রাচ, স্থল বিশেষে বাংলা পদ্যে দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। কখন, কোথায় এবং কি নিয়ম অনুসারে বাংলা ছন্দে দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ চলিতে পারে, এ সম্পর্কে কি কি বিধিনিষেধ আছে, তাহা পর্ব্বাঙ্গ-বিচার না করিলে অনুধাবন করা যায় না (সূঃ ১৬ দ্রষ্টব্য)।

(৩) (ক) বাংলায় অক্ষরের মাত্রা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বা ধ্রুব নহে, ছন্দের pattern বা পরিপাটী অনুসারে ইহা নিয়ন্ত্রিত হয়। পর্ব্বাঙ্গ-বিচার ব্যতিরেকে এই পরিপাটী ও তাহার আবশ্যকতার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে (সূঃ ২৭-৩০ দ্রষ্টব্য)।

(খ) যখন বাংলায় সম্পূর্ণ অপ্রচলিত কোন শব্দ ইংরাজী বা অপর কোন বিজাতীয় ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া বাংলা কবিতার পাদ পূরণ করা হয়, তখন এইরূপ শব্দের মাত্রাবিচার কিরূপে হইবে? রবীন্দ্রনাথের 'চা-চক্র' কবিতায় "Constitution," 'আধুনিকা' কবিতায় "mid-Victorian," দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গানে' "fowl, beef and mutton, ham" প্রভৃতি বিদেশী শব্দ বা শব্দ-গুচ্ছ দিয়া পাদ-পূরণ করা হইয়াছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মাত্রাবিচার কেবলমাত্র পর্ব্বাঙ্গ-বিচার অনুসারেই করা সম্ভব; অন্য কোন উপায়ে এইসব শব্দে অক্ষরের মাত্রা-বৈচিত্র্য নির্ণয় করা যায় না।

(৪) বাংলা পদ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধে ও আরও অনেক স্থলে পর্ব্বের মধ্যেই ছেদ পড়িতে পারে। কিন্তু পর্ব্বের মধ্যে যেখানে সেখানে এই ছেদ পড়িতে পারে না, পর্ব্বাঙ্গ-বিচার করিয়া দুই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যেই এইরূপ ছেদ বসান যাইতে পারে।

নয় মাত্রার ছন্দ

গত ১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রা'য় নয় মাত্রার ছন্দ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম। বাংলা ভাষায় নয় মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বাংলায় চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, দশ মাত্রার পর্ব্ব লইয়া ছন্দোবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু নয় মাত্রার পর্ব্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা হইতে পারে কিনা—সে বিষয়ে পথনির্দ্দেশ করিবার জন্য ছন্দঃশিল্পীদের আহ্বান করিয়াছিলাম। এতৎসম্পর্কে মাত্র দুইটি লেখা তাহার পরে পড়িয়াছি। একটির লেখক—শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যার 'বিচিত্রা'য় শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক। অপরটির লেখক—কার্ত্তিক ১৩৩৯ সংখ্যার 'পরিচয়'এ কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম প্রবন্ধে প্রকাশিত উদাহরণের আলোচনা পরে করিব, প্রথমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তগুলির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের মত—বাংলায় নয় মাত্রার ছন্দ খুব চলে এবং আরও চলিতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত লেখা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং কয়েকটি নূতন দৃষ্টান্তও রচনা করিয়াছেন। বাংলা ছন্দে কি চলে আর না চলে এ সম্বন্ধে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মত অতুলনীয় ছন্দঃশিল্পীর মতই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হইল তিনি ঠিক আমার প্রশ্নটির উত্তর দিবার চেষ্টা করেন নাই। নয় মাত্রার **চরণ** লইয়া যে ছন্দোবদ্ধ হয়, তিনি তাহারই উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু নয় মাত্রার **পর্ব্ব** লইয়া ছন্দোবদ্ধ হয় কিনা তাহা বুঝাইবার বা দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি যে পর্ব্বের কথা চিন্তা না করিয়া, চরণের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন তাহা ঐ প্রবন্ধের শেষ অংশ হইতেই বেশ বোঝা যায়। তিনি নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর, এগার, তের, পনের, সতের, উনিশ, একুশ মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে "বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরী করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করে না।" এগার হইতে একুশ মাত্রার ছন্দের যে দৃষ্টান্তগুলি তিনি দিয়াছেন তাহাতে যে চরণের মোট মাত্রা-সংখ্যা লইয়াই গণনা করা হইয়াছে, চরণের উপকরণ পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা লইয়া গণনা করা হয় নাই তাহা ত সুস্পষ্ট। একটু বিশ্লেষণ করা যাক্।

এগার মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্তগুলির ছন্দোলিপি করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

১। চামেলির : ঘন-ছায়া- | বিতানে =(৪ + ৪) + ৩
বনবীণা : বেজে ওঠে | কী তানে। =(৪ + ৪) + ৩
স্বপনে : মগন : সেথা | মালিনী =(৩ + ৩ + ২) + ৩
কুসুম- : মালায় : গাঁথা | শিথানে॥ =(৩ + ৩ + ২) + ৩

এখানে ছন্দের উপকরণ আট মাত্রার পর্ব্ব। প্রতি চরণে একটি আট মাত্রার পর্ব্ব ও পরে একটি তিন মাত্রার অপূর্ণ (catalectic) পর্ব্ব আছে। হয়ত কেহ অন্যভাবেও ইহার ছন্দোলিপি করিতে পারেন—

চামেলির : ঘন- | ছায়া- : বিতানে =(৪ + ২) + (২ + ৩)
বন বীণা : বেজে | ওঠে : কী তানে। =(৪ + ২) + (২ + ৩)
স্বপনে : মগন | সেথা : মালিনী =(৩ + ৩) + (২ + ৩)
কুসুম : মালায় | গাঁথা : শিথানে॥ =(৩ + ৩) + (২ + ৩)

এ রকম ছন্দোলিপি করিলে মূল পর্ব্বটি হয় ছয় মাত্রার, এবং চরণটি একটি ছয় মাত্রার পূর্ণ ও একটি পাঁচ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব্বের সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।

এ রকমের ছন্দোবন্ধ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বেও করিয়াছেন। যেমন—

— তাহারে শুধানু হেসে | যেমনি =(৩ + ৩ + ২) + ৩
—নতমুখে চলি গেলা | তরুণী =(৪ + ৪) + ৩
—এ ঘাটে বাঁধিব মোর | তরণী =(৩ + ৩ + ২) + ৩

এ রকম প্রত্যেক চরণের সঙ্কেত ৮ + ৩।

৬ + ৫ সঙ্কেতের উদাহরণও পাওয়া যায়—

—শিলা রাশি রাশি | পড়িছে খসে =(২ + ৪) + (৩ + ২)
—গরজি উঠিছে | দারুণ রোষে =(৩ + ৩) + (৩ + ২)

প্রাচীন কবিদের একাবলী আসলে এই সঙ্কেতের ছন্দ।

২। মিলন-সুলগনে | কেন বল্ =(৩ + ৪) + ৪
নয়ন করে তোর | ছল্ ছল্! =(৩ + ৪) + ৪
বিদায়-দিনে যবে | ফাটে বুক, =(৩ + ৪) + ৪
সে দিনো দেখেছি তো | হাসিমুখ॥ =(৩ + ৪) + ৪

এখানে মূল পর্ব্ব সাত মাত্রার। এ সঙ্কেতের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের আগেকার কাব্যেও পাওয়া যায়—

তাহাতে এ জগতে | ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি | মনোভার?
দু' কথা বলি যদি | কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে | কী বা কার?

তের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত কাব্য হইতেই দিয়াছেন—

৩। গগনে গরজে মেঘ, | ঘন বরষা =৮+৫
কূলে একা বসে আছি, | নাহি ভরসা =৮+৫

আরও দেওয়া যায়, যেমন—

রঙীন খেলেনা দিলে | ও রাঙা হাতে =৮+৫
তখন বুঝিরে, বাছা, | কেন যে প্রাতে =৮+৫

এই দুই উদাহরণেই মূল পর্ব্ব আট মাত্রার।

পনের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন—

৪। হে বীর জীবন দিয়ে | মরণেরে জিনিলে =(৩+৩+২)+(৪+৩)
নিজেরে নিঃস্ব করি | বিশ্বেরে কিনিলে =(৩+৩+২)+(৪+৩)

এখানে মূল পর্ব্ব আট মাত্রার। পূর্ব্বপ্রকাশিত কাব্যেও এ রকম পাওয়া যায়, যেমন—

দিন শেষ হয়ে এল | আঁধারিল ধরণী =৮+৭

সতের মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন সেখানে মুদ্রিত দুইটি পংক্তি যোগ করিয়া তবে সতেরটি মাত্রা পাওয়া যায়। সুতরাং সেখানে যে সতের মাত্রার পর্ব নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

৫। ভরা নদী দুই কূলে কূলে
কাশবন দুলিছে।
পূর্ণিমা তারি কূলে কূলে
আপনারে ভুলিছে।

এখানে পংক্তিগুলিতে যথাক্রমে ১০, ৭, ১০, ৭ মাত্রা করিয়া আছে। এক একটি পংক্তির শেষে যে সুস্পষ্ট যতি আছে তাহা লিখিবার ভঙ্গী হইতেই ধরা

পড়ে। প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহা অর্দ্ধযতি কি পূর্ণযতি তাহা লইয়া কিছু মতভেদ হইতে পারে। যদি তাহাকে অর্দ্ধযতি বলিয়াও ধরা যায় তাহা হইলেও সেখানে একটি পর্ব্বের শেষ হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং দশ মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব্ব এখানে পাওয়া যায় না। আমার নিজের মনে হয় যে এখানে দশ মাত্রার পর্ব্বও নাই, দশ মাত্রার পর্ব্ব থাকিলে কাব্যের যে গাম্ভীর্য্য থাকে তাহার নিতান্ত অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। প্রতি পংক্তির শেষে পূর্ণযতি আছে বলিয়া মনে হয়, সুতরাং এক একটি পংক্তিকেই আমি এক একটি চরণ বলিয়া ধরিতে চাই। প্রতি চরণে দুই পর্ব্ব, এবং মূল পর্ব্ব প্রথম ও তৃতীয় চরণে ছয় মাত্রার, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে চার মাত্রার। মূল পর্ব্ব সর্ব্বত্রই ছয় মাত্রার অথবা সর্ব্বত্রই চার মাত্রার এইরূপ ধরিয়া পাঠ ও ছন্দোলিপি করাও চলিতে পারে।

উনিশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন সেখানেও দুইটি পংক্তি যোগ না করিলে উনিশ মাত্রা পাওয়া যায় না। অথচ এক একটি পংক্তি আসলে এক একটি চরণ; পর্ব্ব নহে, পর্ব্বাঙ্গ ত নহেই।

৬। ঘন মেঘভার | গগন তলে =৬+৫
বনে বনে ছায়া | তারি, =৬+২
একাকিনী বসি | নয়ন-জলে =৬+৫
কোন্ বিরহিনী | নারী। =৬+২

এখানে ছয় মাত্রার পর্ব্ব অবলম্বন করিয়া ছন্দ রচনা করা হইয়াছে। প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব, প্রথমটি পূর্ণ ও অপরটি অপূর্ণ। প্রথম ও তৃতীয় চরণে অপূর্ণ পর্ব্বটি পাঁচ মাত্রার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে দুই মাত্রার।

একুশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন, সেখানেও ঐ ঐ মন্তব্য খাটে। দুইটি পংক্তি বা দুইটি চরণ যোগ না করিলে একুশ মাত্রা পাওয়া যায় না, ছন্দের মূল উপকরণ যে পর্ব্ব তাহাতে মাত্র ছয়টি করিয়া মাত্রা পাওয়া যাইতেছে।

৭। বিচলিত কেন | মাধবী শাখা =৬+৫
মঞ্জরী কাঁপে | থর থর =৬+৪
কোন্ কথা তার | পাতায় ঢাকা =৬+৫
চুপি চুপি করে | মরমর =৬+৪

দৃষ্টান্তগুলির বিশ্লেষণ হইতে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ পর্ব্বের মাত্রার কথা ঐ প্রবন্ধে আলোচনা করেন নাই, তিনি চরণের মাত্রা, কখন কখন চরণের

অপেক্ষাও বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ অর্থাৎ শ্লোকার্দ্ধের মাত্রার সংখ্যার হিসাব করিয়াছেন। কাজেই নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদাহরণগুলি তিনি দিয়াছেন তাহাতেও যে নয় মাত্রার চরণই পাওয়া যায়, নয় মাত্রার পর্ব্ব পাওয়া যায় না, তাহা বিচিত্র নহে। দশ মাত্রার পর্ব্বই বোধ হয় বাংলা ছন্দের বৃহত্তম পর্ব্ব, এতদপেক্ষা বৃহত্তর পর্ব্বের ভার সহ্য করা বাঙালীর ছন্দে বোধ হয় সম্ভব নহে। সতের, উনিশ, একুশ ইত্যাদি মাত্রাসংখ্যা লইয়া বাংলা ছন্দের পর্ব্ব গঠন করা অসম্ভব।

পর্ব্ব লইয়া এত আলোচনা করিতেছি, কারণ পর্ব্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ। পর্ব্বের সহিত পর্ব্ব গ্রথিত করিয়াই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয়; পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা হইতেই ছন্দের চাল বোঝা যায়; মিতাক্ষর ছন্দে পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা পরিমিত বলিয়াই তাহা মিতাক্ষর। পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা ঠিক রাখিয়া নানাভাবে চরণ ও স্তবক গঠন করিলেও ছন্দের ঐক্য বজায় থাকে, কিন্তু যদি পর্ব্বের মাত্রা-সংখ্যার হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের মাত্রা বা স্তবক গঠনের রীতি দ্বারা ছন্দের ঐক্য বজায় রাখা যাইবে না। দু' একটি উদাহরণের দ্বারা আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট করিতেছি।

তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি—

এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা।

সকাল বেলা কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়—

এই চরণটিতেও মোট সতের মাত্রা। কিন্তু এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্যা সমান বলিয়া তাহাদের সতের মাত্রার ছন্দ নাম দিয়া এক গোত্রে ফেলা কি সম্ভব হইবে? এই দুইটি চরণ কি কখন একই স্তবকে গ্রথিত হইতে পারে? ইহার উত্তর—না। কারণ, এই দুইটি চরণের চাল ভিন্ন, তাহাদের প্রকৃতি ভিন্ন। এই পার্থক্যের স্বরূপ বোঝা যায় চরণের উপকরণ-স্থানীয় পর্ব্বের মাত্রা হইতে। প্রথম চরণটিতে মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ—

তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি =(৬+৬+৫)

দ্বিতীয় চরণটিতে মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ—

সকাল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায় =(৫+৫+৫+২)

ছয় মাত্রার ও পাঁচ মাত্রার পর্ব্বের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথক্। এই পার্থক্যের জন্যই উদ্ধৃত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়। কাজেই

ছন্দের পরিচয় দিতে গেলে বা তাহার শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যার অনুযায়ী করাই সঙ্গত, চরণের মাত্রাসংখ্যার অনুসারে করিলে কোন লাভ নাই।

আর একটি উদাহরণ দিই—

হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে,
নীরব তব নম্র নত মুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে॥

উদ্ধৃত স্তবকের ভিন্ন ভিন্ন চরণে যথাক্রমে ১২, ৭, ১৭, ১২, ১৭, ৭, ১৭, ১২, ১২ মাত্রা আছে। এক একটি চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা হইতে অথবা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার চরণ-সন্নিবেশের রীতি হইতে এখানে স্তবকের ঐক্যসূত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু বরাবর পাঁচ মাত্রার মূলপর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ছন্দের ঐক্য বজায় আছে। ইহা হইতেও বোঝা যায় যে ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা হইতে, চরণের মাত্রাসংখ্যা হইতে নহে।

এই উপলক্ষে পর্ব্ব সম্বন্ধে দু' একটি কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই। প্রত্যেক পর্ব্বের পরে একটি অর্দ্ধযতি থাকে, অর্থাৎ সেই সময়ে জিহ্বার একবারের ঝোঁক শেষ হয় এবং পুনশ্চ শক্তি সংগ্রহের জন্য অতি সামান্য ক্ষণের জন্য জিহ্বার ক্রিয়া বিরত থাকে। জিহ্বার এক এক বারের ঝোঁকে ক্লান্তিবোধ বা বিরামের আবশ্যকতার বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত যতটা উচ্চারণ করা যায় তাহারই নাম পর্ব্ব।

এক একটি পর্ব্ব দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। অন্ততঃ দুইটি পর্ব্বাঙ্গ না থাকিলে পর্ব্বের মধ্যে ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না। তিনটির বেশী পর্ব্বাঙ্গ দিয়া পর্ব্ব গঠিত হয় না, গঠন করিতে গেলে তাহা বাংলা ছন্দের গতির ব্যভিচারী হইবে। এক একটি পর্ব্বাঙ্গে এক হইতে চার পর্য্যন্ত মাত্রা থাকিতে পারে। এক একটি পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ একটি গোটা মূল শব্দ অথবা

একাধিক গোটা মূল শব্দের সহিত সমান। পর্ব্বাঙ্গ স্বরগাম্ভীর্য্যের উত্থান-পতনের এক একটি তরঙ্গের অনুসরণ করে।

পর্ব্ব ও চরণের মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধারণতঃ চরণ মাত্রেই একাধিক পর্ব্বের সমষ্টি। পর্ব্বের পর অর্দ্ধযতি, আর চরণের পর পূর্ণযতি থাকে।

এইবার নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত বলিয়া কবিগুরু যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন সেইগুলির বিশ্লেষণ করা যাক্।

(ক) আঁধার রজনী পোহাল,
জগৎ পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

এখানে প্রত্যেক পংক্তিতে নয় মাত্রা আছে। কিন্তু এক একটি পংক্তি কি এক একটি পর্ব্ব, না, চরণ? পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহা অর্দ্ধযতি, না, পূর্ণযতি? জিহ্বার ঝোঁক কি পংক্তির শেষে আসিয়া শেষ হইতেছে, না, পূর্ব্বেই কোন স্থলে শেষ হইয়া আবার নূতন ঝোঁকের আরম্ভ হইতেছে? ইহার ছন্দোলিপি কিরূপ হইবে?—

আঁধার : রজনী : পোহাল।
জগৎ : পূরিল : পুলকে |
বিমল : প্রভাত : কিরণে |
মিলিল : দ্যুলোক : ভূলোকে |

এইরূপ, না,

আঁধার : রজনী | পোহাল, =(৩+৩)+৩
জগৎ : পূরিল | পুলকে, =(৩+৩)+৩
বিমল : প্রভাত | কিরণে =(৩+৩)+৩
মিলিল : দ্যুলোক | ভূলোকে, =(৩+৩)+৩

এইরূপ?

আমার মনে হয়, উদ্ধৃত শ্লোকটিতে ছয় মাত্রার পর্ব্বই মূলপর্ব্ব, এবং দ্বিতীয় প্রকারে ছন্দোলিপি করাই স্বাভাবিক। কয়েকটি যুক্তি এ সম্পর্কে উত্থাপন করিতেছি।

"আঁধার" ও "রজনী" এই দুইটি শব্দের উচ্চারণকালে তন্মধ্যে ধ্বনির যে প্রবাহ, "রজনী"র পর "পোহাল" উচ্চারণ করিতে গেলে তন্মধ্যেও কি

ধ্বনির সেই প্রবাহ ? "আঁধার" ও "রজনী"র মধ্যে যতি নাই, কিন্তু "রজনী"র পরে কি একটি হ্রস্বযতি বা অর্দ্ধযতি আসে না ? যদি আসে তবে ঐখানেই পর্ব্বের শেষ ও নূতন একটি পর্ব্বের আরম্ভ।

"পোহাল" শব্দটির পর একটি কমা আছে এবং ঐখানেই একটি বাক্যের শেষ হইয়াছে। সুতরাং ঐখানে একটি পূর্ণযতি আসাই কি একান্ত স্বাভাবিক নহে ? যদি ঐখানে পূর্ণযতি আসে, তবে ঐখানে একটি চরণের শেষ হইয়াছে। জটিল স্তবকের মধ্যে যেখানে elliptical বা অপূর্ণ চরণের ব্যবহার হয় সেখানে ভিন্ন অন্যত্র একটিমাত্র পর্ব্বে চরণ গঠিত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে হ্রস্বযতি বা অর্দ্ধযতি মোটে আসিল না, একেবারেই পূর্ণযতি আসিয়া পড়িল—এইভাবে উচ্চারণ হয় না। সুতরাং "পোহাল" শব্দের পর যদি পূর্ণযতি থাকে তবে তাহার পূর্ব্বে কোথাও হ্রস্বযতি নিশ্চয়ই আছে এবং সেইখানেই পর্ব্বের শেষ হইয়াছে।

পরের দুইটি উদাহরণ সম্বন্ধেও একথা খাটে। সে দুটিও ছয় মাত্রার পর্ব্বে রচিত।

(খ)	গোড়াতেই	: ঢাক	| বাজনা	=(৪+২)+৩
	কাজ করা	: তার	| কাজ না	=(৪+২)+৩
(গ)	শকতি	: হীনের	| দাপনি	=(৩+৩)+৩
	আপনারে	: মারে	| আপনি	=(৪+২)+৩

ছয় মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কাব্যে খুব বেশী, এ বিষয়ে তাঁহার প্রবণতা স্বাভাবিক।

(৩+৩+৩) এই সঙ্কেতে নয় মাত্রার ছন্দ রচনা করিতে গেলে সাধারণতঃ তাহা (৩+৩)+৩ হইয়া দাঁড়ায়; অর্থাৎ যাহাকে নয় মাত্রার পর্ব্ব বলিতে চাই তাহা ছয় মাত্রার একটি মূল পর্ব্ব এবং তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব্বের সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

এই উদাহণগুলিতে যে নয়মাত্রার পর্ব্ব নাই তাহার একটি crucial test বা চূড়ান্ত প্রমাণ পরে দিব। আপাততঃ অন্য দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করা যাক।

(ঘ) আসন দিলে অনাহূতে
ভাষণ দিলে বীণা তানে,
বুঝি গো তুমি মেঘদূতে
পাঠায়েছিলে মোর পানে।

এখানে মূলপর্ব্ব নয় মাত্রার নয়, যদিও প্রতি পংক্তিতে নয়টি মাত্রা আছে। মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার, প্রত্যেকটি পংক্তি একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব, একটি পাঁচ মাত্রার পূর্ণ পর্ব্ব, অপরটি চার মাত্রার অপূর্ণ পর্ব্ব। ছন্দোলিপি করিলে এইরূপ হইবে—

আসন দিলে | অনা : হূতে	=(৩+২)+(২+২)
ভাষণ : দিলে | বীণা : তানে,	=(৩+২)+(২+২)
বুঝি গো : তুমি | মেঘ : দূতে	=(৩+২)+(২+২)
পাঠায়ে : ছিলে | মোর : পানে	=(৩+২)+(২+২)

এখানে (৩+২+৪) সঙ্কেতের পর্ব্ব নাই, (৩+২)+(২+২) সঙ্কেতের চরণ আছে। "আসন" ও 'দিলে" এই দুই শব্দের মাঝে যেরূপ ধ্বনির প্রবাহ, "দিলে" ও "অনাহূতের" মধ্যে সেরূপ নয়। "দিলে" শব্দটির পর একটি যতি অবশ্যম্ভাবী, সেখানে একটি পর্ব্বের শেষ ধরিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন (৩+২+৪) এই সঙ্কেতে পর্ব্ব রচিত হইতে পারে কি না সে সম্বন্ধে কয়েকটি *a priori* আপত্তিও আছে। প্রবন্ধ-শেষে সেইগুলি আলোচনা করিব।

(ঙ) বলেছিনু বসিতে কাছে
 দেবে কিছু ছিল না আশা।
 দেবো বলে যে জন যাচে
 বুঝিলে না তাহারো ভাষা।

এখানেও এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ। প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব, প্রথমটি চার মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাঁচ মাত্রার। সঙ্কেত (২+২)+(৩+২); প্রথম চার মাত্রার পর একটি অর্দ্ধযতির লক্ষণ সুস্পষ্ট।

একটু চেষ্টা করিয়া বরং এখানে এক ঝোঁকে সাত মাত্রা পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়া প্রতি পংক্তিতে সাত মাত্রার একটি পূর্ণ ও দুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব্ব রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত পংক্তিটিকে এক পর্ব্ব ধরিয়া পাঠ অস্বাভাবিক হইবে।

(চ) বিজুলী কোথা হ'তে এলে
 তোমারে কে রাখিবে বেঁধে।
 মেঘের বুক চিরি গেলে
 অভাগা মরে কেঁদে কেঁদে।

(ছ) মোর বনে ওগো গরবী
এলে যদি পথ ভুলিয়া।
তবে মোর রাঙা করবী
নিজ হাতে নিয়ো তুলিয়া।

এই দুই উদাহরণেই মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার। (চ) উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে তিন মাত্রার পর এবং (ছ) উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে ছয় মাত্রার পর অনেকটা বেশী ফাঁক ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া লেখা হইয়াছে। সুতরাং ঐ ঐ স্থলে যে নূতন করিয়া ঝোঁক আরম্ভ হইয়াছে এবং একটি পর্ব্ব শেষ করিয়া আর একটি পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। স্মরণ রাখা উচিত যে বাংলায় ছয় মাত্রার পর্ব্ব আছে, পর্ব্বাঙ্গ নাই। চার মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব্বাঙ্গ বাংলায় অচল।

(জ) বারে বারে যায় চলিয়া
ভাসায় নয়ন-নীরে সে,
বিরহের ছলে ছলিয়া
মিলনের লাগি ফিরে সে।

রবীন্দ্রনাথ ইহাকে ৪ + ৪ + ১—এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পড়িতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়া না দিলে অনেকেই বোধ হয় ইহাকে ৬ + ৩ এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ছয় মাত্রার ছন্দ মনে করিয়া পাঠ করিতেন। নহিলে যে ভাবে শব্দকে ভাঙিয়া পড়িতে হয়, তাহাতে একটু অস্বাভাবিকতা আসে।

ভাসায় ন | য়ন নীরে | সে

অথবা

যাবার বে | লায়, ছুয়া | রে—

এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে একটু কৃত্রিমতার অভিযোগ যথার্থই আসিতে পারে। এক, দুই বা তিন মাত্রার ছোট শব্দকে ভাঙিয়া পর্ব্ব অথবা পর্ব্বাঙ্গ-গঠন এক স্বরাঘাত-প্রধান (বা ছড়া-র) ছন্দে চলে। অন্যত্র কেবল অপূর্ণ অন্তিম পর্ব্ব-গঠনের সময়ই ইহা চলিতে পারে। উপরের উদাহরণে যে শেষ অক্ষরটিকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু "নয়ন" ও "বেলায়" এই দুইটি শব্দকে যে ভাবে ভাঙা হইয়াছে তাহাতে একটু কৃত্রিমতা ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঐ সূত্রেই স্বীকার করিয়াছেন যে "চরণের শেষে যেখানে

দীর্ঘ যতি সেখানে একটিমাত্র ধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে সেই যতির মধ্যে তাকে আসন দেওয়া যায়" ; * কিন্তু অন্যত্র তাহা চলে না।

যাহা হউক, চার চার মাত্রা করিয়াও যদি ভাগ করা যায়, তবে এক একটি বিভাগ যে পর্ব্ব ও সমগ্র পংক্তিটি যে চরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন যে "চরণের শেষে দীর্ঘ যতি" আছে বলিয়া পংক্তির শেষের "ধ্বনি"কে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইতেছে। সুতরাং এখানে যে চার মাত্রার পর্ব্ব ও নয় মাত্রার চরণ আছে তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(ঝ) আলো এল যে দ্বারে তব
ওগো মাধবী বনছায়া।
দোঁহে মিলিয়া নব নব
তৃণে বিছায়ে গাঁথো মায়া॥

এখানেও প্রতি পংক্তি এক একটি চরণ, পর্ব্ব নহে। লিখিবার কায়দা হইতেই বোঝা যায় যে প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির দুই মাত্রাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে এবং তদনুসরণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির প্রথম দুই মাত্রাকেও বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। সুতরাং বড় জোর এখানে সাত মাত্রার পর্ব্ব পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে ছন্দোলিপির সঙ্কেত হইবে ২ + (৩ + ৪), (২ + ৩ + ৪) নহে। নতুবা (২ + ৩) + (২ + ২) এই সঙ্কেতে মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার ধরিয়া পাঠ করাও বেশ চলিতে পারে। সমগ্র পংক্তিটি একটি পর্ব্ব এবং ইহার মধ্যে অর্দ্ধযতিরও স্থান নাই—এরূপ ধারণা কেন অসঙ্গত তাহা পরে বলিতেছি।

(ঞ) সেতারের তারে ধানশী
মীড়ে মীড়ে উঠে বাজিয়া।
গোধূলির রাগে মানসী
সুরে যেন এলো সাজিয়া॥

এখানে মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার। প্রতি পংক্তিতে দুইটি পর্ব্ব ; প্রথমটি ছয় মাত্রার, দ্বিতীয়টি তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব্ব। (ছ) উদাহরণের সহিত ইহার ছন্দোগত কোন প্রভেদ নাই। "নিজ হাতে নিয়ো তুলিয়া" ও "সুরে যেন এলো সাজিয়া" ইহাদের ছন্দোলক্ষণ ও ধ্বনিপ্রবাহ একই।

---

* "বাংলা ছন্দের মূলসূত্রে"র ২১ (ক) সূত্রে এই কথাই বলা হইয়াছে।

(ট) জলে ভরা নয়ন-পাতে
বাজিতেছে মেঘ-রাগিণী।
কি লাগিয়া বিজনরাতে
উড়ে হিয়া, হে বিরাগিণী॥

এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব। প্রথমটি ৪ মাত্রার ও দ্বিতীয়টি ৫ মাত্রার। ৪ ও ৫ মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ-সম্বলিত ৯ মাত্রার পর্ব্ব এখানে নাই। প্রথমতঃ পাঁচ মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ হয় না। উপরের পংক্তি-গুলিতে 'নয়ন-পাতে', 'মেঘ-রাগিণী' প্রভৃতি এক একটি পর্ব্ব, পর্ব্বাঙ্গ নহে; পড়িতে গেলেই একাধিক beat বেশ ধরা পড়ে। লিখিবার কায়দা হইতেও দেখা যায় যে চার মাত্রার পরই একটু বেশী করিয়া ফাঁক রাখা হইয়াছে। তাহাতেও বোঝা যায় যে ঐ স্থানে একটু যতি আছে, অর্থাৎ ঐখানে পর্ব্ব-বিভাগ হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদাহরণ-গুলি রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, সেগুলি নয় মাত্রার **চরণের** দৃষ্টান্ত, নয় মাত্রার **পর্ব্বের** দৃষ্টান্ত নহে।

এইবার crucial test বা চূড়ান্ত প্রমাণের কথা বলি। পর্ব্বমাত্রকেই পর্ব্বাঙ্গে বিভাগ করার নানা সঙ্কেত আছে। আট মাত্রার পর্ব্বকে ৪+৪ অথবা ৩+৩+২ সঙ্কেত অনুসারে, দশ মাত্রার পর্ব্বকে ৩+৩+৪, ৪+৩+৩, ৪+৪+২, ২+৪+৪ সঙ্কেত অনুসারে পর্ব্বাঙ্গে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু দুইটি পর্ব্বের মোট মাত্রা সমান থাকিলে তাহাদের পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগের সঙ্কেত বিভিন্ন হইলেও তাহারা একাসনে স্থান পাইতে পারে। নয় মাত্রার ছন্দ বলিয়া যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নানা বিভিন্ন সঙ্কেত আছে। যদি বিভিন্ন সঙ্কেতের পংক্তিগুলির পরস্পর পরিবর্ত্তন দ্বারা ছন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে তবেই প্রমাণ হইবে যে পংক্তিগুলি পর্ব্ব। যদি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের মধ্যে পর্ব্বগত পার্থক্য আছে, এবং মোট মাত্রাসংখ্যা সমান থাকিলেও ঐ কারণে ছন্দঃপতন হইতেছে। অর্থাৎ পংক্তিগুলি চরণ, পর্ব্ব নহে। এইবার পরীক্ষা করা যাক্। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হইতেই পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

গভীর গুরু গুরু রবে
বাজিতেছে মেঘ-রাগিণী।
মোর ব্যথাখানি লুকায়ে
বসিয়াছিলে একাকিনী॥

অর্থের খিচুড়ি হোক, ছন্দেরও খিচুড়ি হইতেছে কি? প্রতি পংক্তিতে নয় মাত্রা কিন্তু বজায় আছে।

> শুকতারা চাঁদের সাথী
> সাথী নাহি পায় আকাশে।
> চাঁপা, তোমার আঙিনাতে
> ভাসায় নয়ন নীরে সে।

এ স্থলে প্রতি পংক্তিতেই নয় মাত্রা আছে, কিন্তু ছন্দ অক্ষুণ্ণ আছে কি?

এই উপলক্ষে শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের উদাহরণ কয়েকটির উল্লেখ করিতে চাই। তাঁর রচনা হইতেও ঠিক্ প্রমাণ পাওয়া গেল না, কারণ তাঁহার উদাহরণে প্রতিসম পংক্তিগুলিতে একই সঙ্কেত রাখিয়াছেন। 'গুরু ছন্দ গর্জ্জন' 'করি বৃন্ত বর্জ্জন' এই দুই পংক্তিতে একই সঙ্কেত, (২+৩)+৪। সেইরূপ 'রাখিলাম নয় মাত্রা', 'করিলাম মহাযাত্রা' এই দুই স্থলে সঙ্কেত (৪+২)+৩। তত্রাচ "ছন্দ কিছু হইয়াছে কি না ছন্দ-রসিকই বলিতে পারেন"।

এইবার নয় মাত্রার পর্ব্ব রচনা বাংলায় সম্ভব কিনা তৎসম্বন্ধে দু' একটি তর্ক উত্থাপন করিতে চাই। পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের মধ্যে বিচার হিসাবে সেগুলি বোঝান সুবিধা হইবে।

পূঃ পঃ—নয় মাত্রার পর্ব্ব বাংলায় না চলার কোন কারণ নাই। বাংলায় বিষম মাত্রার পর্ব্ব চলে এবং দশ মাত্রা পর্য্যন্ত দীর্ঘ পর্ব্বের চলন আছে। সুতরাং নয় মাত্রার পর্ব্ব বেশ চলিতে পারে।

উঃ পঃ—কিন্তু তাহার উদাহরণ দিতে পার?

পূঃ পঃ—উদাহরণ আপাততঃ দিতে পারিতেছি না। এ রকমের পর্ব্ব কবিরা হয়ত ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে করিলেও করিতে পারেন। না করিবার কোন কারণ আছে কি?

উঃ পঃ—আছে। বাংলা ছন্দের পর্ব্বগঠনের রীতি অনুসারে নয় মাত্রার পর্ব্ব রচিত হইতে পারে না।

পূঃ পঃ—কেন?

উঃ পঃ—পর্ব্বমাত্রেই দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। বাংলায় যখন চার মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব্বাঙ্গ চলে না, তখন দুইটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া নয় মাত্রার পর্ব্ব রচিত হইতে পারে না। যদি তিনটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া নয় মাত্রার পর্ব্ব

রচনা করিতে হয়, তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি সঙ্কেতের অনুসরণ করিতে হইবে। (অ) ২+৩+৪, (আ) ৪+৩+২, (ই) ২+৪+৩, (ঈ) ৩+৪+২, (উ) ৩+৩+৩, (ঊ) ৩+২+৪, (ঋ) ৪+২+৩, (এ) ৪+৪+১, (ঐ) ৪+১+৪, (ও) ১+৪+৪। কিন্তু এই দশটির মধ্যে (ই), (ঈ), (ঊ), (ঋ), (ঐ) নামক সঙ্কেতগুলি অচল, কারণ তাহাতে দৈর্ঘ্যের ক্রম অনুসারে পর্ব্বাঙ্গগুলিকে সাজান হয় নাই, সুতরাং বাংলা ছন্দের একটি মূল রীতির ব্যভিচার হইয়াছে। বাকী রহিল পাঁচটি,—(অ), (আ), (উ), (এ), (ও)। তন্মধ্যে (অ), (আ), (এ), (ও) নামক সঙ্কেতে যুগ্ম মাত্রার ও অযুগ্ম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গের পর পর সন্নিবেশ হইয়াছে। বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ পর পর থাকিলে একটা উচ্ছল, চপল ভাব আসে, তজ্জন্য অবিলম্বে যতি স্থাপন করিয়া ছন্দের ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয়; অর্থাৎ কেবলমাত্র দুই পর্ব্বাঙ্গযোগে রচিত পর্ব্বেই বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ ব্যবহৃত হইতে পারে। তিন পর্ব্বাঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বে অযুগ্ম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ ব্যবহৃত হইলেই তাহার পর আর একটি অযুগ্ম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ বসাইয়া ছন্দের সাম্য রক্ষা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' ছন্দ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন তাহাতেও এই তত্ত্বের আভাস আছে। 'পরিচয়ে'ও রবীন্দ্রনাথ নয় মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন সেগুলিতে যে তিনি পংক্তিতে বাস্তবিক একাধিক পর্ব্বের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা হইতেও একথা প্রমাণ হয়।

পূঃ পঃ—কিন্তু (উ) চিহ্নিত পর্ব্বাঙ্গে ত কোন রীতিরই ব্যত্যয় হয় নাই।

উঃ পঃ—হয় নাই বটে, কিন্তু সেখানে ছয় মাত্রায় পর্ব্ব-বিভাগ করার প্রবৃত্তি এত সহজে আসে যে নয় মাত্রার পর্ব্ব আর থাকে না। নয় অযুগ্ম সংখ্যা। অযুগ্ম সংখ্যার পর্ব্ব বাংলায় বেশী ব্যবহার হয় না। পাঁচ ও সাত মাত্রার পর্ব্ব বাংলায় চলে, কিন্তু Syncopated movement বা খঞ্জগতির পর্ব্ব হিসাবেই তাহারা চলে। সেজন্য দুইটি মাত্র বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গের পরস্পর সান্নিধ্য আবশ্যক, সম মাত্রার তিনটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া Syncopated movement রাখা যায় না।

পূঃ পঃ—এ সমস্ত যুক্তির সারবত্তা যথেষ্ট আছে বটে, তত্রাচ ৩+৩+৩ সঙ্কেতের পর্ব্ব চলিবে না কেন? অবশ্য Syncopated movement না হইতে

পারে, কিন্তু অন্য রকমের গতিও ত সম্ভব। কোন ভবিষ্যৎ ছন্দঃ-শিল্পীর রচনায় এ-কথা প্রমাণ হইতে পারে। প্রাচীন তরল ত্রিপদীর শেষ পদ কি ৯ মাত্রার পর্ব্ব নহে ?

১৩৪০।

রবীন্দ্রনাথ পরে এই প্রবন্ধের এক উত্তর দিয়াছিলেন। কবিগুরুর সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা ছিল না বলিয়া আমি কোন প্রত্যুত্তর করি নাই। দ্বিতীয় প্রবন্ধে-ও রবীন্দ্রনাথ আমার যুক্তির উত্তর দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, পর্ব্ব ও চরণ লইয়া গোলমাল করিয়াছেন, তর্ক যে নয় মাত্রার চরণ নহে, নয় মাত্রার পর্ব্ব লইয়া, তাহা অনেক সময়ে বিস্মৃত হইয়াছেন। অনেক সময়ে আমি যাহা বলি নাই তাহা আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন, আবার কখন কখন "পঞ্চমাত্রা ঘটিত এই বারোমাত্রা" প্রভৃতি বলিয়া আমার যুক্তি-ই অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত 'ছন্দ' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এ সম্পর্কে লিখিত দুইটি প্রবন্ধ-ই স্থান পাইয়াছে বলিয়া বন্ধুদের অনুরোধে বর্ত্তমান প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করিলাম।

পরিশেষে বলা আবশ্যক যে ছান্দসিক হিসাবে কবিগুরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কাহারও চেয়ে কম নহে। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাদি পড়িয়াই ছন্দের আলোচনায় আমার প্রবৃত্তি হয়। ১৩৩৮ সালের বৈশাখে তাঁহার সহিত আমার দেখা হয়, এবং ছন্দ লইয়া আলোচনা হয়। তিনি মুখে ও পত্রে এ বিষয়ে আমার প্রয়াস সম্পর্কে তাঁহার যে অভিমত জ্ঞাপন করেন তাহাতে আমি ধন্য বোধ করি। পরে ছন্দ সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার মতেরই পোষকতা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সহিত আমার কদাচ যে মতভেদ হইয়াছে তাহা একটা পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার বা নগণ্য বিষয় লইয়া। ছন্দ সম্পর্কে তাঁহার অনুভূতির প্রামাণ্যতা আমি নতমস্তকেই স্বীকার করি।

গদ্যের ছন্দ *

পদ্যের ছন্দ লইয়া প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই অল্পাধিক চর্চ্চা হইয়াছে, এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত কাব্যছন্দের রীতি নির্ণয়ের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু ছন্দ কেবল পদ্যে নয়, গদ্যেও আছে। ব্যাপক অর্থে ধরিলে, ছন্দ সমস্ত সুকুমার কলারই লক্ষণ। সুলিখিত গদ্যও যে সুন্দর হইতে পারে তাহা আমরা সকলেই জানি, এবং সেই সৌন্দর্য্য যে মাত্র অর্থগত বা ভাবগত নয়, তাহার যে বাহ্য রূপ আছে, ধ্বনি-বিন্যাসের কৌশলে তাহা যে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করিতে ও আবেগের দ্যোতনা করিতে পারে, সে রকম একটা বোধও আমাদের অনেকের আছে। অর্থাৎ ছন্দোময় গদ্যের অস্তিত্ব আমরা অনেক সময়ে অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু গদ্যছন্দের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই, এবং ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও খুব স্পষ্ট নহে। Aristotle বলিয়া গিয়াছেন যে গদ্যেরও rhythm অর্থাৎ ছন্দ আছে, কিন্তু তাহা metrical অর্থাৎ কাব্যছন্দের সমধর্ম্মী নহে। গদ্যছন্দের ও কাব্যছন্দের পরস্পর পার্থক্য কিসে—তৎসম্বন্ধে Aristotle-এর মতামত জানা যায় না। যাঁহারা Latin ভাষার বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছেন তাঁহারা Cicero প্রভৃতি সুবক্তা ও সুলেখকের রচনায় ছন্দের সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছেন এবং নিয়মিত cursus ব্যবহার ইত্যাদি রীতি লক্ষ্য করিয়াছেন। Latin ভাষার শেষ যুগেও Vulgate Bible ইত্যাদিতে ছন্দের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তকাদিতে Vulgate Bible-এর প্রভাব যথেষ্ট, এবং ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্য ব্যবহারেও সে প্রভাব লক্ষিত হয়। কিছুকাল হইতে ইংরাজী সাহিত্যরসিকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ গদ্যের ছন্দ লইয়া আলোচনা করিতেছেন এবং তাহার ফলে ইংরাজী গদ্যছন্দ সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার তৃপ্তি না হইলেও এতদ্বিষয়ে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাংলা গদ্যছন্দ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি তথ্য আলোচনা করার চেষ্টা হইবে।

ইংরাজী উচ্চারণে accent-এর গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া accent-এর অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। ইংরাজী পদ্যছন্দের ন্যায়

---

* গদ্য ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎপ্রণীত Studies in the Rhythm of Bengali Prose and Prose-Verse (Journal of the Department of Letters, Calcutta University, Vol. XXXII) নামক প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে।

ইংরাজী গদ্যছন্দেও accent-ই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধ্বনিলক্ষণ। কিন্তু বাংলায় যতির অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। দুই যতির মধ্যবর্ত্তী শব্দসমষ্টি বা পর্ব্বের মাত্রা অনুসারে বাংলায় ছন্দোবিচার চলে। পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দ উভয়ত্রই এ কথা খাটে। ছন্দোময় গদ্যেরও উপকরণ—এক এক ঝোঁকে (impulse) সমুচ্চারিত শব্দসমষ্টি অর্থাৎ পর্ব্ব। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্—

"সত্য সেলুকস্! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি, গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে, আমি নির্ব্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবল তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামবেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম দৃশ্য)

উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির ভাষা গদ্য হইলেও তাহা যে ছন্দোময়—এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাংলা গদ্যছন্দের ইহা খুব উৎকৃষ্ট উদাহরণ নয়। এতদপেক্ষা আরও চমৎকার ও আবেগময় ছন্দোবদ্ধ গদ্য—রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের গদ্য-রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তির রীতি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই বোধ হয় সুপরিচিত। সহর মফস্বলের রঙ্গমঞ্চে, এমন কি অনেক বিদ্যালয়েও বহুবার এই কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং এই রচনার ছন্দ লইয়া আলোচনা করিলে তাহা সকলেরই প্রণিধান করা সহজ হইবে।

যতি মাত্রাভেদে দুই প্রকার—অর্দ্ধযতি ও পূর্ণযতি। গদ্যে এক একটি phrase বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টি লইয়া, কখন কখন বা এক একটি শব্দ লইয়া এক একটি পর্ব্ব গঠিত হয়, এবং এবম্বিধ পর্ব্বের পর একটি অর্দ্ধযতি পড়ে। কয়েকটি পর্ব্ব সহযোগে গদ্যের এক একটি বৃহত্তর বিভাগ অর্থাৎ বাক্য বা খণ্ডবাক্য গঠিত হয়, এবং তাহার পরে এক একটি পূর্ণযতি পড়ে। উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটির পর্ব্ববিভাগ করিলে এইরূপ দাঁড়াইবে।

[। চিহ্নের দ্বারা অর্দ্ধযতি এবং ॥ চিহ্নের দ্বারা পূর্ণযতি নির্দ্দেশ করা হইবে]

১ম বাক্য - সত্য, | সেলুকস্ ॥

২য় " - কি বিচিত্র | এই দেশ ॥

৩য় বাক্য - দিনে | প্রচণ্ড সূর্য্য | এর গাঢ় নীল আকাশ | পুড়িয়ে দিয়ে যায় ||
৪র্থ „ - আর | রাত্রিকালে | শুভ্র চন্দ্রমা এসে | তাকে | স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় | স্নান করিয়ে দেয় ||
৫ম „ - তামসী রাত্রে | অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে | যখন | এর আকাশ | ঝলমল করে.||
৬ষ্ঠ „ - আমি | বিস্মিত আতঙ্কে | চেয়ে থাকি ||
৭ম „ - প্রাবৃটে | ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি | গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে | প্রকাণ্ড দৈত্য-সৈন্যের মত | এর আকাশ ছেয়ে আসে ||
৮ম „ - আমি | নির্ব্বাক্ হয়ে | দাঁড়িয়ে দেখি ||
৯ম „ - এর | অভ্রভেদী | ধবল তুষার-মৌলি | নীল হিমাদ্রি | স্থিরভাবে | দাঁড়িয়ে আছে ||
১০ম „ - এর | বিশাল নদনদী | ফেনিল উচ্ছ্বাসে | উদ্দাম বেগে | ছুটেছে ||
১১শ „ - এর | মরুভূমি | বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত | তপ্ত বালুরাশি নিয়ে | খেলা কর্চ্ছে ||

পদ্যের পর্ব্বের ন্যায় গদ্যের পর্ব্বও দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বাঙ্গগুলির পরস্পর অনুপাত ও তুলনা হইতে-ই এক একটি পর্ব্বের বিশিষ্ট ছন্দোলক্ষণ জন্মে এবং স্পন্দনানুভূতি হয়। বাংলায় পদ্যের ন্যায় গদ্যেও ছন্দের হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। বাংলা গদ্যে মাত্রাপদ্ধতি পয়ারজাতীয় পদ্যের পদ্ধতির অনুরূপ ; অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর বা syllable এক মাত্রা বলিয়া ধরা হয়, কেবল শব্দের অন্ত্য অক্ষর হলন্ত হইলে তাহাকে দুই মাত্রা ধরা হয়। এক কথায়, গদ্যের মাত্রাপদ্ধতি স্বভাবমাত্রিক। এই পদ্ধতিই বাংলা উচ্চারণের সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি। তবে, মাত্রার দিক্ দিয়া বাংলা উচ্চারণের রীতি একেবারে বাঁধাধরা নয়, আবশ্যক মত আবেগের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে শব্দের অন্ত্য হলন্ত অক্ষর ছাড়া অন্যান্য অক্ষরেরও দীর্ঘীকরণ করা যাইতে পারে।

গদ্যেও এক একটি পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া থাকে। কখন কখন এক মাত্রার পর্ব্বাঙ্গও দেখা যায়।

গদ্যে পর্ব্বাঙ্গ-মাত্রেই একটি বা ততোধিক গোটা মূলশব্দ থাকিবে। গদ্যে শব্দাংশ লইয়া পর্ব্বাঙ্গ-গঠন করা চলে না। সুতরাং বলা বাহুল্য যে গদ্যের এক একটি পর্ব্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকিবে।

পদ্যের পর্ব্বের সহিত গদ্যের পর্ব্বের প্রধান পার্থক্য এই যে পদ্যে পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বাঙ্গগুলি হয় পরস্পর সমান হইবে, না হয়, তাহাদের মাত্রার ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে ; কিন্তু গদ্যে নানা উপায়ে পর্ব্বের মধ্যে

পর্ব্বাঙ্গগুলি সাজান যায়। আমাদের উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে নিম্নলিখিত ভাবে পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ হইয়াছে, দেখা যাইতেছে।

		পর্ব্বসংখ্যা
১ম বাক্য -	[২] । [৪]	... ২
২য় " -	(১+৩=) ৪ । (২+২=) ৪	... ২
৩য় " -	[২] । (৩+২=) ৫ । (২+৪+৩=) ৯ । (৩+৪=) ৭	... ৪
৪র্থ " -	[২] । (২+২=) ৪ । (২+৩+২=) ৭ । [২] । (২+৩=) ৫ । (২+৩+২=) ৭	... ৬
৫ম " -	(৩+২=) ৫ । (৩+৩+৪=) ১০ । [৩] । (২+৩=) ৫ । (৪+২=) ৬	... ৫
৬ষ্ঠ " -	[২] । (৩+৩=) ৬ । (২+২=) ৪	... ৩
৭ম " -	[৩] । (৪+৪=) ৮ । (২+৩+৩=) ৮ । (৩+৫?+২=) ১০ । (২+৩+৪=) ৯	... ৫
৮ম " -	[২] । (৩+২=) ৫ । (৩+২=) ৫	... ৩
৯ম " -	[২] । (২+২=) ৪ । (৩+৩+২=) ৮ । (২+৩=) ৫ । (২+২=) ৪ । (৩+২=) ৫	... ৬
১০ম " -	[২] । (৩+৪=) ৭ । (৩+৩=) ৬ । (৩+২=) ৫ । [৪]	... ৫
১১শ " -	[২] । (২+২=) ৪ । (৩+৫?+২=) ১০ । (২+৪+২=) ৮ । (২+২=) ৪	... ৫
		৪৬

এইবার বিশ্লিষ্ট উদ্ধৃতাংশের ছন্দোলক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করার সুবিধা হইবে।

এখানে মোট ৪৬টি পর্ব্ব আছে। তন্মধ্যে যে পর্ব্বগুলির দুই দিকে [ ] চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে মাত্র একটি করিয়া পর্ব্বাঙ্গ আছে। এইরূপ ১৩টি পর্ব্ব ১১টি বাক্যের মধ্যে আছে। মোটামুটি প্রত্যেক বাক্যে এইরূপ একটি পর্ব্ব থাকে ধরা যাইতে পারে। এইরূপ পর্ব্বে একটি মাত্র পর্ব্বাঙ্গ থাকে বলিয়া কোনরূপ ছন্দঃস্পন্দন ইহাতে পাওয়া যায় না, সুতরাং সূক্ষ্মবিচারে ইহাদিগকে ছন্দের পর্ব্ব বলা উচিত নয়! বাস্তবিক পক্ষে ইহারা ছন্দের অতিরিক্ত (hypermetric) এক একটি শব্দ মাত্র। বাক্যের মধ্যে যেখানে নূতন একটা ছন্দঃপ্রবাহের আরম্ভ, তাহার পূর্ব্বে ইহাদিগকে পাওয়া যায়। কদাচ ছন্দঃপ্রবাহের শেষেও ইহাদিগকে দেখা যায়। এই নিঃস্পন্দ শব্দগুলিকে ভর

করিয়াই ছন্দ-তরঙ্গে ভেলা ভাসাইতে হয়, কখন কখন ছন্দের ভেলা আসিয়া এইরূপ শব্দগুলিতে ঠেকিয়া স্থির হয়। পদ্যেও কখন কখন এইরূপ অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের ব্যবহার গদ্যেই অপেক্ষাকৃত বহুল। *

বিশেষ করিয়া লক্ষ্যের বিষয় এই যে উদ্ধৃতাংশে নানা বিভিন্ন আদর্শে পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গের সন্নিবেশ হইয়াছে। পদ্যে তিনটি পর্ব্বাঙ্গের দ্বারা কোন পর্ব্ব গঠিত হইলে তাহাদের প্রথম দুইটি বা শেষ দুইটি পর্ব্বাঙ্গ সমান রাখিতে হয়, অপেক্ষাকৃত হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর আর একটি পর্ব্বাঙ্গ পর্ব্বের আদিতে বা শেষে স্থান পায়, কিন্তু মধ্যে কদাচ তাহার স্থান হয় না। গদ্যে কিন্তু তাহা চলিতে পারে, এমন কি মধ্যলঘু বা মধ্যগুরু অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ছন্দোযুক্ত পর্ব্বের ব্যবহারেই গদ্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ কানে ধরা পড়ে। উদ্ধৃতাংশে ১০টি পর্ব্বে তিনটি করিয়া পর্ব্বাঙ্গ আছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটির গঠনরীতি পদ্যরীতির অনুযায়ী ("অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে", "গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে", "ধবল-তুষার মৌলি")। কিন্তু "শুভ্র চন্দ্রমা এসে", "স্নান করিয়ে দেয়" ইত্যাদি পর্ব্বের ব্যবহার পদ্যে চলে না।

এতদ্ভিন্ন গদ্যে পরস্পর অসমান তিনটি পর্ব্বাঙ্গ লইয়াও পর্ব্ব গঠিত হইতে পারে, পদ্যে তাহা চলে না। এই ধরণের চারিটি পর্ব্ব উদ্ধৃতাংশে দেখা যায় ("এর গাঢ়-নীল আকাশ", "প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত", "এর আকাশ ছেয়ে আসে", "বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত")। অসমান তিনটি পর্ব্বাঙ্গ থাকিলে বৃহত্তম পর্ব্বাঙ্গটি আদি, অন্ত বা মধ্য যে কোন স্থানে বসান যাইতে পারে। "এর গাঢ়-নীল আকাশ" এই পর্ব্বটিতে মধ্যে এবং "এর আকাশ ছেয়ে আসে" এই পর্ব্বটিতে অন্তে বৃহত্তম পর্ব্বাঙ্গটির স্থান হইয়াছে।

("প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত" ও "বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত" এই দুইটি পর্ব্ব সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার। আপাততঃ মনে হয় যেন ইহাদের সঙ্কেত ৩+৫+২, সুতরাং এই দুইটি পর্ব্বে যেন গদ্যছন্দের ব্যত্যয় হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের আবৃত্তি হয় ৩+৪+৩ এই সঙ্কেত অনুসারে, 'বিরাট্ স্বেচ্ছাচার এর্‌মত' এই ধরণে।)

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গদ্যে নয় মাত্রার পর্ব্বের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিন্তু পদ্যে নয় মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার দেখা যায় না। পদ্যে সাত মাত্রার পর্ব্ব

---

* পদ্যের মধ্যে গদ্যের আভাস আসার ফলে অনেক সময়ে নূতন ধরণের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় এবং পদ্যের ব্যঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা সমস্ত ভাষাতেই ছন্দের একটি গূঢ় রহস্য। পদ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ যোজনা করা গদ্যের আভাস আনিবার অন্যতম উপায়।

যে ভাবে গঠিত হয়, তাহা ভিন্ন অন্ত উপায়েও গদ্যে সাত মাত্রার পর্ব্ব রচিত হইয়া থাকে।

পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য এই যে—পদ্যছন্দ ঐক্যপ্রধান এবং গদ্যছন্দ বৈচিত্র্যপ্রধান। পদ্যে এক একটি বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের অর্থাৎ চরণের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বগুলি সাধারণতঃ সমান হয়, কেবল চরণের শেষ পর্ব্বটি পূর্ণ বিরামের পূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া অনেক সময়ে হ্রস্বতর হয়। যে স্থলে পর পর পর্ব্বগুলির মাত্রা সমান নয়, সে স্থলে কোন সুস্পষ্ট আদর্শের অনুসরণে তাহাদের মাত্রা নিয়মিত হয়। গদ্যে কিন্তু বৈচিত্র্যের-ই প্রাধান্য। পর পর পর্ব্বগুলি সমান না হওয়া কিম্বা কোন নক্সার অনুসরণে পর্ব্বের মাত্রা নিয়মিত না হওয়াই গদ্যের রীতি। বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পর্ব্বগুলি সাময়িক আবেগের প্রকৃতি অনুসারে কখন কখন ক্রমে হ্রস্বতর, কখন কখন দীর্ঘতর হয়। কিন্তু বাক্যের শেষে পৌঁছিলে এইরূপ গতির প্রতিক্রিয়া হয়, প্রায়ই শেষ পর্ব্বে বিপরীত প্রবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতেই গদ্যের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এই ধরণের গতি হইতেই বিশিষ্ট গদ্যছন্দের লক্ষণ প্রকটিত হয়। উদ্ধৃতাংশের পর্ব্বগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যাইবে।

প্রথম বাক্যটির দুইটি পর্ব্বই এক-শব্দ-যুক্ত এবং ছন্দঃস্পন্দনহীন। শুধু এই বাক্যটি হইতেই কোনরূপ ছন্দের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। দ্বিতীয় বাক্যটিতে চারি মাত্রার পরস্পর সমান দুইটি পর্ব্ব আছে। দুইটি পরস্পর সমান পর্ব্ব থাকায় এই বাক্যটির ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে। গদ্যে এইরূপ প্রতিসম বাক্যের ব্যবহার চলে, কিন্তু পদ্যছন্দেরই ইহা বিশিষ্ট লক্ষণ। সুতরাং ইহাতে বিশিষ্ট গদ্যছন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যটি একত্র পাঠ করিলে এবং একই ছন্দ-প্রবাহের অংশ বলিয়া ধরিলে, গদ্যছন্দের লক্ষণ পাওয়া যায়। তাহা হইলে প্রথম বাক্যটিকে ৬ মাত্রার একটি পর্ব্ব এবং দ্বিতীয় বাক্যটিকে ৮ মাত্রার আর একটি পর্ব্ব বলিয়া ধরা যায়। সে ক্ষেত্রে গদ্যসুলভ উত্থানশীল (rising) ছন্দের ভাব আসিবে। তৃতীয় বাক্যটিতে একটি অতিরিক্ত শব্দের উপর ঝোঁক দিয়া ছন্দের প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, পর পর পর্ব্বগুলি বিশিষ্ট গদ্যছন্দের আদর্শে অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ভাবে (waved rhythm) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছন্দঃপ্রবাহ প্রথমে উত্থানশীল এবং শেষে একটি উপান্ত্য পর্ব্বে পৌঁছিয়া পতনশীল হইয়াছে। এইরূপ পর্ব্ব-সন্নিবেশ অন্যান্য বাক্যেও দেখা যাইবে। কোন কোন বাক্যে, যেমন ৪র্থ ও ৯ম বাক্যে, দুইটি প্রবাহ আছে

দুইটি প্রবাহের মধ্যস্থলে একটি ছেদের অবস্থান আছে। ছন্দের প্রবাহ কখন উত্থানশীল, কখন তরঙ্গায়িত। অনেক সময়েই ছন্দঃপ্রবাহের ঝোঁক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার আছে। কদাচ, যেমন ১০ম বাক্যে, পতনশীল ছন্দও পাওয়া যায়। ক্বচিৎ প্রতিসম পর্ব্বের যোজনা দেখা যায়, কিন্তু এরূপ ব্যবহার গদ্যছন্দে খুব কম। অন্যান্য আদর্শের ছন্দঃপ্রবাহের মধ্যে পড়িয়া ইহার প্রভাব ক্ষীণ হইয়া থাকে।

পর পর পর্ব্বগুলি গদ্যে ঠিক একরূপ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহাদের মোট মাত্রাই সাধারণতঃ সমান থাকে না। যেখানে পর পর দুইটি পর্ব্বের মোট মাত্রা সমান, সে ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গ-সন্নিবেশের দিক্ দিয়া পার্থক্য থাকে। যেখানে সেদিক দিয়াও মিল আছে, সেখানে অন্ততঃ যুক্তাক্ষর ব্যবহারের দিক্ হইতে বৈষম্য আছে, এবং তদ্দ্বারা সমান মাত্রার ও একই সঙ্কেতের দুইটি পর্ব্বের মধ্যে অসাদৃশ্য পরিস্ফুট হয়। এইরূপে গদ্যে বৈচিত্র্য রক্ষা হইয়া থাকে।

গদ্যে সাধারণতঃ এক একটি বাক্যেই ছন্দের আদর্শের পূর্ণতা হইয়া থাকে, সুতরাং স্তবক-গঠনের প্রয়াস থাকে না। তবে আবেগবহুল গদ্যে কখন কখন পর পর কয়েকটি বাক্য লইয়া একটি ছন্দের আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যায়। এ রকম স্থলে সেই আদর্শ তরঙ্গায়িত ছন্দের আদর্শের অনুরূপ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তরঙ্গায়িত ছন্দই গদ্যের বিশিষ্ট ছন্দ।

১৩৩৯

বাংলা ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে যে সমস্ত ছন্দ প্রচলিত ছিল, সেগুলি প্রধানতঃ "বৃত্ত"-জাতীয়। * তাহাতে প্রত্যেক প্রকারের ছন্দোবন্ধের একটা শক্ত কাঠাম ছিল, একটা কঠোর নিয়ম অনুসারে সুনির্দিষ্ট পারম্পর্য্য অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষর বসান হইত। মোট মাত্রাসংখ্যার জন্য কোন ভাবনা ছিল না, গানে যেমন সুরের পারম্পর্য্যটা মুখ্য, বৃত্ত ছন্দেও তদ্রূপ। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের শেষের যুগে ও অনেক প্রাকৃত ছন্দে দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্য রকমের একটা লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে, সমস্ত পদ কয়েকটি সমমাত্রিক ভাগে বিভাজ্য হইতেছে, কখন বা একই রকমের গণের পুনরাবৃত্তি হইতেছে। আসল কথা, মাত্রা-সমকত্বের নীতি ভারতীয় ছন্দে প্রবেশ-লাভ করিতেছে। এই সময়েই গীতি আর্য্যা, জাতি ছন্দ, মাত্রাচ্ছন্দ প্রভৃতি শ্রেণীর ছন্দ পাওয়া যায়। কি প্রকারে এই পরিবর্তন সাধিত হইল তাহা এখন বলা প্রায় অসম্ভব। তবে আমার ধারণা এই যে, বৈদিক ছন্দের সঙ্গে আদিম ভারতীয় ছন্দের সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে এরকম অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের শেষের যুগে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার বহু অনার্য্যসম্ভূত লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই সব অনার্য্যদের বোধ হয় মজ্জাগত একটা প্রবৃত্তি ছিল—মাত্রাসমকত্বের দিকে। তাহাতেই বোধ হয় এই পরিবর্তন। যাহা হউক্, জয়দেবের লেখায় দেখি যে প্রাচীন বৃত্ত ছন্দের মূল প্রকৃতি ছাড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও একটা জিনিষ বজায় আছে দেখা যায়—অর্থাৎ সংস্কৃত অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘের প্রভেদ। কিন্তু "বৌদ্ধ গান ও দোহা"য় দেখি, তাহাও নাই। বাংলা ছন্দের যে মূল লক্ষণগুলি সংস্কৃত ছন্দ হইতে তাহার প্রভেদ নির্দ্দেশ করে,—অর্থাৎ সমমাত্রার দুই তিনটি পর্ব্ব লইয়া এক একটি চরণ গঠন এবং পর্ব্বাঙ্গ সংযোজনের আবশ্যকতা অনুসারে অক্ষরের দৈর্ঘ্য নির্ণয়, তাহা, 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র মধ্যেই পাওয়া যায়। অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলেও শুধু ছন্দের প্রমাণ হইতেই বলা যায় যে, 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে আমরা প্রাকৃত প্রভৃতির যুগ অতিক্রম করিয়াছি ; নূতন ভাষার উদ্ভব হইয়াছে।

---

* "পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা" (ছন্দোমঞ্জরী)

যেমন—

কায়া তরুবর | পঞ্চ বি ডাল	ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গ ঢ় ই
চঞ্চল চীএ | পইঠো কাল	পার গামি লোঅ | নিভর তরই
(সংস্কৃত রীতি)	(আধুনিক রীতি)

বাংলার আদিতম ও প্রধানতম ছটি ছন্দোবন্ধ—যাহাদের পরে নাম দেওয়া হয় পয়ার ও লাচাড়ি—তাহাদেরও পরিচয় এখানে পাই *। পয়ার সম্ভবতঃ পদাকার (পদ + আকার) কথা হইতে আসিয়াছে, যাঁহারা গান ও দোহা ইত্যাদির পদ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা এই ছন্দোবন্ধে রচনা করিতেন। প্রাচীন পয়ারের সহিত সংস্কৃত পাদাকুলক ছন্দের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়, বোধ হয় পাদাকুলক শব্দের সহিত পদ ইত্যাদি কথার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। অবশ্য এ সম্বন্ধে আমি জোর করিয়া কিছু বলিতে চাহি না, সমস্ত-ই আন্দাজ। লাচাড়ি—যাহার নাম পরে হইয়াছিল ত্রিপদী—যে লাচ বা নাচ হইতে উদ্ভূত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, নৃত্যকলার এক-দুই-তিন এই সঙ্কেতের সঙ্গে লাচাড়ির বা ত্রিপদীর স্পষ্ট মিল রহিয়াছে। প্রথমে এই পয়ার ও ত্রিপদী একটু দীর্ঘতর ও টানা ছিল ; পয়ার ছিল ৮ + ৮, আর ত্রিপদী ছিল ৮ + ৮ + ১২।

ইহার পরের যুগে একটা নূতন রকমের স্রোত দেখিতে পাই। মধ্যযুগের বাংলায় দেখি ক্রমশঃ যেন দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে যে সমস্ত পদ্য রচনা আগে হয়ত ৮ + ৮ এই সঙ্কেতে পড়া হইত, সেগুলি পড়া হইতে লাগিল ৮ + ৭এ, এবং ক্রমে সেগুলি পড়া হইতে লাগিল ৮ + ৬এ, তাহাই শেষে হইল পয়ারের বাঁধা নিয়ম। লাচাড়ীও সেই ৮ + ৮ + ১২ হইতে হ্রস্বতর হইয়া দাঁড়াইল ৮ + ৮ + ১০এ। এই যে একটা প্রবৃত্তি—যাহার জন্য ক্রমশঃ প্রাচীন উচ্চারণের বাঁধা মাত্রাপদ্ধতি উঠিয়া গেল, এবং বলিতে গেলে ক্রমে দীর্ঘস্বরের ব্যবহারই চলিয়া গেল—ইহার মধ্যে আমাদের ভাষার ও সমাজের

* পয়ারের কাঠামো বহু পূর্বে রচিত প্রাকৃত পদ্যে পাওয়া যায়। যথা—

পরিধুণমাণো কিরণপদং
অভিরুহমাণো উদয়গিরিং
উড়ুগণবন্ধু তিমিরভরে—
উদয়দি চন্দো গগণতলে (ভরত-নাট্য শাস্ত্র)

একটা বড় তথ্য লুক্কায়িত আছে বলিয়া মনে করি। সম্ভবতঃ ইহার রহস্য এখন পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

মধ্যযুগের বাংলায় এবং তাহারও কিছু পর পর্য্যন্ত পয়ার ও ত্রিপদী বাংলা ছন্দের বাহন ছিল। মধ্যযুগ হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনে হয় যেন বাংলা ছন্দ প্রাচীন রীতির নিশ্চয়তার ঘাট হইতে ছাড়া পাইয়া অনিশ্চয়তার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার পরে যেন ভারতচন্দ্রের যুগে আর একটা নিশ্চয়তার ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। ততদিনে আবার একটা যেন নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে; এই রীতিতে সমস্ত অক্ষরই হ্রস্ব, কেবল শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষর দীর্ঘ। ছন্দের ভিত্তি হইল পর্ব্ব, এবং সাধারণতঃ সেই পর্ব্ব হইবে আট মাত্রার। বাংলা হস্তলিপির কায়দা অনুসারে মাত্রাসংখ্যার আর হরফের সংখ্যার মিল হওয়াতে লোকে ভাবিতে লাগিল যে ছন্দ নির্ণয় হয় হরফ্ বা তথাকথিত অক্ষর গণনা করিয়া। এই ভুলের জন্য অবশ্য মাঝে মাঝে একটু আধটু অসুবিধাও হইত, তাহা ছাড়া চরণ যে ছন্দের মূল উপকরণ নয় এইটা না বোঝার জন্য কখন কখন ৭+৭কে ৮+৬এর সমান ধরিয়া চালান হইত।

ধ্বনির ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যের সমাবেশেই ছন্দ। ঐক্য তাহাকে দেয় প্রাণ, বৈচিত্র্য তাহাকে দেয় রূপ। ঐক্যসূত্র না থাকিলে পদ্যের ছন্দ হয় না, কিন্তু শুধু একটা ঐক্যসূত্র থাকাই ছন্দের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহাতে ছন্দ হয় একঘেয়ে ও নিস্তেজ। ছন্দের যে বিচিত্র ব্যঞ্জনাশক্তি, প্রাণের রসকে রূপায়িত করিবার যে ক্ষমতা, কাব্যের বাণীকে কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করাইবার যে শক্তি আছে,—তাহা নির্ভর করে বৈচিত্র্যের উপযুক্ত সমাবেশের উপর। ঐক্য ছন্দের তাল, বৈচিত্র্য ছন্দের সুর। আধুনিক বাংলা ছন্দের একটা স্পষ্ট রীতি গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বে ঐক্যের সূত্রটাই ভাল নির্দ্দিষ্ট ছিল না, সুতরাং তখনকার দিনে পদ্যরচনায় বৈচিত্র্য আনিবার কোন বিশেষ প্রয়াস দেখা যায় না। কি প্রকারে ঐক্য ও সৌষম্য বজায় থাকে সেই দিকেই কবিকুলের একান্ত প্রয়াস ছিল। যখন তথাকথিত বর্ণমাত্রিক বা হরফ্-গোনা ছন্দোবন্ধের রীতিটা স্পষ্ট হইল, তখন একটা নির্ভরযোগ্য ঐক্যসূত্র পাইয়া বাংলার কবিকুল যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাংলা ছন্দ যেন পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার সেই প্রয়াসের চরম পরিণতি ও সার্থকতা দেখি ভারতচন্দ্রের কাব্যে।

ভারতচন্দ্রের একটা সদাজাগ্রত ছন্দোবোধ ছিল বলিয়া শুধু ছন্দের মধ্যে

ঐক্যসাধন করিয়াই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি ছন্দে মনোহারিত্ব বা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। একটু নূতন সঙ্কেতে চরণ গঠন করার চেষ্টা, নূতন সংখ্যক মাত্রা দিয়া পর্ব্ব তৈয়ার করার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। লঘু ত্রিপদী তাঁহার সময় হইতেই খুব বেশী ভাবে চলিত হইয়াছে। কিন্তু এদিক দিয়া যে ছন্দঃস্পন্দনের বৈচিত্র্য আনার বিষয়ে খুব সুবিধা হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি একেবারেই পর্ব্বের ভিতরে ধ্বনির স্পন্দন আনিবার চেষ্টা করেন তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, সুকৌশলে তিনি সংস্কৃতের অনুযায়ী দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ বাংলায় আনিবার চেষ্টা করেন, এবং অনেক স্থলে যে রকম সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর ছন্দোবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সব জায়গাতেই যে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। সুতরাং এই কারণে, হয়ত, বহুল পরিমাণে এ চেষ্টা তিনি করেন নাই। আর একটা নূতন ঢঙের ছন্দ তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রচলন করেন—বাংলা গ্রাম্য ছড়ার ছন্দ হইতে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকে, তজ্জন্য একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য দোলা অনুভব করা যায়। ইহার প্রতি পর্ব্বে চার মাত্রা ও দুই পর্ব্বাঙ্গ। ইহার ইতিহাস সম্ভবতঃ ছন্দের সনাতন ধারার সহিত সংস্রবহীন, অনার্য্যদের নাচ ও গানের তালের সহিত ইহার খুব মিল দেখা যায়, এবং বাঙালীর ছন্দোবোধের সহিতও ইহা বেশ খাপ খায়। আজও ঢাকের বাদ্যে ইহার প্রভাব দেখা যায়। ভারতচন্দ্র কিন্তু এই রীতি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা করেন নাই, বোধ হয় ইহার প্রাকৃত ও গ্রাম্য সংস্রবের জন্য তিনি সাহিত্যে ইহার ব্যবহারে সঙ্কুচিত ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষা দীক্ষার প্রবল প্রভাবে বাংলা ছন্দেও একটা বিপ্লবের সূচনা হইল। ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, যদিও ছড়ার ছন্দকে সাহিত্যে কতকটা জাতে তুলিবার কাজ তিনি করিয়াছেন। তাহার পরে আসিল বৈচিত্র্যের সন্ধানের যুগ। বাংলা ছন্দের স্বপ্নভঙ্গ হইল, নির্ঝরের মত সে বাহির হইয়া পড়িল।

প্রথম কিছুদিন সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার একটু চেষ্টা হইয়াছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রকৃতি মাঝে মাঝে কৃতকার্য্য হইলেও, ঐ ধরণের উচ্চারণ যে বাংলায় চলিবে না তাহা বেশ বোঝা গেল। তখন খুব বেশী করিয়া ঝোঁক পড়িল নূতন নূতন সঙ্কেতে চরণ গঠন করার এবং নানা বিচিত্র নক্সায় স্তবক গড়িয়া তোলার

চেষ্টার উপর। সে চেষ্টার বো হয় চরম পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। আমার 'Rabindranath's Prosody' প্রবন্ধে তাঁহার বিচিত্র চরণ ও স্তবকের কথা বলিয়াছি। এই চরণ ও স্তবকের গঠনবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াই আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের অনুভূতির ব্যঞ্জনা হইয়াছে। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা'র বেদনা, 'আত্মবিলাপে'র বিষাদ, হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীতে'র উদ্দীপনা হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী'র আহ্বান পর্য্যন্ত এই বৈচিত্র্যে ধ্বনিত হইয়াছে।

বৈচিত্র্য আধুনিক ছন্দে আনা হইয়াছে আরও দুই এক দিক্ দিয়া। হলন্ত অক্ষর বাংলায় দীর্ঘ হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া ধরার একটা প্রথা চালাইয়াছেন। তাহার ফলে আধুনিক বাংলায় একটা বিশিষ্ট মাত্রাচ্ছন্দ চলিত হইয়াছে। ইহাতে পদ্য লেখা অনেকের পক্ষে সহজ হইয়াছে, এবং যুক্তবর্ণ যেখানেই আছে সেখানেই একটা দোলা বা তরঙ্গের সৃষ্টি হয় বলিয়া পর্ব্বের মধ্যেই একটা বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এ ছন্দে লয়-পরিবর্ত্তন নাই, ইহাতে গাম্ভীর্য্য বা উদাত্ত ভাব নাই, ইহাতে অমিতাক্ষর ছন্দ-ও রচনা করা যায় না, কোন রকম মুক্ত ছন্দও হয় না। ইহা গীতিকবিতার পক্ষে খুব উপযোগী।

এতদ্ভিন্ন ছড়ার ছন্দ আজকাল উচ্চ সাহিত্যে বেশ চলিতেছে। ইহাতে শ্বাসাঘাতের পৌনঃপুনিকতার জন্য ছন্দে বেশ একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়। সাহিত্যে ইহার বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট গৌরব আছে। 'পলাতকা'র কবিতায়, 'শিশু'র অনেক কবিতায় এই ধরণের ছন্দোবন্ধ আছে।

কিন্তু সব চেয়ে বড় যুগান্তর আনিলেন মধুসূদন অমিত্রাক্ষরে। তিনি দেখাইলেন যে বাংলায় ছেদ যতির অনুগামী হওয়ার কোন আবশ্যিকতা নাই। ইহাই হইল তাঁহার অমিত্রাক্ষরের এবং মধুসূদনের গুরু Milton এর blank verse-এর আসল কথা। এই জন্য আমি তাঁহার blank verseকে বলি অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর—কারণ ঠিক্ কত মাত্রা বা অক্ষরের পর ছেদ আসিবে সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। এইখানে বাংলা ছন্দ প্রথম পাইল স্বেচ্ছাবিহারের ও মুক্তির স্বাদ। যতির নিয়মানুসারিতার জন্য অবশ্য একটা ঐক্যসূত্র রহিয়া গেল, কিন্তু ঐক্যের রঙকে ছাপাইয়া উঠিল বৈচিত্রের জ্যোতিঃ।

এই যে সন্ধান মধুসূদন দিয়া গেলেন তাহার এখনও শেষ হয় নাই। আধুনিক বাংলা ছন্দ একটা নিয়মের শৃঙ্খলা হইতে মুক্তি পাইয়া স্বেচ্ছাকৃত বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুভূতির স্পন্দনকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর যেন ঐক্যকে বড় বেশী বর্জ্জন করিয়াছে প্রথমতঃ এই রকম অনেকে মনে করিতেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ইহাকে অনেকটা নরম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আবার অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে মিত্রাক্ষর রাখিয়া এক অপরূপ ছন্দ চালাইয়াছেন, তাহাতে অমিত্রাক্ষরের বৈচিত্র্যও আছে অথচ মিত্রাক্ষর-জনিত ঐক্যটাও কানে বেশ ধরা দেয়। ইহা এখন সুপ্রচলিত। মধুসূদন ছেদ ও যতিকে বিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু যতির দিক্ দিয়া একটা বাঁধা ছাঁচ রাখিয়াছিলেন। অনেকে এই দোরোখা ছন্দ তত পছন্দ করেন না। সেইজন্য গিরিশচন্দ্র আর একটু অগ্রসর হইয়া বিভিন্ন মাত্রার পর্ব্ব দিয়া চরণ গঠন করিতে লাগিলেন, তবে প্রত্যেক চরণে প্রায়ই সমসংখ্যক পর্ব্ব রাখিয়া একটা কাঠাম কতকটা বজায় রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দে আর এক দিক দিয়া গিয়াছেন। তিনি ৮+১০ এই আঠার মাত্রার চরণকে ভিত্তি করিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ণ বা খণ্ডিত পর্ব্ব যথেচ্ছা বসাইয়াছেন, আবার কখন অতিরিক্ত শব্দ যোজনা করিয়া ছন্দের প্রবাহ ক্ষিপ্র করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে ছন্দের বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া সুকৌশলে মিলের দ্বারা চরণ-পরম্পরার মধ্যে একটা বন্ধন রাখিয়াছেন। ভাববৈচিত্র্য প্রকাশের পক্ষে ইহা খুব উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু এ সমস্ততেই পদ্যের নিয়মানুসারী একটা কিছু ঐক্য রাখার চেষ্টা হইয়াছে। ঐক্যকে একেবারে বাদ দিলে হয় free verse বা মুক্তবন্ধ ছন্দ। তাহা বাংলায় তেমন চলে নাই। বোধ হয় সে জিনিষটা আমাদের রুচিসঙ্গত নহে। কেহ কেহ ভুল করিয়া 'পলাতকা'র ছন্দকে মুক্তবন্ধ বলেন। সে কথাটা ঠিক নয়, কারণ 'পলাতকা'য় বরাবর সমমাত্রার (চার মাত্রার) পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে।

কিন্তু পদ্যের বিশিষ্ট রীতিতে গঠিত পর্ব্ব এবং পদ্যছন্দের রূপকল্প উপরের সব রকম লেখাতেই পাই। তাহা ছাড়া আবার গদ্যের ছন্দ আছে। তাহার এক একটি পর্ব্ব এক একটি বাক্যাংশ, তাহাদের গঠনরীতি ভিন্ন, তাহাদের সমাবেশের রূপকল্পও অন্যরকম। তবে কি ভাবে এই গদ্যছন্দে পদ্যের রূপকল্প আনা যায় তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়,—রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'য়। *

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসাহিত্য সমিতির অধিবেশনে ৬ই ফাল্গুন ১৩৪৪ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান।

রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কবিপ্রতিভা বাংলা ছন্দের ইতিহাসে যুগান্তর আনিয়াছে। ছন্দের সম্পদে আজ বাংলা বোধ হয় কোন ভাষার চেয়েই হীন নয়, যে কোন ভাব বা প্রেরণা আজ বাংলায় ঠিক্ যোগ্য ছন্দে প্রকাশ করা সম্ভব। এমন কি যেখানে ভাব হয় ত ক্ষীণ, ভাষা দুর্ব্বল, সেরূপ ক্ষেত্রেও শুধু ছন্দের ঐশ্বর্য্যই বাংলা কবিতাকে এক অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত করিতে পারে। বাংলা ছন্দের এই বিপুল গৌরব, চমৎকারিত্ব, বৈচিত্র্য ও অপরূপ ব্যঞ্জনাশক্তি বহুল পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভারই সৃষ্টি। অবশ্য এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একমাত্র গুণী বা মৌলিক প্রতিভাশালী ছন্দঃশিল্পী নহেন। তাঁহার পূর্ব্বেও অনেকে বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, বিশেষতঃ মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিয়া বাংলা ছন্দের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা সার্থক বিপ্লব সংঘটন করিয়াছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মত এত বহুমুখী এবং এতাদৃশ নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা আর কাহারও ছিল কি না সন্দেহ। ছন্দে তাঁহার প্রতিভার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল।

(১) আধুনিক বাংলা ছন্দের একটি প্রধান রীতি—আধুনিক বাংলা মাত্রাচ্ছন্দ বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। 'মানসী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরিয়া ছন্দোরচনার যে বিশিষ্ট রীতি প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহা অবিলম্বে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং বাংলা ছন্দের ইতিহাসে এক নূতন ধারা প্রবাহিত হইল। আজ এই ধারাই বোধ হয় বাংলা ছন্দে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এই রীতির বিস্তৃত পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

এক প্রকারের মাত্রাচ্ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা পূর্ব্বেও করা হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিরা এবং পরে আরও কোন কোন কবি এরূপ প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সংস্কৃতের মাত্রাই বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যেখানে তাঁহারা হুবহু সংস্কৃতের অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহাদের রচনা কৃত্রিমতাদুষ্ট ও ব্যর্থ হইয়াছে; আর যেখানে তাঁহাদের প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলা যায়, সেখানে তাঁহারা স্থানে স্থানে মাত্র সংস্কৃত মাত্রাপদ্ধতির অনুসরণ

করিয়াছেন, অনেকস্থলে সেই পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভাই বাংলার নিজস্ব মাত্রাবৃত্ত ছন্দের রীতি আবিষ্কার করিয়া বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

(২) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ পূর্ব্বে ছড়াতেই বা তজ্জাতীয় কোন হাল্কা রচনায় ব্যবহৃত হইত। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে গুরুগম্ভীর কবিতাও রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই ছন্দে কেবল অপূর্ণ চতুষ্পর্ব্বিক বা দ্বিপর্ব্বিক চরণের ব্যবহার ছিল, রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে পূর্ণ ও অপূর্ণ দ্বিপর্ব্বিক, ত্রিপর্ব্বিক, চতুষ্পর্ব্বিক ও পঞ্চপর্ব্বিক চরণও রচনা করিয়াছেন। ('খেয়া', 'পলাতকা' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)

(৩) তানপ্রধান ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যুক্তাক্ষর ব্যবহারের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক কবিই যুক্তাক্ষর ব্যবহার করিতে গিয়া মাঝে মাঝে ছন্দের সৌষম্য নষ্ট করিতেন, এ দোষ রবীন্দ্রনাথের রচনায় অতি বিরল।

(৪) রবীন্দ্রনাথ বহুপ্রকারের স্তবক উদ্ভাবন করিয়া বাংলা ছন্দের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট স্তবকগুলি যেমন নিজস্ব শ্রী ও ছন্দে গরীয়ান্, তেমনই বিশেষ বিশেষ ভাবের বাহন হইবার উপযুক্ত। তিনিই দেখাইয়াছেন যে বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি অনুধাবন করিতে পারিলে বাংলায় নব নব স্তবক রচনা করা চলিতে পারে, কয়েকটি বাঁধা স্তবকের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকার কোন আবশ্যিকতা নাই। স্তবকই যে একটা বিশিষ্ট ভাব ও উপলব্ধির প্রতীক হইতে পারে, তাহার গঠন-কৌশল ও গতিই যে একটা বিশিষ্ট অনুভূতির দ্যোতনা করিতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথই প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত অনেক স্তবকই এখন বাংলা কাব্যে খুব চলিতেছে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতা (সনেট্) ও তজ্জাতীয় কবিতা রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ অনেক নূতনত্ব আনিয়াছেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতার যে সহজ সংস্করণ এখন সুপ্রচলিত, রবীন্দ্রনাথই তাহার প্রবর্ত্তক। আঠার মাত্রার চরণ লইয়া সনেট্ রচনাও তাঁহার কীর্ত্তি।

['নৈবেদ্য', 'চৈতালি' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য]

(৫) প্রাচীন দ্বিপদী, ত্রিপদী ইত্যাদিতে আবদ্ধ না থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ নানা নূতন ছাঁচের চরণ ব্যবহার ও প্রচলন করিয়াছেন। বাংলা ছন্দের উপকরণ

যে পর্ব্ব এবং পর্ব্বের ওজনের সাম্য বজায় রাখিয়া যে নানা বিচিত্র সঙ্কেতে চরণ রচনা করা যায়, তাহা রবীন্দ্রনাথই প্রথম সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেন। চরণের এই গঠনবৈচিত্র্য যে ভাবের বৈচিত্র্যের যোগ্য বাহন হইতে পারে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন।

চতুষ্পর্ব্বিক চরণ, নব নব পরিপাটীর ত্রিপদী, আঠার মাত্রার চরণ ইত্যাদির বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বই সমধিক।

(৬) বিলম্বিত লয়ের ছয় মাত্রার পর্ব্ব এখন বাংলা কাব্যের প্রধান বাহন, এই পর্ব্বের বহুল ব্যবহার ও প্রচলন রবীন্দ্রনাথই প্রথম করিয়াছেন। আমাদের সাধারণ কথোপকথনের ভাষার এক একটি বাক্যাংশ যে প্রায়শঃ ছয় মাত্রারই কাছাকাছি হয়, ইহা রবীন্দ্রনাথ প্রথম লক্ষ্য করেন এবং এই তত্ত্বের ভিত্তিতে এই নব ছন্দ গড়িয়া তুলেন।

পঞ্চমাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক পর্ব্বের বিশিষ্ট গুণ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের যথোচিত বিস্তৃত ব্যবহার রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেন।

(৭) রবীন্দ্রনাথ এক প্রকার অভিনব অমিতাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন। ইহাতে মিত্রাক্ষর বা মিলের ব্যবহার থাকিলেও, ছেদ ও যতির অবস্থান এবং গতির দিক্ দিয়া ইহা মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের অনুরূপ।

প্রথমতঃ চৌদ্দ অক্ষরের এবং পরে আঠার অক্ষরের চরণে তিনি এই ছন্দ রচনা করিয়াছেন।

('সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কথা ও কাহিনী' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)

(৮) রবীন্দ্রনাথ মুক্তবন্ধ ছন্দে পদ্য রচনার প্রয়াস অনেক সময় করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রয়াস ও পরীক্ষার ফলে তিন প্রকারের অভিনব ছন্দোবন্ধ তিনি পদ্যে প্রচলন করিয়াছেন।

(ক) 'পলাতকা'র ছন্দ (খ) 'বলাকা'র ছন্দ (গ) মিত্রাক্ষরবর্জ্জিত বলাকা-ছন্দ। এই তিন প্রকার ছন্দের পরিচয় পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে ('বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ') দেওয়া হইয়াছে।

(৯) তিনি 'লিপিকা' ইত্যাদি রচনায় prose-verse অর্থাৎ গদ্যের পদ লইয়া পদ্যের গঠনরীতির আদর্শে ছন্দোবন্ধের পথ দেখাইয়াছেন।

পরে 'পুনশ্চ', 'শেষ স্তবক' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি গদ্যের পদ লইয়া সম্পূর্ণ মুক্তবন্ধ ছন্দের আদর্শে কবিতা লিখিয়া বাংলায় যথার্থ গদ্য কবিতার প্রবর্তন করিয়াছেন। গদ্যকবিতা আজকাল বাংলায় সুপ্রচলিত।

(১০) তদ্ভিন্ন রবীন্দ্রনাথ ছন্দের আনুসঙ্গিক নানাবিধ অলঙ্কার অজস্র মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া বাংলা ছন্দকে অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন। অনুপ্রাস, মিত্রাক্ষর, স্বরের ঝঙ্কার, ব্যঞ্জনবর্ণের নির্ঘোষ, গতির লালিত্য, শব্দ-সমাবেশের সৌষম্য, ধ্বনির অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনাশক্তি ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে তাঁহার ছন্দ সমৃদ্ধ। এত বিবিধ ঐশ্বর্য্যশালী ছন্দ সাহিত্যের ইতিহাসে আর কেহ রচনা করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

এই বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা মৎপ্রণীত Studies in Rabindranath's Prosody (Journal of the Department of Letters, Cal. Univ., Vol. XXXI) এবং Studies in the Rhythm of Bengali Prose and Prose Verse (Journal of the Department of Letters, Cal. Univ., Vol. XXXII) নামক প্রবন্ধদ্বয়ে করা হইয়াছে।

ছন্দে নূতন ধারা

(ক)

প্রত্যেক দেশেই কাব্যের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই কাব্যে নূতন করিয়া একটা প্রেরণা আসে, যখনই কাব্য যথার্থ রসে সঞ্জীবিত হয়, তখনই ছন্দেও একটা নূতন প্রবাহ দেখা যায়, কবির বাণী নব নব ছন্দের তরঙ্গের দোলায় আত্মপ্রকাশ করে। ছন্দ কাব্যের একটা আকস্মিক বাহন মাত্র নহে, ছন্দ কাব্যের মূর্ত্ত কলেবর। কবির অনুভূতির বৈশিষ্ট্যের সহিত তাহার স্বাভাবিক প্রকাশের অর্থাৎ ছন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কবির "brains beat into rhythm"—ছন্দের তালে তালেই কবির মনে ভাব ও চিন্তার লহরী জাগ্রত হয়; এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিতেন যে, তাঁহার মনে প্রথমে একটা নূতন সুর আসিয়া দেখা দিত, তাহার অনুসরণে পরে আসিত সেই সুরের অনুরূপ কথা বা গান। এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক খাঁটি কবিই ছন্দের ইতিহাসে একটা নূতন পর্ব্বের সূচনা করেন। যাহার নিজস্ব সম্পদ্ আছে সে কখনও "পরের সোনা কানে" দেয় না; যাহার নিজস্ব বাগ্‌বিভূতি আছে সে পরের কথা ও বাঁধা বুলির অনুকরণ করে না; যে কবির অন্তঃকরণে যথার্থ প্রেরণার আবির্ভাব হয়, সে পূর্ব্ব-প্রচলিত ছন্দের অনুবর্ত্তন করিতে স্বভাবতঃই একটা অসুবিধা বোধ করে, তাহার

"নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যে যে নবযুগের সূত্রপাত, সেই যুগের বাংলা কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেও এ কথার সত্যতা প্রতীত হয়। যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বাংলা ছন্দে নব নব রীতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে আসিলেন মহাকবি মধুসূদন,—নবযুগের নূতন ভাব ও আদর্শের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহার পূর্ব্বসূরিগণের মধ্যে ছন্দঃশিল্পী অনেক ছিলেন,—বৈষ্ণব মহাজনেরা ছিলেন, ভারতচন্দ্র ছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের নিজস্ব প্রতিভা পূর্ব্ব কবিগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিল না, ভাগীরথীর মত নূতন একটা

ছন্দের খাত কাটিয়া সেই পথে অগ্রসর হইল। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে বাংলা ছন্দ মহীয়ান্ হইল, ছেদ ও যতির স্বাধীন গতির রহস্য আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে নব নব ধারার সূত্রপাত হইল। বিদেশী সনেট্ বাংলার মাটিতে উপ্ত হইয়া চতুর্দ্দশপদী কবিতারূপে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ব্রজাঙ্গনার হৃদয়োচ্ছ্বাসে নূতন ধরণের গীতি-কবিতার সম্ভাবনা দেখা দিল। মধুসূদনের পরে আসিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। মধুসূদনের অপূর্ব্ব মৌলিকতা ও যুগান্তকারী প্রতিভা ইঁহাদের কাহারও ছিল না, কিন্তু বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে নব নব পরীক্ষা ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা ইঁহাদের ছিল। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের সহিত সনাতন ছন্দের রীতির সামঞ্জস্য ঘটাইবার প্রয়াস উভয়েই করিয়াছিলেন, এবং অমিত্রাক্ষরের দুই-একটা নূতন ঢঙ্ প্রত্যেকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নানাভাবে স্তবক-গঠনে বৈচিত্র্য আনিয়া বাংলার কাব্যের ব্যঞ্জনাশক্তি উভয়েই বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন হেমচন্দ্র ছড়ার ছন্দ ব্যঙ্গকাব্যে ব্যবহার করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি কাব্যে দীর্ঘস্বরবহুল ছন্দো-রচনায় অসামান্য প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহার পর গিরিশ ঘোষ মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের মূলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বাংলায় নাট্য-কাব্যের যোগ্য বাহন—"গৈরিশ ছন্দের" প্রবর্ত্তন করেন।* রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কিছু বলাই বাহুল্য। আধুনিক বাংলা মাত্রাছন্দের প্রবর্ত্তন, গম্ভীর বিষয়ে ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের প্রয়োগ, অমিত্রাক্ষরের চাল বজায় রাখিয়া তাহাতে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার, অমিত্রাক্ষরের মূলনীতির সম্প্রসারণ করিয়া 'বলাকা' ছন্দের উদ্ভাবন, নব নব রীতিতে চরণ ও স্তবক রচনা, গদ্য-কবিতার প্রবর্ত্তন ইত্যাদি নানা উপায়ে তিনি বাংলা ছন্দের ইতিহাসে যুগান্তর আনিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পরে আসিলেন "ছন্দের যাদুকর"—সত্যেন্দ্রনাথ। খুব অভিনব ও মৌলিক দান তিনি হয়ত করেন নাই, কিন্তু নানা কলাকৌশলে বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্বগুলির বিচিত্র ব্যবহার করিয়া তিনি যেন ছন্দের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া গিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে নজরুল ইস্‌লাম প্রভৃতি কবিগণও ছন্দে নিজস্ব প্রতিভা ও নব নব ধারা-প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা অল্পাধিক পরিমাণে প্রদর্শন করিয়াছেন।

* সম্ভবতঃ এই ছন্দের প্রথম প্রয়োগ গিরিশচন্দ্র করেন নাই, তবে তিনিই ইহার বহুল প্রয়োগ ও প্রচার করিয়াছিলেন।

(খ)

অতি আধুনিক বাংলা কাব্যের ছন্দে একটা মামুলি-আনা আসিয়া পড়িয়াছে। "নব-নব-উন্মেষ-শালিনী" ক্ষমতার বা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আধুনিক বাংলা কাব্য ছন্দের সৌষম্য ও লালিত্যের দিক্ দিয়া যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তদ্রূপ পূর্ব্বে কখনও করে নাই। ইহা যুগ যুগ ধরিয়া বহু কবির সাধনার ফল, প্রগতির যথার্থ পরিচয়। কিন্তু সেই অগ্রগতির স্রোত যেন স্তিমিত হইয়াছে, ছন্দঃ-শিল্পীদের মধ্যে "এহ বাহ্য, আগে কহ আর" এই ভাবটা বিশেষ লক্ষিত হইতেছে না। ইংরাজি সাহিত্যে কবি পোপের প্রভাবে এক সময়ে এই অবস্থা আসিয়াছিল। পোপের কাব্যে ইংরাজি ছন্দ এক দিক্ দিয়া চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সে সময়ে প্রায় সমস্ত লেখকই মনে করিতেন যে ইংরাজি ছন্দের আর কোন বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়, পোপের অনুসরণ করাই ছন্দে চরম সার্থকতা। ফলে পোপ-প্রদর্শিত পথে 'rule and line'-সহযোগে কবিতা রচনা চলিতে লাগিল। স্রোত না থাকিলে জলাশয়ের যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, ইংরাজি ছন্দে ও কাব্যে তদ্রূপ দুর্দ্দশা দেখা দিল। বাংলা কাব্যেও বর্ত্তমানে প্রায় সেই অবস্থা; ছন্দ কবির নিজস্ব উপলব্ধির অভিব্যক্তি না হইয়া মাত্র অনুকরণ-কৌশলের পরিচয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকাল অনেক কবি আছেন যাঁহাদের রচনা আপাত দৃষ্টিতে, অন্ততঃ ছন্দোলালিত্য বা পদগৌরবের দিক্ দিয়া, অনবদ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তবুও সে সব কবিতা মনে রেখাপাত করে না, স্থায়ী রসের সঞ্চার করে না। কারণ এ সব রচনা কারিগরের ছাঁচে-ঢালাই পুতুল মাত্র, শিল্পীর মৌলিক উপলব্ধির মূর্ত্ত প্রকাশ নহে। তাই এ সমস্ত কবিতার ছন্দে অনুকরণের কৌশলই আছে, সৃষ্টির গৌরব নাই।

কাব্য-ছন্দে এই গতানুগতিকতার জন্যই আজকাল অনেক "সহৃদয়" লেখক গদ্য-কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনা না করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, গদ্য অন্ততঃ পদ্য নহে। গদ্য-কবিতা যে কোন কালে পদ্যকে আসনচ্যুত করিতে পারিবে, তাহাও মনে হয় না। কারণ পদ্যের ব্যঞ্জনার যে বৈশিষ্ট্য আছে, উৎকৃষ্ট গদ্য কিম্বা গদ্য-কবিতার তাহা নাই। সহৃদয় কবিপ্রতিভাশালী লেখকেরা যে পদ্য-ছন্দে না লিখিয়া গদ্য-ছন্দে লিখিতেছেন, তাহাতে প্রচলিত পদ্য-ছন্দের অনুপযোগিতা এবং নব নব ছন্দের আবশ্যকতা-ই প্রমাণিত হইতেছে।

এই মতামতগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কয়েকজন আধুনিক লেখক যে পদ্য-ছন্দে স্বকীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই এমন নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীমান্ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম করা যাইতে পারে। আরও দুই চারিজনের নাম-ও নিশ্চয় করা সম্ভব। ইহাদের ছন্দঃশিল্পের গুণগ্রাহী হইয়াও স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক বাংলা কাব্যের ছন্দে এখন একটানা ভাটা চলিতেছে। ছন্দঃসুরধুনীতে এখন নূতন করিয়া জোয়ার আসিবার এবং নব নব ধারায় সেই সুরধুনী-স্রোত "অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়" প্রবাহিত হইবার সময় আসিয়াছে।

(গ)

বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি অনেক আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে ছন্দে নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ছন্দে নূতন ভঙ্গী বা রীতি আনিতে পারেন প্রতিভাশালী কবি আপন কাব্য-সৃষ্টির দ্বারা, ছন্দের আলোচনাতেই তাহা সম্ভব হয় না। তবে কোন্ কোন্ দিক্ দিয়া প্রগতি সম্ভব তাহার ইঙ্গিত করা যাইতে পারে, হয়ত কোন প্রতিভাসম্পন্ন কবির শক্তির স্ফুরণের পক্ষে এই ইঙ্গিত কিছু সহায়তা করিতে পারে।

(১) দীর্ঘস্বর-বহুল ছন্দে রচনা।

বাংলায় কোন মৌলিক স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। তজ্জন্য বাংলায় যে সংস্কৃত, হিন্দী, মরাঠী ইত্যাদি ছন্দের অনুরূপ ছন্দঃস্পন্দন সৃষ্টি করা যায় না, তাহা স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথও স্বীকার করিয়াছেন। বাংলায় সংস্কৃতের হুবহু অনুকরণ করিয়া যাঁহারা ছন্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘের সমাবেশ করার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন ও হইবেন। তবে ভারতচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় যেরূপভাবে সুকৌশলে মৌলিক দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ করিয়াছেন, সেইভাবে দীর্ঘস্বর-বহুল ছন্দের সৃষ্টি হইতে পারে। পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের স্বাভাবিক বিভাগ বজায় রাখিতে হইবে; পর্ব্বের মোট মাত্রা-সংখ্যার একটা মাপ স্থির রাখিতে হইবে; কোন পর্ব্বাঙ্গে একাধিক দীর্ঘ স্বর থাকিবে না, কিংবা কোন পর্ব্বে উপর্য্যুপরি দুইটির বেশী দীর্ঘ স্বর থাকিবে না; পর্ব্বাঙ্গের অন্যান্য অক্ষরগুলি লঘু হইবে। মোটামুটি এই নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচনা করিলে বাংলা ছন্দে দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহারের জন্য একটা চমৎকার ছন্দঃস্পন্দন পাওয়া যাইতে পারে। এই সম্পর্কে শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় প্রমুখ কয়েকজন লেখকের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলা ছন্দের কয়েকটি

মূল তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত হওয়ায় তাঁহাদের প্রয়াস সর্ব্বদা সার্থক হয় নাই এবং তাঁহাদের চেষ্টায় নূতন কোন কাব্যধারা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

যাহা হউক, কোন সুকৌশলী ছন্দঃশিল্পী এইভাবে বাংলা কাব্যে ব্রজবুলির ছন্দ, হিন্দী চৌপাই প্রভৃতির অনুরূপ ছন্দ চালাইতে পারেন। সংস্কৃত জাতি, গাথা, গীতি, আর্য্যা প্রভৃতি ছন্দের অনুসরণও অনেকটা সম্ভব। তবে সংস্কৃতে যে সব ছন্দে উপর্য্যুপরি বহু দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ আছে এবং যে সব ছন্দে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের অনুযায়ী বিভাগ সম্ভব নয়, সে সব ছন্দের স্পন্দন বাংলায় সৃষ্টি করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এমন কি, সত্যেন্দ্রনাথও এরূপ চেষ্টায় কৃতকার্য্য হন নাই। সংস্কৃত ছন্দের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া যদি ছন্দঃশিল্পীরা দীর্ঘস্বরবহুল নূতন নূতন ছন্দোবন্ধ বাংলায় প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা করেন তবেই তাঁহাদের চেষ্টা সার্থক হইবে।

(২) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ (বা ছড়ার ছন্দ)।

শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ বাংলা কাব্যের একটি সুপ্রাচীন ধারা। অনেকে ইহাকে ইংরাজি accentual metre-এর প্রতিরূপ মনে করেন। কিন্তু একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইরূপ মনে করার কোন সঙ্গত যুক্তি নাই। বাংলা ছন্দে অক্ষরবিশেষের উপর শ্বাসাঘাত আর ইংরাজির accent এক নহে ; উভয়ের প্রকৃতি, অবস্থান পৃথক্‌। ইংরাজি accentual metre আর বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের ছাঁচও বিভিন্ন। ইংরাজি ছন্দ অনুকরণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ আধুনিক মাত্রাচ্ছন্দেই হইয়াছে।

বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে বৈচিত্র্য কম, কাঠাম বাঁধা। প্রতি পর্ব্বে চার মাত্রা ও দুই পর্ব্বাঙ্গ। অন্য কোন ছাঁচে এই ছন্দকে ঢালা যায় কিনা তাহা ছন্দঃশিল্পীরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

(৩) নূতন মাত্রাবৃত্ত।

যে মাত্রাচ্ছন্দ আধুনিক বাংলা কাব্যে চলিতেছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তন করেন। এই ছন্দে 'ঐ', 'ঔ' এবং অন্যান্য যৌগিক স্বরধ্বনিকে দুই মাত্রা এবং মৌলিক স্বরধ্বনিকে এক মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। তদ্ভিন্ন ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরধ্বনিকেও দুই মাত্রা ধরা হয়।

এইরূপ মাত্রাবিচারে আমাদের কান এখন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ছন্দের মাত্রাবোধ অনেক পরিমাণে প্রথা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, কেবল শুদ্ধ কাল-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। এ কথা কেবল বাংলা ছন্দে নহে,

সমস্ত ভাষার ছন্দেই খাটে। যন্ত্রের সাহায্যে অক্ষরের ধ্বনির মাপ লইলে দেখা যাইবে যে, সমস্ত দুই মাত্রার অক্ষর পরস্পরের সমান নহে, সমস্ত এক মাত্রার অক্ষরও পরস্পরের সমান নহে এবং দুই মাত্রার অক্ষরের উচ্চারণে সর্ব্বদা এক মাত্রার অক্ষরের দ্বিগুণ কাল লাগে না। বস্তুতঃ অভ্যাস ও প্রথার উপরই মাত্রা-নির্ণয় নির্ভর করে, সেই কারণেই প্রাচীন পয়ারাদি ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া নূতন মাত্রাপদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক ছন্দের নূতন এক ধারার প্রবর্ত্তন করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। প্রথমে লোকে ইহাকে কৃত্রিম বলিলেও, সেই কৃত্রিমই এখন স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কোন প্রতিভা-সম্পন্ন কবির পক্ষে অপর কোন পদ্ধতিতে মাত্রাবিচার করিয়া আর এক প্রকার মাত্রাচ্ছন্দ প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইতেও পারে।

শ্রুতবোধে আছে, 'ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্'। এই সূত্র অনুসরণ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, অন্ততঃ শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে হলন্ত অক্ষরকে দেড় মাত্রা বলিয়া হিসাব করা উচিত। অবশ্য এই হিসাব প্রচলিত ছন্দে, এমন কি শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দেও সর্ব্বত্র খাটে না। কিন্তু এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া কি নূতন একপ্রকারের ছন্দ প্রচলন করা যায় না? অন্ততঃ পাশাপাশি দুইটি হলন্ত অক্ষর যোগে তিন মাত্রার সমান হইবে, এই প্রথা খুব সহজেই চলিতে পারে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পয়ারজাতীয় বা তানপ্রধান ছন্দ ও চলিত মাত্রাচ্ছন্দের ব্যবধান কমিয়া আসিবে এবং বোধ হয় ছন্দে সাধারণ উচ্চারণের অনুবর্ত্তন করা সহজ হইবে।

এতদ্ভিন্ন আর একভাবেও নূতন মাত্রাচ্ছন্দ সৃষ্টি করা সম্ভব হইতে পারে। সমস্ত স্বরান্ত অক্ষরকেই হ্রস্ব এবং কেবল ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়াও ছন্দো রচনা চলিতে পারে। বাঙ্গলায় 'ঐ' বা 'ঔ' স্বভাবতঃ দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না, সুতরাং এ প্রথা সহজেই চলিতে পারে।

(৪) বর্ত্তমান যুগে বাংলা কবিতায় লয়ের পরিবর্ত্তন বড় একটা দেখা যায় না। আগাগোড়াই একটা কবিতা কোন একটা বিশেষ ঢঙে লেখা হয়। এমন কি তানপ্রধান বা পয়ারজাতীয় ছন্দে ধ্বনির সহিত মাত্রার সামঞ্জস্য রাখার জন্য একটু অবহিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া আজকাল এই জাতীয় ছন্দও একটু অরুচিকর হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক মাত্রাবৃত্তের বাঁধা হিসাবই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ছড়ার ছন্দে আগে যে একটু-আধটু লয়ের স্বাধীনতা ছিল, আজকাল তাহাও নাই। মোটের উপর, ছন্দে আজকাল শুদ্ধ লয়ের প্রাধান্যই চলিতেছে।

অবশ্য এই রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ছন্দের সৌষম্য অনেকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত লয়-পরিবর্ত্তন যে ছন্দের মূলীভূত ঐক্যের বিরোধী, তাহাও নিঃসন্দেহ। তথাপি সঙ্গীতে যেমন জংলা বা মিশ্র রাগ-রাগিণীর একটা স্থান আছে, তদ্রূপ ছন্দেও বোধ হয় মিশ্র লয়ের একটা স্থান হইতে পারে, এমন কি, এই লয়-পরিবর্ত্তন কাব্যের ব্যঞ্জনার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে। মধুসূদন যেমন পয়ারের বিচ্ছেদ-যতির স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং ছন্দের ব্যঞ্জনাশক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন, লয়-পরিবর্ত্তনের দ্বারা অনুরূপ একটা বিপ্লব ছন্দে আনা সম্ভব হইতে পারে! পূর্ব্বে কবির গান ও পাঁচালীর রচয়িতারা এইরূপ লয়-পরিবর্ত্তন কখনও কখনও করিতেন। তাহাতে অনেক সময়ে ছন্দের হানি হইলেও, আবার মাঝে মাঝে চমৎকার ব্যঞ্জনা ও ছন্দের সৌন্দর্য্যও দেখা যাইত। রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে দুই একটি ছোট কবিতায় লয়-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আজকাল শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু কখনও কখনও এইরূপ লয়-পরিবর্ত্তন করেন। তবে ঠিক মিশ্র-লয়ের ছন্দ পর্য্যন্ত কেহ অগ্রসর হন নাই। বলা বাহুল্য, বিশেষ বিবেচনা সহকারে এই লয়-পরিবর্ত্তন না করিলে সুফল হইবে না।

(৫) আরবী ও ফারসী ছন্দের অনুকরণে বাংলায় ছন্দ রচনা করার প্রয়াস কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্তু কৃতকার্য্য কেহ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সাহায্যেই সেই অনুকরণ করার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু আরবী ও ফারসী ছন্দের গতি ও বিভাগের সহিত বাংলা মাত্রাবৃত্তের সঙ্গতি রাখা প্রায় অসম্ভব। তদ্ভিন্ন উচ্চারণ ও মাত্রার দিক্ দিয়া বাংলার এক একটি অক্ষরধ্বনির সহিত আরবী ফারসী অক্ষরধ্বনির সঙ্গতি নাই। আরবী, ফারসী বা উর্দ্দু ছন্দ বাংলায় প্রচলিত করিতে হইলে, বাংলা ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি ও গতির একটা আমূল সংস্কার আবশ্যক। ইহা কত দূর সম্ভব, তাহা পরীক্ষার যোগ্য। উর্দ্দু উচ্চারণ বাংলায় একেবারে অপরিচিত নহে; বহু উর্দ্দু শব্দ বাংলায় চলিয়া আসিতেছে। বাংলায় অনেক পরিবারে উর্দ্দুর ব্যবহার আছে। সুতরাং চেষ্টা করিলে হয়ত উর্দ্দুর উচ্চারণ ও ছন্দ চলিতে পারে। হিন্দী ও হিন্দুস্থানী শব্দ অবলম্বনে যদি উর্দ্দুর ছন্দ চলিতে পারে, তবে বাংলা শব্দ অবলম্বনেও হয়ত উর্দ্দু বা ফারসীর বিশিষ্ট ছন্দের রচনা সম্ভব। তবে তজ্জন্য বর্ত্তমান পদ্ধতির, এমন কি উচ্চারণ-ধারারও একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

(৬) বাংলায় মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার

আদর্শ মিল্‌টনের Blank Verse. ইহার বৈশিষ্ট্য run-on linesএর ব্যবহারে। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ অন্তভাবেও রচিত হইতে পারে। সংস্কৃতে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ আছে, বাংলায় তাহার বিশেষ কোন অনুকরণ হয় নাই। সম্ভব কিনা তাহা পরীক্ষার যোগ্য। নবীনচন্দ্র দাস কালিদাসের রঘুবংশের অনুবাদে যে অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে run-on lines নাই। বৃত্রসংহারের কয়েকটি সর্গেও এইরূপ অমিত্রাক্ষর আছে। বোধ হয় এই ধরণের অমিত্রাক্ষরের অধিকতর প্রচলন সম্ভব। ইহাতে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের তীব্র গতি থাকিবে না, কিন্তু একটা স্থির, গম্ভীর মহিমা থাকিবে।

(৭) বাংলায় মিত্রাক্ষর ও অনুপ্রাসের প্রাধান্য খুব বেশী। কিন্তু assonance বা মিত্রাক্ষরের আভাসমাত্র দিয়া ছন্দের স্তবক গাঁথা যায় কিনা, সে বিষয়ে বাংলায় রীতিমত পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। হয়ত চেষ্টা করিলে ইহাতে ছন্দের একটা নূতন পথ খুলিয়া যাইতে পারে।

(৮) গদ্য কবিতা বাংলায় রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু গদ্যের বাক্যাংশগুলিকে পদ্যের ছাঁচে Whitman যেভাবে গ্রথিত করিতেন, তাহা কেহ করিতেছেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'য় পদ্যের ছাঁচে গদ্য লেখার যে পরিকল্পনা আছে, তাহারও বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় না।

আবার পদ্যের পর্ব্ব লইয়া গদ্যের মত স্বেচ্ছায় গ্রথিত করা যাইতে পারে। ইহাই হইবে যথার্থ free verse বা মুক্ত ছন্দ। গিরিশ ঘোষ ইহার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পরে রবীন্দ্রনাথও free verse লিখিয়াছেন, কিন্তু সে পথে আর উল্লেখযোগ্য কোন প্রগতি অতঃপর হয় নাই।

(৯) চরণের গঠনেও কিছু কিছু নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করা সম্ভব। সাধারণতঃ বাংলা ছন্দের এক একটি চরণে প্রত্যেকটি পর্ব্বই পরস্পর সমান হয়; কেবল চরণের অন্ত্য পর্ব্বটি প্রায়শঃ হ্রস্ব হইয়া থাকে। সমমাত্রিক পর্ব্বের ব্যবহারে একপ্রকার ছন্দঃসৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়, কিন্তু বিষমমাত্রিক পর্ব্বের ব্যবহারের দ্বারা অন্য এক প্রকার বিচিত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইতে পারে না কি? রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী', 'বর্ষশেষ' প্রভৃতি কবিতা বিষমমাত্রিক ত্রিপদীতে রচিত হওয়াতে অপরূপ ব্যঞ্জনাশক্তিতে মহিমান্বিত হইয়াছে। এই আদর্শে অন্যান্য ছাঁচের বিষমপর্ব্বিক চরণ রচিত হইতে পারে এবং এইভাবে ছন্দে একটা নূতন ধারা আসিতে পারে।

(১০) বাংলায় নানা ছাঁচের স্তবক প্রচলিত আছে। কিন্তু বিশিষ্ট ভাবের

প্রতীক হিসাবে কোন একটা বিশেষ স্তবকের প্রচলন হয় নাই। Ottava Rima, Ballad Stanza, Spenserian Stanza প্রভৃতি সুবিখ্যাত স্তবকের অনুরূপ কিছুর প্রচলন আমাদের কাব্যে নাই। তবে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। Sonnet অবশ্য চলিতেছে। কিন্তু limerick প্রভৃতির প্রচলন নাই কেন? প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও triolet প্রভৃতিতে কেহ ত হাত পাকাইতেছেন না। Ballade, Rondeau প্রভৃতি অনেক সুবিখ্যাত বিদেশী স্তবকের অনুসরণ বাংলায় বেশ সম্ভব। তাহাতে বাংলা ছন্দঃ-সরস্বতীর সৌন্দর্য্য আরও উজ্জ্বল হইবে।